মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ

উপমহাদেশের আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য

[দ্বিতীয় খণ্ড]

(১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী বীর পুরুষগণ)

মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ

মাওলানা মুশতাক আহমদ
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

উপমহাদেশের আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য (দ্বিতীয় খণ্ড)
মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ
মাওলানা মুশতাক আহমদ অনূদিত
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ২৬৮
ইফাবা প্রকাশনা : ২২৩৩/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৯২২.৯৭
ISBN : 984-06-0887-8

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৭
আষাঢ় ১৪১৪
জামাদিউস সানি ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

কম্পিউটার কম্পোজ
আল-লিসান কম্পিউটার

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ৮৫.০০ টাকা

UPOMOHADESHER ALIM SOMAJER BIPLOBEE OITIJYA (Glorious History of Ulamai Keram in the Sub-Continent): Written by Maulana Mohammad Mia in Urdu, translated by Maulana Mushtak Ahmad into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 June 2007

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www.islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 85.00 ; US Dollar : 3.00

সূচিপত্র

মহাপরিচালকের কথা

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল আগমন করবেন না। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বর্ণিত একটি হাদীস অনুসারে আলিমগণই নবীর ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। তাঁরাই যুগে যুগে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন, সমাজ থেকে যাবতীয় কুসংস্কার দূরীকরণে তাঁরাই হবেন রাহবার। বাস্তবেও তাই হচ্ছে। এ উপমহাদেশে মুঘল সম্রাটদের কোন কোন শরীয়তবিরোধী অন্যায় প্রথা থেকে শুরু করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের সংগ্রামেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলিম সমাজ। তাঁদের এ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আজ বিস্মৃতির পর্যায়ে। ইতিহাস গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক দু'চার পাতায় দু'চারজন আলিমের কিছু কিছু কর্মকাণ্ডের উল্লেখ থাকলেও বেশির ভাগই আজ কালের অন্তরালে হারিয়ে যেতে বসেছে।

মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ রচিত 'উলামায়ে হিন্দ-কা শানদার মাযী' এ বিষয়ে এটা একটা ইতিহাসধর্মী ও তথ্যবহুল গ্রন্থ। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সাথে এ উপমহাদেশের আলিম সমাজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার পরিচয় করানোর লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গ্রন্থটি 'উপমহাদেশের আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য' (দ্বিতীয় খণ্ড) শিরোনামে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ২০০৪ সালে প্রথম প্রকাশ করে।

জ্ঞানপিপাসু পাঠক সমাজ কর্তৃক বইটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ায় এবারে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন যুগে প্রচলিত শির্‌ক, বিদ্‘আত, কুসংস্কার থেকে শুরু করে বৃটিশ বিরোধী আযাদী আন্দোলন পর্যন্ত যে কোন মহতী উদ্যোগেই আমাদের সম্মানিত আলিম সমাজ ছিলেন নেতৃত্বের প্রথম সারিতে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের অবদান অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করা হয়। কিন্তু কালের আবর্তে তাঁদের গৌরবময় ঐতিহ্যগুলো ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে। উপমহাদেশের ইতিহাসে বিচ্ছিন্নভাবে কারো কারো কিছু অবদানের উল্লেখ থাকলেও সামষ্টিকভাবে এ ধরনের কোন পুস্তক সম্ভবত এ যাবত প্রকাশিত হয়নি।

মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ উর্দু ভাষায় ‘উলামায়ে হিন্দ-কা শানদার মাযী’ শীর্ষক একটি তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য এটি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ‘উপমহাদেশের আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য’ শিরোনামে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখক মাওলানা মুশতাক আহমদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে ২০০৪ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ব্যাপক পাঠক চাহিদার কারণে এবার এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এতে কিছু ভুল-ত্রুটি কিংবা মুদ্রণ-বিভ্রাট ঘটা অসম্ভব নয়। আশা করি সুধী পাঠক সমাজ তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদেরকে অবহিত করবেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা সম্ভব হয়।

আমাদের প্রত্যাশা, বইটি এবারও আগের মতোই পাঠক সমাদর লাভ করবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

উৎসর্গপত্র

আমার এ বইটি সার্বিক ইতিহাস জানার আকাঙ্ক্ষী সকল ভাইয়ের জন্য উৎসর্গিত, যেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনামলে ইতিহাসকে বিকৃত করার দরুন সমাজে যেসব রেষারেষি ও হানাহানির উদ্রেক ঘটেছিল তা দূরীভূত হতে পারে এবং ভারতবর্ষ পুনর্বার প্রেম-ভালবাসার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়।

মুহাম্মদ মিয়াঁ

লেখকের কথা

'উলামায়ে হিন্দ-কা শানদার মাযি' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। তখন ছিল বৃটিশ শাসনামল। আযাদী সংগ্রাম ও যুদ্ধের কাল। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 'ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট'-এর অধীনে মামলা দায়ের হল। বাস, বই বাজেয়াপ্ত ও লেখক কারাবন্দী।

তখনকার মনমানসিকতা ও অনুপ্রেরণা ছিল ভিন্ন রকমের। মামলার ঝুঁকি ঝামেলা ও আরোপিত হালকা ধরনের সাজা থেকে ছাড়া পেয়েই বইটির ওপর পুনঃ দৃষ্টি আরোপ করলাম। খুব সময় নেয় নি, অল্প দিনের মধ্যেই ১ম খণ্ড ১৬০ পৃষ্ঠার স্থলে প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠা এবং পঞ্চম খণ্ড দেড়শত পৃষ্ঠার বিশাল কলেবর নিয়ে পৌঁছে গেল ছাপাখানায়। এখন বইয়ের নাম হল ঃ

এক. 'উলামায়ে হিন্দ কা শানদারে মাযি জাদীদ' ১ম খণ্ড

দুই. 'উলামায়ে হক আউর উনকে মুজাহাদানা কারনামে' ২য় খণ্ড

তারপর এল ১৯৪৭ সালের বিপ্লব। এ বিপ্লবে কাজ করার জন্য আরেক বিশাল ক্ষেত্রের দুয়ার খুলে দেয়। তখন ব্যস্ততা খুব বেড়ে গেলে শানদার মাযীর অবশিষ্ট খন্ডগুলির ওপর পুনঃ দৃষ্টি আরোপের জন্য প্রস্তুত সকল আয়োজন চাপা পড়ে গেল বিপ্লবের একগাদা কাগজের নিচে। কাজেই সে আকাঙ্খা পুরনের আর চিন্তাও করা যায় নি।

তারপর ১৯৪৭ সালে সাধিত বিপ্লবের ছয় বছর পর ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ডাক্তার সায়্যিদ মাহমূদ সাহেবের সভাপতিত্বে 'ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম'-এর ইতিহাস রচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব ও আমার ঘনিষ্ট বন্ধু নদওয়াতুল মুসান্নিফীনের মহাপরিচালক হযরত মাওলানা মুফতী আতীকুর রহমান সাহেব আমাকে পুনরায় কলম হাতে নিয়ে লেখা শুরুর জন্য পীড়াপীড়ি করতে

লাগলেন। আমি তখনও জল্পনা কল্পনার মধ্যেই ছিলাম। ইত্যবসরে ডাক্তার সায়্যিদ মাহমূদ সাহেব ডেকে নিয়ে এ অনুরোধের মধ্যে 'নির্দেশ'-এর শক্তি সঞ্চারিত করলেন। পদ্ধতি ঠিক করা হল যে, এ অধম নিজের প্রাপ্ত তথ্যগুলির একটি নোট তৈরী করে ডাক্তার সাহেবের মাধ্যমে কমিটিকে পৌঁছাবে আর নিজেও স্বতন্ত্র বই আকারে এগুলি প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

স্বাধীনতার ইতিহাস প্রস্তুতকারী কমিটির কাজ এখনও শেষ হয় নি, তবে মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে এ অধম শুধু এক খণ্ড নয় বরং পরবর্তী গুলির কাজও সম্পন্ন করে নিয়েছে।

ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

এটি মহান আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞাময়। (মায়িদা, ৫ ঃ ৫৪) বর্তমানে এ খণ্ডটি 'উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযি'-এর দ্বিতীয় খণ্ড হিসাবে পাঠক সমীপে পেশ করা হল।

اگر قبول افتد زہے عز وشرف

মুহাম্মদ মিয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى ، اما بعد

উপমহাদেশীয় মুসলমান ও আযাদী আন্দোলন

প্রথম ভাগ

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র)-র রাজনৈতিক আন্দোলন ঃ

খ্রিস্ট্রিয় অষ্টাদশ শতকের সূচনাকাল। এ কালে এই মহান আলিম, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, সমাজ সংস্কারক ও বিপ্লব-যুগের মহান স্থপতি অর্থাৎ হযরত শাহ্ওয়ালী উল্লাহর জীবনের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। তারপর সত্তরের দশক অতিক্রান্ত হয়ে দু'টি বছরও যেতে পারেনি যে, হিজরী ১১৭৬ মোতাকেত ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে সেই মহান ব্যক্তিত্ব চিরদিনের জন্য জীবনের ইতি টেনে দেন।

এক নজরে অষ্টাদশ শতাব্দী

উপমহাদেশের ইতিহাসে খ্রিষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল অস্থিরতা ও দুর্যোগে পরিপূর্ণ সদা পরিবর্তনশীল এক শতাব্দী। এ শতাব্দীতে উপমহাদেশের বুক থেকে রাজতান্ত্রিক একটি সূর্য পশ্চিমাকাশে ক্রমে ঢলে পড়তে থাকে এবং অস্তমিত হওয়ার খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায়। আর অপর দিকে আরেক সাম্রাজ্যবাদী নবারুন পূর্বাকাশে তার নতুন পথ যাত্রার আয়োজন গুছিয়ে নিতে থাকে।

এ শতাব্দীর যখন সূচনাকাল ছিল তখনও সুদূর কান্দাহার থেকে আসাম এবং নেপাল ও তিব্বত থেকে মালাবার ও কম্বূদীপ পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল একটি। কিন্তু তার পর মাত্র প্রথম দশকটিও পার হতে পারেনি যে, ১৭০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীরের মৃত্যু হয়। আর এরই অব্যবহিত পরে রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এক মহাপ্রলয়। ফলে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিটি বন্ধন খুলে গেল এক এক করে। অস্থিরতা ও নৈরাজ্যে ছেয়ে গেল সমগ্র ভূখন্ড। এহেন মূহূর্তে ইউরোপীয় সেই শ্বেতাঙ্গ জাতি যাদের প্রতি সম্রাট আলমগীরের দাদা পরদাদাগণ সবিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করে আসছিলেন,

বৃষ্টির ন্যায় রাজকীয় প্রচুর অনুদান দ্বারা ধন্য করে আসছিলেন, যাদেরকে এক সময় সম্রাট আলমগীরের পিতা (শাহজাহান) সমুচিৎ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে শায়েস্তাও করেছিলেন, এমনকি স্বয়ং সম্রাট আলমগীরও একবার নিজ রাজ্য থেকে বহিস্কার করে দেওয়ার পর তারা বিনীত ও কাতরভাবে প্রার্থনা করলে তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং পুনরায় বাণিজ্যের অনুমতি দিয়ে জীবন বাচানোর সুযোগ করে দেন, সেই জাতির লোকেরাই চলমান শতাব্দী পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই এতকালের সকল অনুগ্রহ ভুলে যায়। উপরন্ত স্বয়ং সম্রাট আলমগীরের রাজধানী তাদের করতলগত হয়ে এ আলমগীরের প্রপুত্র সম্রাট শাহআলম তাদের ভাতাভোগী ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

অন্য শব্দে বলতে গেলে এ শতাব্দীর উত্থান-পতনের সার-সংক্ষিপ্ত কথা হল যে, সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীরের অপরিসীম জাঁক-জমকের সহিত এ শতাব্দীর সূচনা হয়। তারপর এর পতন ঘটে দেশ ও জাতির জন্য সেই নিবেদিতপ্রাণ মনীষীর শাহাদত বরণের মধ্য দিয়ে যিনি বিশ্ব মানুষের কাছে সুলতান টিপু নামে পরিচিত ছিলেন। যার রক্ত রঞ্জিত শবদেহ অবলোকন করে ইংরেজ সেনাপতি দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠেছিল ঃ

'আজ থেকে ভারতবর্ষ আমাদেরই'

এ শতাব্দীর প্রলয়ংকর দুর্যোগগুলির সার-সংক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ ঃ

এক. কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পরিষদে ইরানী তুরানী তথা শীয়া সুন্নী বিরোধ এক জটিল ব্যাধির আকার ধারণ করে। সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবশ্য এ বিরোধ দমিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেটি পূর্ণশক্তি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এবং এমন গৃহ-বিবাদের সূচনা করে যে, মাত্র পঞ্চাশ বছরের (১৭০৭-১৭৫৭) ব্যবধানে দিল্লীর সিংহাসনে দশজন মুকুটধারীকে উপবেশিত করা হয় আবার হটিয়ে দেয়া হয়। তম্মধ্যে কেবল চারজন ছিলেন এমন যাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। আর অবশিষ্টদের কাউকে সিংহাসনের উপরই শিরচ্ছেদন করা হয়েছে কিংবা আসনচ্যুত করে চক্ষুদ্বয় ফুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

দুই. বিভিন্ন সুবার সুবেদারগণ নিজেরা স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন। পক্ষান্তরে মোঘল সম্রাটের মর্যাদা একজন আশির্বাদকারী মুরশিদ তথা 'গুরু'-এর পর্যায়ে নেমে আসে।

তিন. দক্ষিণ ভারতে মারাঠাদের বিদ্রোহী শক্তিগুলি একটি সংঘবদ্ধশক্তির রূপ পরিগ্রহ করে।

চার. দিল্লীর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে রোহিলা-পাঠানদের নিজস্ব সরকার গঠিত হয়। আবার তাদের বিপরীতে অযোধ্যা সরকার নিজে একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য গঠনের পথ অবলম্বন করে।

পাঁচ. দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে জাঠদের শক্তি প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায় এবং

ছয়. উত্তর-পশ্চিমে খালসা দল (যা এ পর্যন্ত একান্ত ধর্মীয় একটি সম্প্রদায় হিসাবে কাজ করে আসছিল) রীতিমত রাজনৈতিক শক্তির আকার লাভ করে।

বর্ণিত এ শক্তিগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের কারণে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ পথ-ঘাট রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দ্বান্দ্বিক স্রোত-প্রবাহ বার বার রাজধানী দিল্লীকেও ভাসিয়ে দিতে থাকে। ফলে তিন শতাব্দীকালের সুদীর্ঘ বাদশাহী ব্যবস্থা চরমভাবে অপদস্ত হতে বাধ্য হল। সংঘাত মুখর এ শক্তিগুলি নিজেদের বিপরীত পক্ষকে পরাজতি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বহির্শক্তির সঙ্গেও যোগ-সাজোশ করে। এ প্রক্রিয়ায় একদল নাদির শাহকে ডেকে আনলে অন্যদল আহমদ শাহ আবদালীকে আমন্ত্রণ জানায়। প্রকৃতি ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কিছুটা তফাৎ থাকতে পারে কিন্তু দেশ ও দেশবাসীর ক্ষতি সাধনে কেউ কারো থেকে পিছিয়ে থাকেনি।[১]

এতটুকু ছিল আন্তর্দেশীয় শক্তিগুলির হালচাল-যাদের কেন্দ্র ছিল ভারতবর্ষ, ইরান বা আফগানিস্তানের কোথাও। অবশিষ্ট রয়েছে সেসব ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ শক্তি যারা ইতিপূর্বে উপমহাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে নিজেদের আসন সুদৃঢ় করে রেখেছিল। এই ইউরোপীয় শক্তিগুলি একে অপরের ঘোরতর শত্রু ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের গৃহযুদ্ধ থেকে স্বার্থ কুড়িয়ে নিতে সকলে ছিল সমান অংশীদার। বিশেষত ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর দায়িত্বশীলদের ভূমিকা ছিল এ ক্ষেত্রে অনন্য। কোম্পানীর লোকেরা ইউরোপীয় অন্যান্য শক্তির তুলনায় এত অধিক পরিমাণে নিজেদের স্বার্থ হাতিয়ে নেয় যতটুকু কিনা কোন সুচতুর প্রতিদ্বন্দ্বী নিজের বিপরীত পক্ষকে এহেন দুর্বল মূহুর্ত পেয়ে হাতিয়ে নিয়ে থাকে।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশে নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি শুরু করে।[২] পরিশেষে একদিকে আহমদ শাহ আবদালীর সৈন্যবাহিনী পনিপথের রণক্ষেত্রে মারাঠাদের কোমর ভেঙ্গে দেয়, আর অন্যদিকে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী বঙ্গদেশে নবাব সিরাজুদ্দৌলার প্রাণ সংহার করে বিদেশী আধিপত্যবাদের নতুন পতাকা উড্ডীন করতে থাকে।

রোগ নির্ণয় ও উপশমের চিন্তাভাবনা

এ সকল ভয়াবহ পরিস্থিতি ও রক্তক্ষয়ী নাটকসমূহ হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর জীবদ্দশায় তাঁর সচেতন দৃষ্টির সম্মুখে একের পর এক ঘটে যাচ্ছিল।

স্বদেশের এহেন দূরবস্থা তখন একদিকে তাঁর অনুভূতি পরায়ণ হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছিল, আর অন্যদিকে তিনি নিজের সচেতন ও উর্বর মস্তিষ্ক দিয়ে এ সকল রোগের মূল কারণ উদ্ঘাটন ও তদনুযায়ী চিকিৎসা দানের উপায় উদ্ভাবন চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন।

এভাবে সীমাহীন এক অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার ওপর তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তৎকালে সমাজ তাঁর এ উদ্যোগকে সহ্য করেনি ; প্রচণ্ড বিরুদ্ধাচরণেও নেমে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে একদিন ফতেপুরী মসজিদ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁর ওপর আক্রমণাত্মক হামলাও চালানো হয়েছিল।

এ অসমাপ্ত অবস্থায় ১৭২৮/১১৪৩ সালে তিনি হিজাযের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে দীর্ঘ দু'বছর পর্যন্ত অবস্থান করে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্ম-নিয়োজিত থাকেন। তখন আরো গুরুত্বপুর্ণ যে কাজটি সম্পাদন করেছিলেন সেটি ছিল মুসলিম বিশ্বের যাবতীয় পরিস্থিতির পূর্ণ পর্যবেক্ষণ। তিনি এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হজ্জ ও যিয়ারতকারীদের নিকট থেকে তাদের নিজ নিজ দেশের ব্যাপারে পূর্ণ খবরাখবর লাভ করেন। তুর্কীদের রাজত্ব যদিও তখন সামাজিক নানা ক্রটি-বিচ্যুতির ঘুণে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল তবুও তৎকালে তুরস্কই ছিল এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তর রাজশক্তি। মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র এবং আরব সাগরের তীরবর্তী 'আদন' বন্দর পর্যন্ত তাদের আধিপত্য ছিল। ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশেরও বিশাল ভূভাগ ছিল তাদের করায়ত্বে। হযরত শাহ্ সাহেব এশিয়ার বৃহত্তর এই রাজশক্তির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকেও গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। এ প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ

احوال ہند برما مخفی نیست که خود مولد ومنشا فیقر اس بلا دعرب نیز دیدیم واحوال مردم ولایت اثقات انیجا شیدیم .

অর্থাৎ ভারতবর্ষের পরিস্থিতি আমার কাছে অস্পষ্ট নয়। এটি আমার নিজের জন্মভূমি, এখানেই অতিক্রান্ত হয়েছে আমার শৈশবকাল। আরব দেশগুলির পরিস্থিতিও দেখে নিয়েছি। আর বিলাতে[৩] অবস্থানকারীদের অবস্থাও সেখানকার নির্ভরযোগ্য লোকজনের মাধ্যমে জেনে নিয়েছি।[৪]

এ সকল দেশের নানাবিধ অবস্থা নিয়ে গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পর তাঁর উবর মেধা ও উন্নত চিন্তাশক্তি তাকে শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত পেশ করল সেটি ছিল ; বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে সকল অবক্ষয় চলছে তার মূল কারণ হল রাজতান্ত্রিকতা ও বাদশা কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা।

হিজাযের এ সফরে তাঁর পরিচ্ছন্ন আত্মা আরো অভিমত ব্যক্ত করেছিল যে, যাবতীয় অবক্ষয় ও অধঃপতন থেকে উত্তরণ এবং চিকিৎসা লাভের উপায় হল 'ফুক্কা কুল্লা নিযাম' অর্থাৎ এমন একটি সামগ্রিক ও সর্বাত্মক বিপ্লব সাধন যা গোটা সমাজকে সংশোধন করবে এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তথা ঘুণে আক্রান্ত প্রতিটি কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে পরিমার্জিত করে দিবে। সামগ্রিক বিপ্লবের প্রয়োজন এ জন্য দেখা দিয়েছিল যে, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি শাখা-প্রশাখা, তা যে কোন বিভাগেরই অন্তর্ভূক্ত হোক না কেন–তা ছিল বাদশা তান্ত্রিকতা থেকে সৃষ্ট। আর বাদশা-তান্ত্রিকতার রোগব্যধি তাই বিভাগীয় সকল শাখা প্রশাখা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে রয়েছে। কাজেই পুরাতন প্রতিটি ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন আংগিকে গড়ে না তোলা হলে সংস্কার অভিযান সফল করা সম্ভব নয়। এটিই হল 'ফুক্কা কুল্লা নিযাম' ঘোষণার মর্মকথা।

বিপ্লব সাধনের পদ্ধতি

হযরত শাহ সাহেব সমগ্র বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। তবে তাঁর এ সমগ্র বিপ্লব ছিল জিহাদের নীতিমালার আংগিকে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সমগ্র বিপ্লবটি এমন হতে হবে যার উদ্দেশ্য থাকবে অতি উন্নত ও অতিশয় পবিত্র। যার প্রতিটি মুজাহিদ (সৈনিক) ও কর্মী ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে[৫] অবস্থান করবে। এমনকি এ মুজাহিদগণ আপন স্বত্ত্বার অস্তিত্বকেও বিলীন করে দিবে। এ বিপ্লবের কর্মদল এমন হবে যারা নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সফল করার জন্য যাবতীয়

ত্যাগ ও কুরবানীকে বরণ করবে এবং আত্ম-উৎসর্গীত করাকে নিজেদের জন্য এক অমরত্বের জীবন বলে জ্ঞান করবে।

বলা বাহুল্য এ ধরনের বিপ্লব কোন পেশাজীবী সৈনিকের দ্বারা সাধন করা সম্ভব নয়। এ বিপ্লব সাধনের জন্য প্রয়োজন একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আত্মনিবেদিত সৈনিকের। যারা এ সংস্কার ও বিপ্লবের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করে এবং সমাজ সংস্কারের মহৎ চিন্তা-চেতনার আলোকে নিজেদেরকে যোগ্য ও সুগঠিত করতে সক্ষম হবে। অধিকন্ত বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করাকে নিজ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে বরণ করে নিবে।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ সর্বপ্রথম এই বিশেষণযুক্ত কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার কাজটি সম্পাদন করেন। এ পর্যায়ে তিনি সংস্কারমূলক চিন্তাধারাকে সুবিন্যস্ত করেন। সাথে সাথে কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিং সেন্টার কায়েম করেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় এ কাজ পূর্ণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তাই তার ওফাতের পর কর্মসূচি চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয় পরবর্তী বংশধরের বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহঃ)-এর ওপর। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ আমরা একটু পরে আলোচনা করব। প্রথমে তাঁর সংস্কারমূলক চিন্তা ও দর্শনটি লক্ষ্য করুন।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর সংস্কারমূলক চিন্তাধারা

উপমহাদেশের জন্য অতিশয় সৌভাগ্য ও পরম গৌরবের বিষয় যে, এ দেশের মাটিতে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর ন্যায় এক মহান চিন্তানায়ক জন্ম লাভ করেছেন। এই চিন্তানায়ক মনীষী এমন এক যুগে আত্মপ্রকাশ করেন যখন বিশ্বে বিপ্লবী চেনতার পথিকৃত নামে পরিচিতি ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হতে অর্ধশত কাল বাকী, যখন কমিউনিজমের প্রথম শিক্ষাগুরু ‘কার্ল মার্কস’ ও তার ঘনিষ্ট সহচর ‘এঞ্জেলস’ জন্ম গ্রহণ করতে রীতিমত এক শতাব্দীকাল সম্মুখে রয়েছে, এমনকি ইউরোপে আধুনিক কল-কারখানার সুচনা ঘটারও প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে উপমহাদেশের এই ‘ধর্মগুরু’ মানুষের অর্থনীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে বলেন ঃ

অর্থনৈতিক নীতিমালা[৬]

১. সম্পদের মৌল বুনিয়াদ হল শ্রম। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী হল সম্পদের আহরণকারী শক্তি। পারস্পরিক সহযোগিতা নাগরিক জীবনের প্রাণ। কোন মানুষ

যতক্ষণ না সে দেশ ও জাতির স্বার্থে কাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদে তার কোন হিস্যা স্বীকৃত হবে না।[৭]

২. জুয়া সেট্টা ও বিলাসিতামূলক আড্ডাবাজি নির্মূল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এগুলো চালু থাকলে সম্পদের সাধারণ আবর্তন ব্যহত হয়। সম্পদ সরবরাহের সঠিক ব্যবস্থাপনা কায়েম হতে পারে না। তখন দেশীয় সম্পদ ও জাতীয় অর্থ প্রবৃদ্ধি লাভ করার পরিবর্তে ঐ সম্পদ গণমানুষের পকেট থেকে বেরিয়ে একটি পকেটে এসে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।[৮]

৩. শ্রমিক, কৃষক ও যারা দেশ ও জাতির স্বার্থে মেধাগত শ্রম দেয় তারাই সম্পদের প্রকৃত মালিক। তাদের উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধি দেশ ও জাতির সুখ সমৃদ্ধির নামান্তর। যে প্রশাসন দেশের উপরোক্ত উপাদানগুলোকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে সে প্রশাসন দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এমন প্রশাসন নির্মূল হওয়া বাঞ্ছনীয়। [৯]

৪. যে সমাজ শ্রমের সঠিক মূল্যায়ণ করে না, যারা শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর ওপর ভারী অংকের ট্যাক্স আরোপ করে তারা জাতির দুশমন। এমন সমাজ নির্মূল হওয়া চাই।[১০]

৫. পারিশ্রমিকের ব্যাপারে অভাবগ্রস্ত শ্রমিকের সম্মতিই যথেষ্ট নয় বরং পারস্পরিক সহযোগিতা নীতির নিরিখে যে শ্রমের যতটুকু মূল্য প্রদান আবশ্যক ততটুকু মূল্য প্রদান করতে হবে।[১১]

৬. পারস্পরিক সহযোগিতা নীতি বহির্ভূত সকল আমদানী ও উৎপাদন অবৈধ ও বেআইনী।[১২]

৭. কাজের জন্য সময় নির্ধারিত থাকা আবশ্যক। একজন শ্রমিককে এতটুকু সময় বিশ্রামের জন্য দিতে হবে যতটুকুর মধ্যে সে নিজের প্রয়োজনীয় নৈতিক ও আত্মিক সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করতে পারে এবং নিজের মধ্যে ভবিষ্যৎ (পরকাল) সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ লাভ করতে পারে[১৩]

৮. পারস্পরিক সহযোগিতার বৃহত্তর ক্ষেত্র হল ব্যবসা-বাণিজ্যের জগত। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিমালার ওপর পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। অতএব যেভাবে বণিক শ্রেণীর জন্য ব্লাক মার্কেটিং কিংবা অবৈধ কম্পিটিশন সৃষ্টি করে সহযোগিতার নীতি বিনষ্ট করা অন্যায়, অনুরূপভাবে

প্রশাসনের জন্যও বণিকদের ওপর ভারী ট্যাক্স আরোপ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিশীলতা বাধাগ্রস্থ করা অবৈধ।[১৪]

৯. যে সব কাজ কারবারে দেশীয় অর্থের সাধারণ আবর্তন বিঘ্নিত হয়ে তা বিশেষ কোন শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায় সে সব কাজ কারবার দেশীয় স্বার্থের পরিপন্থি।[১৫]

১০. রাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার যেখানে কতিপয় ব্যক্তি কিংবা কতিপয় সম্প্রদায় বিশেষের কারণে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সঠিক আবর্তন বাধাগ্রস্থ অবস্থায় থাকে সে জীবন ব্যবস্থা যতটুকু শীঘ্র নির্মূল সাধন করে বঞ্চিত মানুষের উদ্ধার এবং তাদেরকে ন্যায্য অধিকার ভিত্তিক জীবন উপভোগের সুযোগ দান করা আবশ্যক।[১৬]

রাজনীতি ও সরকার ব্যবস্থার বুনিয়াদী নীতিমালা

১১. ভূমির প্রকৃত মালিকানা মহান আল্লাহর। তবে বাহ্যিক ব্যবস্থাপনার দিক থেকে মালিকানা সরকারের। দেশের নাগরিকদের মর্যাদা হল কোন পান্থশালায় অবস্থানরত অতিথিদের ন্যায়। (সরকার ও সরকারী ব্যবস্থাপনা সেই অতিথিদের সেবক মাত্র) এখানে মালিকানার অর্থ হল ব্যক্তি তা ভোগ করার মধ্যে অন্যদের তাতে হস্তক্ষেপ আইনত নিষিদ্ধ।[১৭]

১২. সকল মানুষ পরস্পর সমান। কেউ নিজেকে সাম্রাজ্যের অধিপতি কিংবা মানব জগতের অধিপতি কিংবা সম্প্রদায় বা জনগণের দন্ডমুন্ডের মালিকানাধারী বলে কল্পনা করার অধিকার নেই। অনুরূপভাবে কেউ কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তির জন্য এ শ্রেণীর কোন শব্দ ব্যবহার করাও অবৈধ।[১৮]

১৩. একজন সরকার প্রধানের মর্যাদা হল ওয়াকফ সম্পত্তির কোন তত্ত্বাবধায়কের মর্যাদা। ওয়াকফের তত্ত্বাবধায়ক যেমন নিজে যদি অভাবী হয়ে থাকে তা হলে এতটুকু পরিমাণ ভাতা গ্রহণের অনুমতি আছে যতটুকুর দ্বারা সে নিজ দেশের একজন সাধারণ নাগরিকের জীবন যাপনে সক্ষম হবে[১৯]

মৌলিক মানবিক অধিকার

মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার সম্পর্কে হযরত শাহ সাহেব তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ও আল বুদূরুল বাযেগা প্রভৃতি গ্রন্থে (الارتفاقات) আল ইরতিফাকাত তথা জনসেবা-এ শিরোনামে সুদীর্ঘ আলোচনা পেশ করেছেন। এ আলোচনার সার-নির্যাস হল যেমন ঃ

১৪. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও এতটুকু স্বচ্ছলতা যতটুকুর দ্বারা ব্যক্তির বৈধ উপায়ে যৌন প্রয়োজন নিষ্পন্ন করা এবং সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা ও লালন পালনের ব্যয়ভার সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে–এতটুকু সুবিধা লাভ বর্ণ-ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের জন্মগত অধিকার।

১৫. অনুরূপভাবে গোত্র, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের জন্য কাজ কারবারে ন্যায়-ভিত্তিক সমান অধিকার লাভ তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, তাদের মান-সম্মান ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, নিজের মালিকানা ভোগ করার-ক্ষেত্রে অবাধ সুযোগ, নাগরিক সুযোগ সুবিধা ভোগে সমতা লাভ ইত্যাদি দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত।

১৬. নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি জীবন্ত ও অক্ষুণ্ন রাখতে সুযোগ দেয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অন্যতম মৌলিক অধিকার।

আন্তর্জাতিকতার নীতিমালা

১৭. উপরোক্ত অধিকারসমূহ অর্জন করার পদ্ধতি হল; কতগুলো স্বায়ত্ব-শাসিত (ইউনিট) অঞ্চল গঠন করা হবে। আর স্বায়ত্বশাসিত এই এককগুলো নিজেদের কাজকর্মে স্বাধীন বিবেচিত থাকবে। তবে প্রতিটি ইউনিটে ন্যূনতম এতটুকু সামরিক শক্তি থাকতে হবে যতটুকুর দ্বারা সে সমপর্যায়ের অন্য কোন ইউনিটের আগ্রাসন প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। এই এককগুলো নিজেদের সমন্বয়ে এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা (ব্লক) গঠন করবে যা সামরিক কর্তৃত্বের দিক থেকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে বিবেচিত হবে। আন্তর্জাতিক এই সংস্থার হাতে বিশেষ কোন ধর্মমত কিংবা বিশেষ কোন সভ্যতাকে কোন ইউনিটের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার থাকবে না। তবে এ সংস্থার দায়িত্ব হবে কোন সম্প্রদায় কিংবা কোন ইউনিটকে অন্য কোন সম্প্রদায়ের ধর্মমত কিংবা সভ্যতার ওপর আক্রমণ করার কোন সুযোগ না দেয়া (এবং সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা)।

১৮. ধর্মনীতি

ক. সকল ধর্মমত ও সততার মৌল বুনিয়াদ এক ও অভিন্ন। ধর্ম ও সত্যের প্রবর্তক মনীষীদের সকলে একই ধারা বাহিকতার বিভিন্ন কড়ি।

খ. সত্যের প্রতি আহবানকারী এ মনীষীদের সকল দেশেই এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের সকলেরই প্রতি সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক।

গ. সত্যতা ও ধর্মের মৌল নীতিমালা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়ই অভিন্ন। যেমন স্রষ্টার ইবাদত করা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর নামে নযর মানত, সাদকা খায়রাত, রোযা প্রভৃতি সব ধর্মেই প্রশংসিত কর্ম বলে বিবেচিত। তবে পদ্ধতি ও প্রণালীর ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

ঘ. সভ্য জগতের সকল সামাজিক নীতিমালা এবং এসব নীতিমালার উৎস ও গন্তব্য অভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ যৌন প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করা যায়। কেননা প্রত্যেক ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মতে বল্গাহীন যৌনাচার অপছন্দনীয় ও নৈতিক অপরাধ হিসাবে পরিগণিত। অনুরূপভাবে যৌন সম্পর্ক স্থাপন কাজে নারী-পুরুষের মাঝে একটি চুক্তি সম্পাদন করে নেয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মতে আবশ্যক হিসাবে বিবেচিত। তবে চুক্তিটি সম্পাদনের স্বরূপ কি হবে তা নিয়ে ভিন্নতা থাকতে পারে। তদ্রুপ সকল সম্প্রদায় নিজেদের মৃত লোকদের শবদেহ দৃষ্টির আড়াল করাকে আবশ্যকীয় বলে বোধ করে। ব্যবধান কেবল এতটুকু যে, এ মৃতকে মাটিতে দাফনের মাধ্যমে আড়াল করা হবে না আগুনে পুড়িয়ে দেবে।[২০]

জিহাদ

১৯. জিহাদ একটি পবিত্রতম দায়িত্ব। কিন্তু তার অর্থ হল কতগুলো কলুষমুক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানুষ নিজের মধ্যে আত্মনিবেদন ও আত্মউৎসর্গীতার এতটুকু প্রেরণা সৃষ্টি করা যে, এই নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করতেও প্রস্তুত।[২১]

বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় উদ্বৃতি

ওপরে যে নীতিমালার কথা আলোচনা করা হয়েছে প্রত্যেকটির শেষে সূত্রের উল্লেখ আছে। এ উদ্বৃতিগুলোর সব কয়টির অনুবাদ পেশ করা গ্রন্থের কলেবর অনর্থক বৃদ্ধি বৈ কিছুই নয়। তাই প্রয়োজনীয় এমন কতিপয় উদ্বৃতি কেবল তুলে ধরা হচ্ছে যেগুলোর আলোকে হযরত শাহ সাহেবের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে সামগ্রিক একটি অনুমান লাভ করা যায়। পাঠকমন্ডলীর সুবিধার্থে মূল বক্তব্যের কেবল অনুবাদটুকুই পেশ করা হল।

এখানে আরো স্মরণযোগ্য যে, শাহ সাহেবের জীবনামলে যদিও এদেশে ঐ সকল কলকারখানা ও মেশিনপত্রের প্রচলন ছিল না যেগুলোর সুবাদে খ্রিস্টিয় উনবিংশ ও বিংশ শতকের পুঁজিবাদ একটা বিশেষ আকার ধারণ করেছিল এবং

এমন সমস্যাবলির উদ্ভব করেছিল যা বস্তুত কমিউনিজমের জন্য বিজয়ের পথ সুগম করে দেয়। তবে এদেশের সমস্যাটি ছিল ভিন্ন ধরনের। এখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে জায়গীরদারী মসনবদারী ও ভাতা লাভের এমন কতিপয় ব্যবস্থা চালু ছিল যা সমাজের অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য দারুণভাবে বিনষ্ট করে রেখেছিল।

রাজা-বাদশা আমীর-উমরা ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সকলেই ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের জায়গীরদার ছিলেন। তারা নিজেরা বিলাসবহুল ও রাজকীয় জীবন যাপনের প্রয়োজনে দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর রক্ত চুষে খেত। অন্যদিকে খানকা নশীন, গদী নশীন ও পেশাধারী পীর দরবেশ এবং নাম সর্বস্ব আলিম শ্রেণীর লোকেরা সমাজে যেন এক ধরনের গীর্জা শাসিত ব্যবস্থা কায়েম করে রাখে। উল্লেখিত উভয় শ্রেণী শ্রম প্রদান করা থেকে ছিল অনেক দূরে। রাষ্ট্রীয় সম্পদে তাদের দ্বারা কোন প্রবৃদ্ধি অর্জিত হত না। বরং হযরত শাহ সাহেবের ভাষায় তারা ছিল রাষ্ট্রের জন্য অনর্থক বোঝার ন্যায়। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থের 'সিয়াসাতুল মদীনা' (নগর প্রশাসন) অধ্যায়ের শেষদিকে তিনি বলেন ঃ

> এই যুগে রাষ্ট্রীয় অধঃপতন নেমে আসার প্রধান কারণ দু'টি। এক. বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে যে, তারা রাষ্ট্রের কোন কাজকর্ম সম্পাদন করে না। অথচ নিজেদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সম্পদের অংশীদার হচ্ছে। যেমন কেউ ক্বারী কিংবা আলিম হওয়ার কারণে কিংবা কারুর বংশগত সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় ভাতাভোগী কোন পীর দরবেশের সঙ্গে হওয়ার কারণে কিংবা খানকা বা গদী দখল করার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ভাতা ভোগ করে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ ভণ্ড দরবেশী বা ভিক্ষাবৃত্তির অদ্ভুত ও চমৎকার কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে রাজকীয় কোষাগার থেকে অর্থ উসুল করে নিচ্ছে। এভাবে তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদের বৃহত্তর আয়তন সংকীর্ণ করে দিচ্ছে। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় কোন কল্যাণ সাধন নয় বরং নিজেদের পেট পুরণের জন্য অর্থকড়ি হাতড়িয়ে চুষে খাচ্ছে। এক দল চলে যাওয়ার পর সে স্থানে অপর দল এসে একই পেশায় লিপ্ত থাকছে। ফলতঃ দিন দিন গণমানুষের জীবনযাত্রা সংকীর্ণ হয়ে আসছে। অথচ এ সব লোকেরা দেশের জন্য অনাহূত বোঝা হয়ে ঝেঁকে বসে আছে।
>
> দুই. কৃষক, বণিক ও হস্তশিল্পিদের ওপর ভারি অংকের কর আরোপ করা হচ্ছে। তারপর এ কর উসুলের জন্য রয়েছে চরম কঠোরতার আচরণ।

ফলাফল দাঁড়াল যে, বিশ্বস্ত প্রজাদের মধ্যেও বিদ্রোহের মনোভাব জন্ম নিচ্ছে। এ বিদ্রোহাত্মক মনোভাব দমন করার জন্য আবার কঠোর শাসন আরোপের আবশ্যকতা দেখা দেয়। সীমাহীন সামরিক শক্তি ক্ষয় করতে হয়। বস্তুতঃ কোন রাষ্ট্রের কল্যাণ ও উন্নতির মূলনীতি হল কর যথাসম্ভব ন্যূনতম পরিমাণের হবে এবং প্রতিকার ও দমন বিভাগের খাতে কেবল প্রয়োজন পরিমাণের অর্থ ব্যয় হবে।

খ. অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন আধ্যাত্মিক উন্নতির ওপর নির্ভরশীল

ভারতবর্ষ এ মর্মে আজীবন গর্বিত যে, এ দেশের সভ্যতা ও রাজনীতি বিগত কোন কালে ধর্ম ও ধার্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে নি। ভারতবর্ষের অতি উচ্চমানের এক কৃতি সন্তান (শাহ ওয়ালী উল্লাহ) যাকে ইতিহাস অদ্যাবধি স্মরণ করে যাচ্ছে তিনি এ দাবীর জলন্ত সাক্ষী। কোন সন্দেহ নেই এ মনীষী একজন উচ্চপদস্থ আলিম এবং আধ্যাত্মিকতা ও নীতি শাস্ত্রের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। যারা তাকে চিনত তাদের দৃষ্টিতে তিনি আধ্যাত্ম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি 'শাহ' হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও এ আলিমে দ্বীন ও আধ্যাত্মিক দিশারীর চিন্তাধারা ছিল যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এ সমাজের মধ্যে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অধঃপতন পরিলক্ষিত হচ্ছে সে সব সমস্যা সূচিত হওয়ার প্রধান কারণ হল অসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা। বলা আবশ্যক যে, এ অসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থায়ই ভারতবর্ষের ভূখন্ডকে খরস্রোতা বানিয়ে রেখেছে।

ধর্মীয় এ মহান নেতার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বস্তুত ভারতবর্ষের বিশেষ কোন কালের পরিস্থিতির সঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরঞ্চ তার চিন্তাধারা ছিল যে, এটি মানব সমাজের আবহমান কালের নীতি। বিগত সব যুগেই অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য ব্যবস্থা ধর্মের গগনচুম্বী শক্তিশালী দূর্গগুলোকে ধুলিস্যাত করে আসছে। এ কারণেই সমাজের অর্থ ব্যবস্থার সংশোধন করা ধর্মীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিভাগে পূর্ণতা অর্জনের সর্ব প্রথম সিঁড়ি হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। এমনকি এ ধর্মীয় মহান নেতা সমাজের অর্থ ব্যবস্থার সংশোধন কার্যক্রমকে নবীগণের আনীত আসমানী শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়' তিনি জীবিকার উপায় উপকরণসমূহের ওপর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

'মুহাম্মদ (সা)-এর জগতে প্রেরিত হওয়ার সময়ে পৃথিবীর অবস্থা ছিল এমন যে, ভোগ বিলাসের জীবন যাপন সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পায়। রাজকীয়

আড়ম্বরতার ব্যাধি (যা দেশ ও জাতিকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থার দ্বারা অধঃপতিত করে রেখেছিল) পারস্য, রুম ইত্যাদি দেশে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তার নবীর অন্তরে এ মর্মে হুকুম অবতীর্ণ করেন যেন কেবল ব্যাধির উপশমই নয় বরং ক্ষতিকর জীবাণু-গুলোও নিমুর্ল হতে পারে। সেমতে প্রিয়নবী (সা) এ ব্যাধির জীবাণুগুলো যে সকল কারণে সৃষ্টি ও লালিত হয় সে সবের ওপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করেন। তারপর প্রত্যেকটি ব্যাধি ও ব্যাধির জীবাণু চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। (জীবিকা উপার্জন অধ্যায়, পৃঃ ৯৮ খ.২)।

হযরত শাহ শাহের উপরোক্ত বক্তব্যটি উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র বিস্তারিতভাবে পেশ করেছেন। তার পূর্ণ বক্তব্য যদিও বেশ দীর্ঘ কিন্তু বিষয় বস্তুটি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা তার পূর্ণ কথাগুলোই তুলে ধরছি। চমৎকার ব্যাপার হল যে, আপনি অষ্টাদশ শতকের এক মুসলমান আলিমকে দেখবেন তিনি যেন বিংশ শতকের কোন কমিউনিষ্টের ভাষায় বক্তব্য রাখছেন।

ঐতিহাসিকভাবে এ কথা বাস্তব সত্য যে, প্রিয়নবী (সাঃ) এ জগতে প্রেরিত হওয়ার সময়কালে (অর্থাৎ খ্রিস্ট্রিয় সপ্তম শতকে) পারস্য ও রোমের রাজত্ব চরম উত্থানের যুগ অতিক্রম করছিল। কিন্তু তাদের সামাজিক অর্থ ব্যবস্থায় পারস্পরিক অসহযোগিতা তাদের মুল ভিত্তিকে সম্পূর্ণ অন্তসারশূন্য বানিয়ে রেখেছিল। হযরত শাহ শাহের সেই দুই সাম্রাজ্যের ইতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করে তাদের অর্থ ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিকগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেশ করার জন্য স্বযুগের রাজা-বাদশাদের জীবন থেকে উদাহরণ টেনে এনে তার নিম্নোক্ত দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেন। বক্তব্যটি নিম্নরূপ ঃ

ভারতবর্ষের অর্থ ব্যবস্থার শোচনী অবস্থায় ও তার কারণসমূহ

হযরত শাহ সাহেব বলেন, ' পারস্য ও রোমের পূর্ব ইতিহাস আমাদের জন্য সুস্পষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া তোমরা তোমাদের দেশেও যা প্রত্যক্ষ করছ তার আলোকেও তৎকালীন পারস্য ও রোমের পরিস্থিতি অনুমান করে নিতে পার।'

ধন-দৌলতের উন্নতির সাথে সাথে দর্শন ও বিজ্ঞানের উন্নতি নতুন নতুন আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত করে। নতুন নতুন শিল্প কারখানা আত্মপ্রকাশ শুরু করে এবং গোটা দেশ নিজের এ যুগে সভ্যতার দিক থেকে পূর্বের তুলনায় অনেক উচ্চমান লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপর যে, সাথে সাথে ধনিক ও

ক্ষমতাসীন শ্রেণীর মধ্যে (প্রতিষেধক হীনতার কারণে) ক্রমে ভোগ বিলাসিতা, ফ্যাশন, নাম-ডাক কিংবা ক্ষমতার লিপ্সা ও একজন অন্যজনের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক অহংকার প্রকাশের ব্যাধি সৃষ্টি হতে থাকে। তারপর এ ব্যাধি বৃদ্ধি পেয়ে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, কার মাথার মুকুট অধিকতর মূল্যবান আর কার সিংহাসনে বেশি পরিমাণের মনিমুক্তা খচিত আছে সে বিষয়ের ওপরেও অহংকার প্রকাশ করতে শুরু করে।

প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে এ ধরনের জাকজমক ও প্রার্চুয্য সমাজ মস্তিষ্ককে বিগড়ে দেয়। এদিকে নতুন নতুন ফ্যাশন, আমীরানা জাঁকজমক ও রাজকীয় আড়ম্বরতা নির্বাহ করার প্রয়োজনে ক্ষমতাসীন লোকেরা প্রত্যেকে নিজের অধীনস্তদের কাছ থেকে সম্পদ লুটতে শুরু করে। জমিদার ও জায়গীরদার শ্রেণী অধীনস্ত কৃষকদের রক্ত চোষে। সামান্য শ্রমিকদের ওপর যাদের কর্তৃত্ব ছিল তারাও দরিদ্র শ্রমিকদের ওপর শোষণ চালায়। এর ফলে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী প্রতিটি শ্রেণীর চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের সমুদয় শক্তি রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রীয় সম্পদের উন্নতি সাধনের পথে ব্যয় হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের ভোগ বিলাস রক্ষা, রাজকীয় আড়ম্বরতা অর্জন, মুনাফা উত্তোলন এবং জবরদস্তিমূলক ভাবে কর আরোপন ইত্যাদির ব্যাপারেই ব্যয় হতে থাকে। ফলে অধীনস্ত প্রজা শ্রেণী এতখানি নীচে গিয়ে পতিত হয় যে, তাদের জীবনযাত্রা চাষের বলদ কিংবা বোঝাবাহী গাধা অপেক্ষা ভাল কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

অন্যদিকে অর্থ সংগ্রহ ও সম্পদ হাতড়িয়ে নেওয়ার জন্যও নতুন নতুন আইন সৃষ্টি হতে থাকে। শ্রমিক ও চাষী শ্রেণী যদি ঐ সকল আইন অমান্য করার চেষ্টা করে তাহলে তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে নানাবিদ শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। আর শাস্তি থেকে বাঁচতে চাইলে গত্যান্তরহীনভাবে তাদেরকে ভারবাহী গাধা ও ঘোড়ার জীবন অবলম্বন করতে হবে। উপরোক্ত শ্রেণীদ্বয় নিজ নিজ অবস্থার ওপর এতটা চরমে পৌঁছে যায় যে, পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি কেন ও কি উদ্দেশ্যে হয়েছিল তা আর কারুর সামনেই উপস্থিত থাকতে পারেনি। তম্মধ্যে একটি শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের আতিশয্য ও সম্পদের প্রাচুর্য্য সম্পূর্ণ অন্ধ বানিয়ে রাখে আর অপর শ্রেণী নিজেদের প্রাণ রক্ষা ও পেটের ধান্ধায় এতই অবনমিত হয় যে, ভবিষ্যত তথা আখিরাত চিন্তার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। এ পরিস্থিতির অবশ্যাম্ভাবী ফলাফল ছিল যে,

দেশের সকল ধন-সম্পদ সংকুচিত হয়ে বিশেষ কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে যাদের নেতা ছিলেন স্বয়ং সম্রাট।

অর্থ ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা ও উচ্চ শ্রেণীর জাঁকজমক ও ভোগ-বিলাস স্পৃহা তৃতীয় আরেকটি শ্রেণীকেও জন্ম দেয়। এটি হল শরীর পুজারী আরাম প্রিয়, সরকার সেবী ও খোশামুদে তথা মোসাহেবদের শ্রেণী। এরা সম্রাট ও সম্রাট সেবাদানদের চারপাশে ঘিরে থাকত আর বিভিন্ন শিরোনাম দিয়ে তাদের কাছ থেকে পয়সাকড়ি উসুল করত। এ শ্রেণীর মধ্যে অনেক দক্ষ পন্ডিত ও আলিমরাও যোগ দিয়ে নিজেদের দক্ষতা ও পান্ডিত্ব দেখিয়ে পয়সাকড়ি উসুল করে নিত। তাদের বস্তুত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেশের কোন কল্যাণ সাধন নয়, নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার। নিজেদের নাম ডাক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য। তাদের কেউ নিজেকে সেনাপত্যে দক্ষ পরিচয় দিয়ে পয়সা উসুল করত। কেউবা নিজের ইলম ও পান্ডিত্ব কিংবা কূটনীতি জ্ঞানের পরিচয়ে ওযীফা মঞ্জুর করাত। এভাবে খানকা ও দরবারের গদীনশীনদের একটি দল ছিল যারা নিজেদের পাক-পবিত্রতা ও পরহেযগারীর বাহানায় ওযীফা চেয়ে আনত। খোশগল্প, সাহিত্য চর্চা ও কবিত্বের নামে একদল পয়সা ভাগিয়ে নিত কেননা খসরুসুলভ চরিত্রের দাবীই হল এ সকল সাহিত্যসেবী দক্ষ ব্যক্তিদের যথাযোগ্য কদর করা।

রাজা-বাদশা ও আমীর উমারাকে সন্তুষ্ট করা, খোশগল্পের দ্বারা আসর গরম করে রাখাকে এক ধরনের শাস্ত্র বলে অভিহিত করা হল। তারপর এ শাস্ত্রের দক্ষ লোকের নানা রকমের ঢং অবলম্বন করে পয়সা উসুল করতে থাকে। রাজকীয় শিষ্টাচার, দরবারী শিষ্টাচার ইত্যাদিও বিশেষ শাস্ত্রের আকার লাভ করে। একদল শুধু এ নাম বিক্রয় করে রাজ দরবার থেকে পয়সা কামাই করে নেয়। উপরোক্ত সবগুলো শ্রেণী যাদেরকে সভ্যতার অঙ্গ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে বাস্তব ক্ষেত্রে তারা সভ্যতার অঙ্গ নয় বরং এরা হল বিনাশ্রমে অর্থ ভোগীদের দল। দেশ ও জাতির কল্যাণে তাদের কোন অবদান নেই। তারা নিজেদের সকল যোগ্যতা ও দক্ষতা মুষ্ঠিবদ্ধ করে সম্রাট পুজারীদের মতলব উদ্ধার ও তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের পেছনে ব্যয় করে থাকে এবং দেশ ও দেশের শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষকদের ওপর দিন দিন বোঝা বৃদ্ধি করে থাকে। আর এভাবে মহান আল্লাহর বান্দারা দিন দিন অভাব-অনটন, দারিদ্র্য ও শোচনীয় অবস্থার দিকে গড়িয়ে পড়ে এবং আধ্যাত্ম জগতের সফলতা ও

কল্যাণ লাভ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। পরিশেষে গোটা দেশের মধ্যে এমন একজন লোকও অবশিষ্ট থাকে না যে নিজের আখিরাত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষের রব ও প্রতিপালক। তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এমতাবস্থায় মানুষের মধ্যে প্রেরণ করলেন যেন তিনি মানুষের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সংশোধনসহ অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থা থেকেও মুক্তি দিতে পারেন। সেমতে প্রিয়নবী (সাঃ) মানুষের জীবন ও জীবিকার এমন নীতিমালার প্রবর্তন করেন যার দ্বারা অর্থনীতির জগতে বিদ্যমান সকল রোগ-ব্যাধির বিষাক্ত জীবাণুগুলোর নির্মূল ঘটতে পারে।'

হযরত শাহ সাহেব তার উপরোক্ত বক্তব্য তুলে ধরার পর অর্থনৈতিক অবস্থা মানুষের রূহানী ও আধ্যাত্মিক সংশোধনের ওপর কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে তার একটি উদাহরণ পেশ করেন। এ উদাহরণ থেকেও অনুমান করা যায় যে, তিনি যে সরকার ব্যবস্থার সমর্থন করছিলেন সেটির রূপরেখা কি ধরনের হত। তিনি বলেন ঃ

এমন একটি জাতির কথা কল্পনা কর যেখানে রাজতন্ত্র নেই, যে জাতি রাজকীয় জাঁকজমক ও বিলাস পুজার সকল আয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেখানে প্রজাদের সকলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন এবং ভারী করের বোঝা বহন থেকে নিরাপদ জীবন-যাপন করছে। সে জাতির পক্ষে সহজ ও সম্ভব যে, তারা নিজ ধর্ম ও নিজ জাতির স্বার্থে কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন করতে পারে। তাদের জন্য সহজ নিজেদের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করা। পক্ষান্তরে যদি এই সম্প্রদায়ের কাঁধের ওপর রাজতন্ত্র, সম্রাট পুজা ও পুঁজিবাদের ভূত সওয়ার হয় তাহলে তাদের বিবেক, দিশা ও অনুভূতি সব কিছুর বিলুপ্তি ঘটবে। তারা মানবীয় মর্যাদা ও সম্মানের আসন থেকে ছিটকে গিয়ে ইতর প্রাণীর জীবন অবলম্বনে বাধ্য হবে। ফলতঃ রাতদিন কেবল পেটেরই ফিকির চলবে তারপরেও সেই জাহান্নামের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারবে না। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১ম খন্ড)।

গ. গণমানুষের জীবনে সুখ-শান্তি স্থাপিত হওয়ার মূলনীতি ও অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থা রোধের প্রথম শর্ত

সুখী জীবন সকলের কাছেই স্বপ্নের বস্তু। বিগত দেড়শতক কাল বিশ্বজগতের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে সকল বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করেছে তার

সবগুলোরই ইশতিহারে ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এটিই। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল দেশের আপামর জনসাধারণ যেন তৃপ্তি ও শান্তির জীবন-যাপন করার সুযোগ পায়। তারপর মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি আনয়নের নানাবিদ কর্মসূচিও বানানো হল। আবার মানুষের উপরই সেই কর্মসূচির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হল। কিন্তু প্রশ্ন তাদের সেই আশা কি পূর্ণ হয়েছে ? কোন সন্দেহ নেই বিগতকালে এ সকল স্বপ্নময় বিপ্লবের নামে সূচিত ঝড়ের কারণে মানুষের শরীরের রক্ত দ্বারা বহু নদী প্রবাহিত হয়েছে বটে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য কোন জাতিই অর্জন করতে পারেনি। যে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এত শ্রম সাধনা ব্যয় করা হয়েছে তার কিছুই অর্জিত হয়নি। হযরত শাহ সাহেবের চিন্তাধারা যদি সামনে রাখা হয় তাহলে বিগত কালের আন্দোলনগুলো ব্যর্থ হওয়ার কারণ হিসাবে একটি বিশেষ রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যা বিগত ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সকল বৈপ্লবিক আন্দোলনের কাছে উপেক্ষিত হয়ে আসছিল।

এ কথা সত্য যে, এ সকল আন্দোলনের ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ ঘটেছে। কিন্তু যে সকল উপাদান মানুষের মনমস্তিষ্কে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের বীজরোপন করে সে সকল জীবাণুর নির্মূল করা হয় নি। বরং কখনও কখনও স্বয়ং বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের নীতি ও কর্ম সে বিষাক্ত জীবাণুর শক্তি বৃদ্ধির কাজেও সহায়তা করে যায়। চিন্তাধারা ও কর্মের এই বৈপরীত্যের ফল স্বরূপ পুঁজিবাদ ও সম্রাট পুঁজা নির্মূল হওয়া সত্ত্বেও শান্তির মাকাল হস্তচ্যুত হয় এবং সমাজের অশান্তি ও অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ধর্মের আলোকে শাহ সাহেবের অভিমত ছিল স্বর্ণ-পৌপ্যের স্তুপ বানিয়ে রাখা থেকেও অধিকতর জঘন্য বিষয় হল সামাজিক জীবন-যাপনের সেই অশুদ্ধ পদ্ধতি যা ধনী ও দরিদ্রের মাঝে একটা ব্যবধান কায়েম করে রাখে। কেননা এ ব্যবধান দরিদ্র মানুষের মনে পুঁজিপতি হওয়ার লোভ এবং সম্রাট সেবার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে। ব্যবধানকারী উপকরণ তথা স্বর্ণ-রৌপ্যের থালা বাটি, অলংকার খচিত পোষাক, নানা রকমের ফ্যাশন ও আড়ম্বরতা একদিকে ধনী ও সম্পদশালীদের মনে গর্ব অহংকার ও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ববোধের জন্ম দেয় আর অপরদিকে দরিদ্রদের মনে নানা রকমের লোভ-লালসা ও অস্থিরতার উদ্রেক করে থাকে। এই লোভ-লালসা আবার তাদের মধ্যে অবৈধ উপার্জন, ঘুষ গ্রহণ, চুরি, আমানতের খেয়ানত, চাঁদা, জবরদস্তি উসুল ও ব্যভিচারমূলক কার্যকলাপের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। মোট কথা হল সামাজিক জীবনে নানা রকমের আড়ম্বরতা

অবলম্বন বস্তুত পুঁজিতন্ত্র ও রাজা-প্রজা ব্যাধির সৃষ্টিকারী এমন বিষাক্ত জীবাণু যে, যতকাল পর্যন্ত আইন এগুলোকে বৈধ রাখবে ততকাল পর্যন্ত বস্তুত পুঁজিবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিই সুদৃঢ় হতে থাকবে। আর বিপরীত পক্ষে এই জীবাণু ততকাল পর্যন্ত দরিদ্র ও লোভী মানুষের মনে অন্যায় অপরাধের প্রতি ঝোক প্রবণতা বৃদ্ধি করে যাবে।

হযরত শাহ সাহেব সমাজের এই একটি শ্রেণীর প্রাচুর্যময় জীবন যাত্রা যা নানা রকমের আড়ম্বরতার দ্বারা সুশোভিত হয়ে থাকে এবং যা সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় তাকে 'চরম ভোগ বিলাস' বলে নামকরন করেছেন। তার মতে এই চরম ভোগ বিলাস যে কোন সমাজের জন্য এমন জঘন্যতম অপরাধের বস্তু যার বিরুদ্ধে লড়াই করা পবিত্রতম জিহাদ হিসাবে বিবেচিত। তার রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলোও এহেন চরম ভোগ বিলাসের নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ।

জিহাদ

ওয়ালী উল্লাহী আন্দোলনের বাস্তব কর্মসূচির মধ্যে জিহাদ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু বিগত এক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় সাংবাদিক ও লেখকরা জিহাদ শব্দটিকে এতখানি বিকৃত ও দূর্নাম করে দিয়েছে যে, একজন সুস্থ বিবেকবানের পক্ষেও এ শব্দটি থেকে তার ইসলামী সঠিক অনুভূতি পর্যন্ত পৌঁছা সুকঠিন হয়ে গিয়েছে। কাজেই এখানকার আলোচনার ফাঁকে জিহাদ সম্পর্কেও হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তাধারা কি ছিল সে বিষয়ে সম্যক আলোচনা পেশ করা আবশ্যক মনে করছি।

আভিধানিক অর্থ

আভিধানিকভাবে জিহাদ শব্দের অর্থ হল অধিক থেকে অধিকতর পর্যায়ের চেষ্টা করা, প্রাণান্তকর সাধনা চালিয়ে যাওয়া।

এ চেষ্টা ও সাধনা যদি ব্যক্তি স্বার্থের পংকিলতা থেকে পবিত্র হয়ে কেবলমাত্র ন্যায়ের বিজয় ও সত্যকে সমুন্নত করার জন্য ব্যয় হয় তাহলে এ উদ্যোগ একটি হিতকর ও কল্যাণকর বিষয় তাতে কারুরই দ্বিমত থাকতে পারে না।

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি আরো উন্নত। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ তো নয়ই, সাম্প্রদায়িক কিংবা গোত্রীয় স্বার্থের ধুলাবালি থেকেও জিহাদকে পবিত্র রাখা হয়েছে। কুরআনে হাকীমের দৃষ্টিতে কোন সার্বজনীন সত্য ও ন্যায়, মানবীয়

মর্যাদা ও সম্মান এবং উন্নত নৈতিকতা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে চেষ্টা ও সাধনা চালানো হয় তাকে এই শর্তে জিহাদ নামে অভিহিত করা যাবে যে, এখানে ব্যক্তিগত, গোত্রীয় কিংবা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সিদ্ধি তথা কর্তৃত্ব লাভ কিংবা সমাজে বিশৃঙ্খলার সূচনাকারী কোন সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব বিদ্যমান থাকবে না।[২২]

এ জিহাদের কর্মীরা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ চিন্তা ও কুপ্রবৃত্তির খায়েশ পূরণ থেকে এতখানি দূরত্ব বজায় রেখে চলেন যে, নিজের বীরত্ব প্রকাশ কিংবা নিজ গোত্র ও বংশের সুনাম চিন্তা কিংবা রাজনৈতিক বিশ্বে নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জন বা ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় থাকার কুচিন্তা থেকেও মন-মস্তিষ্ককে পূর্ণ পরিচ্ছন্ন রাখেন।[২৩]

এ চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর সময় বিপরীত পক্ষকে পরাজিত করা এবং নির্মুল করার আকাংখা নিঃসন্দেহে কার্যকর থাকবে। কিন্তু এ আবেগ ও আকাংখা স্বার্থ চিন্তা ও সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে থাকবে সম্পূর্ণ পবিত্র। আর এ পর্যায়ের অভিযান তখনই চালানো হবে যখন বিপরীত পক্ষকে তাদের ভুল সংশোধিত করার যাবতীয় চেষ্টা চালানোর কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় মানবতার উন্নত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংরক্ষিত রাখার স্বার্থে রোগীকে অপারেশন করার ন্যায় অগত্যা নির্মুলকরণ অভিযান নিঃসন্দেহে আবশ্যক। কোন সন্দেহ নেই এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হলে এমন জযবা ও আবেগকে একটি পবিত্র আবেগ এবং এমন বৈরীতা একটি পবিত্র বৈরীতা বলে মেনে নিতে কারুর দ্বিধা থাকে না।

পারিভাষিক অর্থ

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ জিহাদ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে যে সংক্ষিপ্ত ও সামগ্রিক অর্থবহ শব্দমালার ব্যবহার করেছেন তা আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করছে। তিনি বলেন ঃ

الجهاد شرواق القداوة القدسية فى صورة القتل والامر،

অর্থাৎ জিহাদ বলতে প্রতিপক্ষকে হত্যা কিংবা বন্দী করার লক্ষ্যে এমন এক শত্রুতাভাবের বীরত্বপূর্ণ প্রকাশকে বুঝায় যা ব্যক্তি স্বার্থ ও প্রবৃত্তির খায়েশ চরিতার্থকরণ থেকে পবিত্র। বরং সার্বজনীন কল্যাণ, মানবতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সংরক্ষণ এবং সর্বোচ্চ উপকারিতা সম্পাদনের জন্য পরিচালিত।

আলোচ্য সংজ্ঞায় শক্রতা ও বৈরীতার সাথে পবিত্রতা শব্দের বিশেষণ আপাত দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই বেমানান। কিন্তু জিহাদের মৌল রহস্য প্রকাশের জন্য এ বেমানান বিশেষণের প্রয়োগ আবশ্যক। কারণ নিজের প্রিয় জীবন উৎসর্গীতকরণ এবং অন্যের জীবন সংহার করার মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণেরও কোন ব্যক্তি স্বার্থ কিংবা খায়েশ চরিতার্থের মিশ্রণ দেখা যায় তা হলে সেটি ইসলামের জিহাদ হতে পারে না। স্বার্থের ঘ্রাণ পাওয়া গেলে তখন সেটি হবে অজ্ঞতা, বর্বরতা ও অবৈধ হত্যাকান্ড।

হযরত শাহ সাহেবের দৃষ্টিতে জিহাদের মূহুর্তে একজন সত্যসেবী কর্মী নিজে নিজের উপরও কোন কর্তৃত্ব রাখেন না। ন্যায়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে যা কিছু করা দরকার তিনি ন্যায়ের একান্ত অনুগত ও ক্রীড়নক হিসাবে তাই করে যাবেন। সত্য ও ন্যায়ের যা দাবী সেটিই তার অন্তিম ইচ্ছা হিসাবে গণ্য। আর সেই দাবী পুরণে তিনি নিজের সবকিছু উৎসর্গীত করে যাবেন।[২৪]

শাহ সাহেবের বিশ্বাস হল যে, স্বার্থকামী লোকদের স্বার্থ উদ্ধার প্রবণতা যখন কোন সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন সে সমাজ ও দেশের স্থিতি নিরাপত্তা কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেখানকার নাগরিকদের মধ্যে জীবন-যাপনে শান্তি, কাজ কারবারে স্বাধীনতা, সুখ-সমৃদ্ধি, মতামতের স্বাধীনতা ইত্যাকার সকল মানবিক ও নাগরিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত হতে থাকে। এমন মূহুর্তে অত্যাচারী উদ্ধত পেশি-শক্তিকে সমাজ থেকে নির্মূল করে গণমানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ন্যায় ও ইনসাফের একান্ত দাবীর আকার ধারণ করে।[২৫] কেননা এ অত্যাচারী শক্তি গোটা মানব সমাজের জন্য অশান্তির কারণ হয়ে আছে। বিশেষতঃ যে দেশ ও সমাজের সব লোক একটি দেহের ন্যায় অবিচ্ছিন্নতার জীবন যাবন করে সেখানে এ ধরনের উদ্ধত আচরণ শরীরে ক্যানসার ব্যাধির ন্যায়। বলা বাহুল্য মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল যে কোন ব্যক্তি যেমন গোটা শরীরকে বাঁচানোর জন্য ক্যানসারের অপারেশন করাকে আবশ্যক মনে করে[২৬] ঠিক তেমনি একজন সত্যসেবী মুজাহিদ ব্যক্তিত্ব সমাজের বৃহত্তর দেহ থেকে মানবিক অধিকার লুণ্ঠনকারী ক্যানসার শক্তিকে মুলোৎপাটিত করা নিজের নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য বলে জ্ঞান করে এবং সেই লক্ষ্যে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গীত করে দেয়।[২৭]

কবির ভাষায় ঃ

یاتن رسد بجاناں ، یا جاں زتن برآید

ইসলামের শিক্ষা ও হযরত শাহ সাহেবের চিন্তাধারা অনুসারে এখানে যে জিহাদের কথা উল্লেখ করা হল সে পবিত্র কর্তব্যের পূর্ণ পবিত্রতা বজায় রেখে কেবল এমন একটি দলই তা বাস্তবায়ন করতে পারে যারা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। যাদের প্রত্যেক সদস্য নিজের জীবন থেকে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থের প্রবণতা খতম করে দিয়ে মানবতার উন্নত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য নিজ নিজ জীবনকে নিবেদিত করতে সক্ষম হয়েছে।

কবির কণ্ঠে ঃ

در کف جام شریعت در کف سنداں عشق
هر هو سنا کے نداند جام وسنداں باختن

এখানে আরও একটি কথা জানিয়ে দেওয়া উচিৎ হবে যে, জিহাদের প্রাণশক্তি নিজের নফস ও খায়িশকে সংযত করা, ধৈর্য্য ও অবিচলতা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বরন এবং এমন এক আবেগের মধ্যে নিহিত যা যে কোন কষ্টকে আনন্দের বস্তু বানিয়ে এবং মৃত্যুকে পরম ইচ্ছার পেয়ালায় পরিণত করে দেয়।

মহাত্মা গান্ধী অহিংসা ও সীতাগড়ার নীতির উপর স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালনা করেন। সীতাগড়া অহিংসা ও জিহাদ এ শব্দগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। কিন্তু সবগুলোর মধ্যে একটি প্রাণশক্তি পাওয়া যায় তা অভিন্ন। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গীত করার এক অদম্য প্রেরণা।

আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, বস্তুত অহিংসার নীতি জিহাদেরই একটি খণ্ডিত রূপ বিশেষ। যা বিশেষ কোন পরিস্থিতির দাবী অনুসারে গৃহীত হয়ে থাকে।[২৮]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে মহাত্মা গান্ধীর সীতাগড়া ও অহিংসা নীতির যথেষ্ট দখল রয়েছে। ১৯৪৭ সালের বিপ্লবকে এ আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি বলা চলে। এতদসত্ত্বেও গান্ধীজী পরিচালিত এ আন্দোলনের ত্রিশ[২৯] বছরের ইতিহাসে কতজন যুবক সেই অহিংসা নীতির ওপর পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ লাভ করেছে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। অথচ এ যুগটি ছিল এমন এক যুগ যখন বিজ্ঞান ও প্রগতির বহু উপায় উপকরণ গান্ধীজীর হাতে মওজুত ছিল। তাছাড়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বেশি পরিমাণে তারই সমর্থনে ছিল। এবং দেশের আপামর মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আবেগ-আকাংখা পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় অনেক পরিমাণে

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ছিল। তারপরেও খুব বেশি সংখ্যক যুবককে তার অহিংসা নীতির ওপর পূর্ণ প্রশিক্ষিত বলে দেখানো যায় না।

অথচ ভাবতেও অবাক লাগে যে, যে কালে এই বিংশ শতকের ন্যায় অপর পর্যন্ত নিজের চিন্তাধারা ও আদর্শ সম্প্রসারিত করার অত্যাধুনিক উপায় উপকরণের কোনই অস্তিত্ব ছিল না, সে কালে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ শুধু নিজ জীবনেই নয় বরং মৃত্যুর পরেও প্রায় অর্ধ শত বর্ষ কাল পর্যন্ত এমন একটি ফৌজ বিদ্যমান রেখে যান যাদের সকলে তার জীবনাদর্শ ও নীতির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং আমরণ তা নিরবচ্ছিন্নভাবে ধরে রাখে।

টীকা ঃ

১. নাদির শাহ ১৭৩৮/১১৫১ সালে যে গণহত্যা চালিয়েছিল তাতে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে কোন তফাৎ করা হয়নি। বরঞ্চ মুসলমানদের তখন ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল বেশি। কেননা তৎকালে ভারতবর্ষের শাসন দন্ড ছিল মুসলমানদের হাতে। তারাই ছিল নাদির শাহের বিপরীত শক্তি। তাদেরই কাছে রক্ষিত ছিল রাজ্যের সমুদয় ধনভান্ডার। তাদেরই ভুল পদক্ষেপ নাদিরকে এহেন গণহত্যা চালাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন শানদার মাযী ২য় খন্ড) আহমদ শাহ আবদালীর বৃহত্তর সংঘর্ষ ঘটেছিল মারাঠাদের সাথে। কিন্তু তার পুনঃ পুনঃ আক্রমণের কারণে মুসলমানদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সামগ্রিক দিকের বিবেচনায় মোটেই কম ছিল না। শামসুল উলামা মরহুম যাকাউল্লাহ খান বলেন, নাদির শাহের শক্তি প্রদর্শন মাত্র দু'দিনের জন্য স্থায়ী ছিল। পক্ষান্তরে আহমদ শাহ আবদালীর দুর্ধর্ষ বাহিনী দীর্ঘ দু'মাস যাবৎ দিল্লী শহরকে এভাবে লুটে নিতে থাকে যে, ভয়ংকর অন্ধকারকেও বিস্মৃত করে দেয়। আবদালী যদিও প্রকৃতিগত ও মনমেজাযের দিক থেকে নাদির শাহের ন্যায় নির্মম ও রক্ত পিপাসু ছিল না কিন্তু তার সৈনিকরা নাদির শাহের সৈনিকদের তুলনায় ছিল অধিকতর পাষাণ্ড ও বর্বর। তারা আবদালীর নির্দেশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনি। ১৭৫৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এই সৈনিকরা দিল্লীতে অনুপ্রবেশ করে, তারপর দীর্ঘ দু'মাস যাবৎ লুণ্ঠন তৎপরতা অব্যাহত রাখে। বড় বড় উচ্চপদস্ত আমীরদের বাড়ীঘরে ঝাড়ুর শলাটুকুও অবশিষ্ট রেখে যায়নি।

২. ১৭৪৭/১১৬০ সালে নাদির শাহ নিহত হয়। তার সৈনিকরা তদস্থলে আহমদ শাহ আবদালীকে নিজেদের সম্রাট হিসাবে বরণ করে নেয়। একই বছর অর্থাৎ ১৭৪৭ সালে আবদালী ভারতবর্ষ অভিমুখে আক্রমণ শুরু করে। পলাশী যুদ্ধের বছর (১৭৫৭/১১৭০) তিনি মুথরা ও দিল্লী অঞ্চলে লুণ্ঠন চালিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। পানিপথের সর্বশেষ যুদ্ধ যেখানে মারাঠাদের অস্বাভাবিক ভরাডুবি ঘটে সেটি পলাশী যুদ্ধের সাড়ে চার বছর পর ৬ই জুমাদাল উখরা ১১৭৪ হিঃ মোতাবেক ১৪ জানুয়ারি ১৭৬১ সালে সংঘটিত হয়েছিল।

৩. তুর্কীদের অধিকৃত ইউরোপীয় অঞ্চলসমূহ।

৪. কিতাবুত তামহীদ ফী আইম্মাতিত তাজদীদ, শাহ ওয়ালী উল্লাহ কী সিয়াসী তাজরীক পৃ.১৪-এর অবলম্বনে।

৫. ধর্মীয় পরিভাষায় এ গুণকে লিল্লাহিয়্যাত বলে। লিল্লাহিয়্যাতের অর্থ হল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করা। কথাটির ব্যাখ্য হল ; সমস্ত সৃষ্ট জগত আল্লাহ তা'আলার পরিবারের ন্যায়। সৃষ্ট জগতের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম যিনি মহান আল্লাহর এ পরিবারের প্রতি কল্যাণকামী হবেন, যিনি তাদের কল্যাণে আত্মনিবেদিত থাকবেন। তবে এ উদ্দেশ্য নিয়ে নয় যে, সৃষ্টজগত তাঁর প্রতি ঋণী হয়ে থাকবে কিংবা তার সুনাম সুখ্যাতি বৃদ্ধি পাবে কিংবা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে তাকে স্মরণ করা হবে। বরং তার উদ্দেশ্য থাকবে এমন যে, আমি মহান আল্লাহর বান্দা ! আল্লাহর ইবাদত করা এবং সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বনের দাবী হিসাবে, বিশেষতৎ একজন ভদ্র মানুষ হিসাবে আমার নৈতিক দায়িত্ব হল নাম কামানোর পেছনে না পড়া। এমনকি নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব অর্জনও উদ্দেশ্য নয় ; উদ্দেশ্য হল এ সকল স্বার্থের উর্ধ্বে আরোহণ করে নিজের পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদন করে যাওয়া।

৬. এখানে শুধু শিরোনামগুলো পেশ করা হচ্ছে। এসব শিরোনামের সমর্থনে হযরত শাহ সাহেবের গ্রন্থাবলি থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি এবং উদ্ধৃতিসমূহের জরুরী ব্যাখ্যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

৭. দেখুন এক. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, সিয়াসাতুল মদীনা অধ্যায় দুই. আল বুদূরুল বাযেগা, আল ইরতিফাক অধ্যায়, তিন. আল খাইরুল কাছীর।

৮. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, রিযিকের অন্বেষণ অধ্যায়।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. ঐ গ্রন্থ, মিয়ামাতুল মদীনা অধ্যায় এবং সমাজে প্রচলিত রুসুম ও প্রথা অধ্যায়।

১১. ঐ গ্রন্থ, রিযিকের অন্বেষণ অধ্যায়।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. ঐ গ্রন্থ, ইকামাতুল ইরতিফাকাত ওয়া ইসলাহুর রুসূম এবং খাবতুল মুবহাম অধ্যায়।

১৪. ঐ গ্রন্থ, নিষিদ্ধ কেনাবেচা অধ্যায়।

১৫. ঐ গ্রন্থ, আল ইরতিফাকুর রাবি অধ্যায়, নিষিদ্ধ কেনাবেচা অধ্যায়।

১৬. ঐ গ্রন্থ, সমাজে প্রচলিত প্রথা প্রচলন অধ্যায়, সিয়াসাতুল মদীনা অধ্যায়, রিযিকের অন্বেষণ অধ্যায়, নিষিদ্ধ কেনাবেচা অধ্যায়।

১৭. ঐ গ্রন্থ, রিযিকের অন্বেষণ অধ্যায়।

১৮. মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ রচিত 'মানসবে ইমামত' বিভ্রান্ত সরকার ব্যবস্থা অধ্যায়।

১৯. ইযালাতুল খাকা, ২য় খন্ড, ফারুকে আজমের শাসনকাল অধ্যায়।

২০. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, 'আসলুদ দীনে ওয়াহিদুন' অধ্যায় আল বুদুরুল বাযেগা, 'হাকায়েকুল ইরতিফাকাত' অনুচ্ছেদ, ও মাকালায়ে ছালিছা, প্রভৃতি।

২১. আল বুদুরুল বাযিগা, আল ইবতিফাকুছ ছালিছ অধ্যায়, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২য় খন্ড, পৃৎ ১৫৭।

২২. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الارض ولا فساراً والعاقبة للمتقين

অর্থাৎ এটি আখিরাতের সেই আরাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে কিংবা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। (কাসাস, ২৮ঃ৮৩)।

২৩. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل بقاتل شجاعة ويقاتل حمية فاى ذالك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا

অর্থাৎ প্রিয়নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি নিজের বীরত্ব প্রকাশের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং নিজের গোত্র কিংবা সম্প্রদায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য লড়াই করে সে ব্যক্তিকে কি মহান আল্লাহর পথের সৈনিক বলা যাবে ? প্রিয়নবী উত্তরে বললেন মহান আল্লাহর পথের সৈনিক হিসাবে এমন ব্যক্তিকেই গ্রহণ করা হবে যে এ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করে যেন মহান আল্লাহর কালিমা তথা সত্য ও ন্যায়ের কথা সমুন্নত থাকে। (হুজ্জাতুলাহিল বালিগা, খ.২ পৃৎ ১৫৭)।

২৪. মূলগ্রন্থের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

نفت هذه الداعية فى القلب لا يكون الا بالتشبه بالملئلة الخ

হুজ্জাতুলাহিল বালিগা, খঃ ২ পৃঃ ১৫৭)।

২৫. মূল বক্তব্য والحاجة الثالثة ان اجتماع الناس لا يخلو عن التحا قد والتحاسد والشحناء الخ (আল বুদুরুল বাযিগা, পৃৎ ১১)।

২৬. মূল বক্তব্য فالمدن الفاسدة التى تغلب عليها نفوس سبعية ويكون بهم تمنع شديد انا هو بمنزلة الاكلة فى بدن الانسان لا يصلح الانسان الا بقطعه الخ (হুজ্জাতুল্লাহ, খ.২ পৃঃ ১৫৭)।

২৭. মূল বক্তব্য لا يقمد اليه المن اخلص دينه لله - وآثر الاخرة على الدنيا وصح اعتماده على الله (ঔ, খ.২ পৃঃ ১৫৭)।

২৮. যেমন মুসলমানদের মক্কী জীবনের কর্মসূচি ছিল ; كفوا ايديكم واقيموا الصلوة অর্থাৎ নিজেদের হাত সংযত করে রাখ আর নামায কায়েম কর। অর্থ হল তোমাদের শত্রু পক্ষের আরোপিত সকল দুঃখ যন্ত্রণার জবাবে ধৈর্যধারণ কর এবং মহান আল্লাহর সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক সুদৃঢ় ও নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে আরও মজবুত করে নাও।

২৯. কারণ গান্ধীজী তার সহিংসা আন্দোলন ১৯১৭ খৃঃ থেকে শুরু করেছিলেন।

আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিপ্লব, সর্বাত্মক বিপ্লব, সমাজ জীবনের সকল শাখায় বিপ্লব

ইতিপূর্বে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তাধারা বিশ্বাস ও আন্তরিক ইচ্ছা আকাঙ্খার কথা সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। এ আলোচনা সামনে রেখে হযরত শাহ্ সাহেব ও তার কর্মীদের ব্যাপারে এমনটা জ্ঞান করা যে, তারা ক্রম বর্ধমান ক্ষয়িষ্ণু মোঘল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে ছিলেন–তার ও তার কর্মীদের ওপর যুলুম ও অবিচার বৈ কিছুই নয়।

উল্লেখিত তার নীতিমালা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তিনি কিংবা তার কর্মীরা মোঘল সাম্রাজ্যের জরাজীর্ণ সিংহাসন মেরামত করা তো দূরে থাক বরং তারা মোঘলদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থাকেও ইসলামের ওপর এক দৃষ্টিকটু কালিমা বলে মনে করতেন। তাদের দৃষ্টিতে এ কালিমা তখন ধুয়ে পরিস্কার করা ছিল দেশ ও জাতির তৎকালীন সর্বোচ্চ সেবা ও কল্যাণ কামিতা।

বিগত আলোচনায় আপনি দেখে আসছেন যে, হযরত শাহ্ সাহেব প্রাচীন রোম ও পারস্যের স্বৈরাচারী সম্রাটবৃন্দের রাজত্ব এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার কারণে গণমানুষের জীবনে অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থা সূচিত হওয়ার নগদ উদাহরণ হিসাবে নিজ যুগের সম্রাটদের শাসন ব্যবস্থাকে তুলে ধরেছেন। তারপর তিনি এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা খতম করে দেওয়াকে সকল নবীদের বিশেষতঃ শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) প্রেরিত হওয়ার অন্যতম লক্ষ্য বলে প্রমাণ করেছেন। তাই এখানে হযরত শাহ্ সাহেবের রচিত গ্রন্থ থেকে ছোট আরেকটি উদ্বৃতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেনঃ

فالمدن الفاسدة التى يغلب عليها نفوس سبعية
ويكون لهم تمنع شديد انما هو بمنزلة الا كلة فى بدن
الانسان لا يصح الانسان الا بقطعه والذى يتوجه الى
اصلاح مزاجه واقامة طبيعته لا بدله من القطع - والشرّ

القليل اذا كان مفضيًا القليل اذا كان مفضيًا الى الخير الكثير واجب فعله

অর্থাৎ বিপন্ন নগরের যেখানে হিংস্র স্বভাব লোকদের অধিপত্য বিরাজিত, যেখানে তারা নিজেদের আত্মরক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করে রাখে–তারা বস্তুত মানবতার দেহের ওপর বিদ্যমান ক্যানসারের ন্যায়। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত এ ক্যানসার কেটে বিচ্ছিন্ন করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দেহ সুস্থ হতে পারে না। যে চিকিৎসকই এ ক্যানসার যুক্ত মানুষটির সুস্থতা কামনা করবে তার জন্য প্রথমতঃ ক্যানসারটির পূর্ণ অপারেশন করে নেওয়া আবশ্যক বিবেচিত হবে। কারণ কোন ক্ষুদ্র ক্ষতির দ্বারা যখন বৃহত্তর কোন কল্যাণ লাভ করা যায় তখন ঐ ক্ষুদ্র ক্ষতির কাজ কার্যকর করা আবশ্যক হয়ে যায়। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, জিহাদ অধ্যায়, খন্ড ২, পৃঃ ১৫৭)।

ওয়ালী উল্লাহী আন্দোলনের সুপ্রসিদ্ধ কর্ণধার হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) এ নীতিমালারই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পূর্ণ একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের 'ইমামত' (নেতৃত্ব) অধ্যায়ে তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং ইসলামের উসুল ও নীতিমালার আলোকে প্রত্যেকটির হুকুম ও বিধান বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া কোন ধরনের নেতৃত্বের সাথে মুসলিম সর্ব সাধারণের কি প্রকারের আচরণ[৩০] করা চাই তাও তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন।

তিনি নিকৃষ্টতম নেতৃত্বদানের দুটি লক্ষণ চিহ্নিত করেছেন। দুঃখের বিষয় যে, তার স্বযুগের মোঘল সাম্রাজ্যের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উভয় লক্ষণই বিদ্যমান ছিল। তাদের ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে বলেন ঃ

پس دریں صورت برا فراختن اعلام قتل وقتال وبرانداختن آن مبتدع ضال در حق ملّت واهل ملّت منفعتے خاهد بخشید والا بعوام وخاص بے شك مضرتے خهد رسید

অর্থাৎ কাজেই এহেন পরিস্থিতিতে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করা এবং এমন পথভ্রষ্ট যারা ধর্মের নামে যথেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে পদচ্যুত

ও বহিষ্কার করা ধর্মের জন্য যেমন কল্যাণকর তেমনি ধর্মের ধারকদের জন্যও উপকারী। অন্যথায় দেশের নেতৃবৃন্দ ও সর্বসাধারণের সকলকেই মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। (মনসবে ইমামত, পৃঃ ৯৬, মাতবায়ে ফারূকী দিল্লী থেকে মুদ্রিত)।

এক পৃষ্ঠা পর তিনি আরও লিখেছেন ঃ

جہاد بر ایشاں از ارکان اسلام است واہانت ایشاں اعانت سیّد الانام

তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ইসলামের অন্যতম রুকন ও ফরয বিধান। আর তাদেরকে অপমানিত ও দুর্বল করে দেওয়া প্রকারান্তরে মহানবী (সাঃ)-কে সাহায্য ও সহযোগিতা করারই নামান্তর। (প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৭)।

উক্ত গ্রন্থের ৯৮ নং পৃষ্ঠায় তিনি আরও কঠোর বাক্য ব্যবহার করেছেন। মোট কথা হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)-এর রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মোঘলদের ক্ষয়িষ্ণু সিংহাসনের মেরামত করা ছিল বলে ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। এ ধারণা কেবল শাহ সাহেবের ওপরই নয় বরং এ প্রিয় মাতৃভূমির গোটা গৌরবময় অতীতের ওপর জঘন্য যুলুম বটে। আসল ব্যাপার হল হযরত শাহ সাহেবের এই সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ঠিক সূচনালগ্নে তিনি যখন হিজায ভূমিতে অবস্থানরত ছিলেন তখন ২১শে যীকাদা হিঃ ১১৪৪ (মোতাবেক ১৭৩১ খৃঃ) রোজ শুক্রবার রাতে মক্কা শরীফে তার আত্মার ওপর এ মহাবাণী এলহাম হয়েছিল যে, বর্তমানের প্রেক্ষিতে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য কেবল একটিই বিকল্প আছে সেটি হল বর্তমানে জেকে বসা সকল ব্যবস্থাপনার জাল ছিন্ন করে দিয়ে সমাজের সর্বত্র একটি সর্বাত্মক বিপ্লবের সাধন করা।[৩১] সেমতে তিনি যখন পবিত্র ভূমি থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন থেকে তার গৃহীত উদ্দেশ্য চিহ্নিত হয়ে[৩২] গিয়েছিল ; فك كل نظام অর্থাৎ সমাজ ও রাজনীতির সকল বিভাগে অবস্থিত সকল অশুদ্ধ ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিপ্লব।

কর্মসূচি

তদানিন্তন যুদ্ধবাজ নেতৃবৃন্দের ন্যায় শাহওয়ালী উল্লাহর তরবারী হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং সৈন্য ভর্তি করে কোন নগর দখল করে কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত শক্তির আতাত করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ ছিল। কিন্তু

এমনটা করা হলে তিনি সর্বাত্মক বিপ্লব সাধনের যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তার কিছুই অর্জিত হত না। বরং তিনিও অপরাপর যুদ্ধবাজদের কোন একটির লেজুড়ে পরিণত হতেন। তার এ পরিকল্পনা তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে যখন দেশের সর্বসাধারণ তার এ সংস্কারমূলক চিন্তা-চেতনাকে নিজেদের রায় ও অভিমত হিসাবে বরণ করে নিবে। এ কারণেই যুদ্ধ কিংবা জিহাদ শুরু করার পূর্বে তাদেরকে শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণদান ছিল তাঁর দৃষ্টিতে আবশ্যক। অতএব তার দলের সর্ব প্রথম কর্মসূচি হিসাবে এ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজকেই সর্বাগ্রে গ্রহণ করা হল এবং এ ব্যাপারে দেশের কয়েকটি স্থানে মারকায বা কেন্দ্র স্থাপন করা হল।

ওয়ালী উল্লাহী দলের নেতৃবৃন্দ

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি বড় ধরনের ত্রুটি যে, ইতিহাস এ দলের সদস্যদের বিশ্বস্ত তালিকা সংরক্ষিত রাখতে পারেনি। তবে শাহ্ সাহেবের রচনাবলির অবলম্বনে তার কতিপয় সঙ্গীর নাম পাওয়া গিয়েছে যাদের অনুপ্রেরণা তাগিদ ও পরামর্শক্রমে তিনি ঐ গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন। সেসব সঙ্গীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

এক. মাওলানা মুহাম্মদ আশিক সাহেব

তিনি মুযাফফর নগর জেলার অন্তর্গত ফুলত নামক স্থানের অধিবাসী। সম্পর্কে তিনি ছিলেন শাহ্ সাহেবের মামাত ভাই। গোড়া থেকেই তিনি শাহ্ সাহেবের সঙ্গী হিসাবে থাকেন। হিজায অবস্থানকালে যখন 'পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মক বিপ্লব' সাধনের এ সিদ্ধান্ত স্থির করা হয় তখনও তিনি শাহ্ সাহেবের সাথে ছিলেন। স্বয়ং শাহ সাহেব বলেন ঃ

> 'ইনি আমার মনোভাবনা সম্পর্কে অবগত ও আমার রচিত গ্রন্থাবলির গ্রন্থাগার বলা চলে। তাঁরই পীড়াপীড়ির ফলে বেশকিছু গ্রন্থাবলি রচিত হয়েছে। আর তারই মাধ্যমে আমার পর আমার চিন্তাধারার প্রচার প্রসার ঘটবে।[৩৩]

সেমতে দেখা যায় যে, হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর ইন্তেকালের পর তার অনুসারীদের বিশেষতঃ শাহ্ সাহেবের সন্তান ও স্থলাভিষিক্ত (হযরত শাহ্ আবদুল আযীয় রহঃ)-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের কাজ তারই হাতে সম্পন্ন হয়েছিল।

দুই. মাওলানা নুরুল্লাহ্ সাহেব

মীরাট জেলার অন্তর্গত বড্ডানার বাসিন্দা এবং হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর একান্ত শাগরিদ। তারই অনুরোধে শাহ সাহেব তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তাফহীমাতে এলাহিয়্যা' রচনা করেন।

মাওলানা নুরুল্লাহ্ সাহেব হযরত শাহ্ আবদুল আযীযের উস্তাদ ও শ্বশুর ছিলেন। নুরুল্লাহ সাহেবেরই পুত্র ছিলেন মাওলানা হিবাতুল্লাহ ও পৌত্র ছিলেন মাওলানা আবদুল হাই সাহেব।

ওয়ালী উল্লাহী আন্দোলনে মাওলানা আবদুল হাই এর ভূমিক অনন্য ও অসাধারণ। তিনি হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ *রহঃ)-এর সঙ্গে জিহাদে অবস্থান কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ইন্তেকাল করেন। (বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী অধ্যয়ের দ্রষ্টব্য)।

তিন. মাওলানা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী

তিনি হযরত শাহ সাহেবের প্রকান্ত ঘনিষ্ট ব্যক্তি। শাহ সাহেবের মৃত্যুর পর তার দলীয় লোকদের প্রশিক্ষণ দানের কাজ করে যান।

চার. হযরত শাহ আবূ সাঈদ সাহেব

রায় বেরেলীর অধিবাসী। তিনি রায় বেরেলীর সুপ্রসিদ্ধ বুযর্গ শাহ ইলমুল্লাহ সাহেবের পৌত্র। তারই দৌহিত্র হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ) যিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণবিপ্লব সংঘটন করেছিলেন। তার পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছে জিহাদের পতাকা উড্ডীন করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। মহীসুরের সুলতান টিপুর বংশধর তার ও তাঁর উত্তরপুরুষ হযরত শাহ আবুল লাইস (রহৎ)-এর মুরীদ ছিলেন।

পাঁচ. হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহঃ)

তিনি হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)-এর সন্তান ও তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি। বিস্তারিত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

ছয়. মাওলানা মখদুম সাহেব লৌখনবী

তিনি হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন।

ওয়ালী উল্লাহী দলের মারকায ও কার্যালয়

এক. এ দলের তত্ত্বাবধানে ইলমী ও আমলীভাবে প্রশিক্ষণ দানের বৃহত্তর কেন্দ্র ছিল দিল্লী।[৩৪] শাহ ওয়ালী উল্লাহর ওফাতের পর তারই স্থলাভিষিক্ত ও সন্তান হযরত শাহ আবদুল আযীয সে কেন্দ্রকে সজীব ও সক্রিয় রাখেন বরং বলা চলে তিনি এ প্রতিষ্ঠানকে পূর্বের তুলনায় বহুগুণে সফল ও সার্থক করে গড়ে তোলেন। বিস্তারিত বিরবণ পরবর্তীতে পেশ করা হবে।

দুই. দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল রায় বেরেলীর প্রসিদ্ধ খানকা যা 'তাকিয়ায়ে শাহ ইলমুল্লাহ'[৩৫] নামে পরিচিত। এটি অযোধ্যা এলাকায় অবস্থিত। প্রায় অর্ধ শতক কাল পূর্ব থেকেই এ খানকা ইসলামী জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দানের অন্যতম কেন্দ্রস্থলের ভূমিকা পালন করে আসছিল। এ মারকাযের সঙ্গেই সুলতান টিপু ও তার পরিবারের লোকজন আধ্যাত্মিক বিষয়ে সমন্বিত ছিলেন।

ইংরেজ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যে কালে দিল্লী মারকায থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ফতওয়া প্রকাশিত হয় সে সূত্রে তখন রায় বেরেলীর মারকায থেকেও বিপ্লবী আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়। রায় বেরেলীর এ আন্দোলনকেই ওহাবী আন্দোলনের[৩৬] নামে দুর্নাম করা হয়েছিল।

উল্লেখিত রায় বেরেলীর মারকাযে যারা কাজ করতেন তারা বংশগতভাবে হযরত শাহ ইলমুল্লাহ-এর সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। কিন্তু ইলম ও আমলের দিক থেকে তারা ছিলেন হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর প্রশিক্ষণাগারের ফসল ও তার চিন্তা-চেতনার দ্বারা সুগঠিত।

তন্মধ্যে হযরত শাহ মুহাম্মদ ওয়াযিহ, হযরত শাহ আবু সাঈদ, হযরত সায়্যিদ, মুহাম্মদ মূঈন ও হযরত সায়্যিদ মুহাম্মদ লুকমান প্রমুখ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর হাতে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। মাওলানা ইসহাক ও হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহঃ)-এর কাছ থেকে।[৩৭]

উপরোক্ত দু'টি মারকায ছাড়া অতিরিক্ত আরও দু'টি কারকাযের সন্ধান দিয়েছেন মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী। সে দু'টি হল নজীবাবাদের মাদ্রাসা[৩৮] ও ঠাঠ সিন্দুতে অবস্থিত মোল্লা মুহাম্মদ মুঈনের মাদ্রাসা। এখানে আমরা আরও একটি মারকাযের কথাও সংযুক্ত করা আবশ্যক মনে করি, সেটি হল অযোধ্যার রাজধানী লাখনোর মাদরাসা। এখানে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিশিষ্ট শাগরিদ মাওলানা মাখদুম লখনৌবী[৩৯] প্রায় অর্ধ শতক কাল ইলমে দীনের তালীম ও প্রশিক্ষণ দানের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন।

তাছাড়া লাখনৌর ছোট মুহাদ্দিস মির্জা হাসান আলী ও মাওলানা হুসাইন আহমদ মালীহাবাদীর ন্যায় যুবক আলিমগণ হযরত শাহ্ আবদুল আযীযের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তারপর এক দীর্ঘকাল যাবৎ লখনৌতে শিক্ষাদানের চর্চা অব্যাহত রাখেন।[৪০]

কর্মসূচির বিপক্ষে নানাবিধ জটিলতা

খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষে فك كل نظام তথা 'পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক বিপ্লব' সাধনের কর্মসূচি ক্ষুদ্র একটি আলোক বর্তিকার ন্যায় এমন মূহূর্তে প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছিল যখন সম্রাটতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদিতা ও রাজনৈতিক ঠিকাদারীর ঝড়ো হাওয়া তীব্র গতিতে প্রবাহিত হচ্ছিল। মোঘল সম্রাটদের সামরিক শক্তি তৎকালে যদিও ছিল অতি দূর্বল তবুও গণমানুষের মনে তাদের প্রতি গভীর সমর্থন বিদ্যমান ছিল। কারণ দুইশত বছর রাজত্বের সুদীর্ঘ ইতিহাস মোঘল সম্রাটের প্রতি সন্মান ও শ্রদ্ধা পোষণের মনোভাবকে এক ধরনের ধর্মীয় আকীদার স্থান করে দিয়েছিল। আর এ কারণেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আশেপাশের দুষ্ট শক্তিগুলো যদিও মোঘল নেতৃত্বকে নানাভাবে খর্ব ও আহত করে চলে তবুও তারা আকবর ও আলমগীরের বংশধরকে উপেক্ষা করার সাহস করে নি। নিজেদের কর্তৃত্ব চালিয়ে গিয়েছে বটে কিন্তু সিংহাসনের ওপর মোঘল বংশের কোন না কোন সদস্যকে আবশ্যিকভাবে অধিষ্ঠিত রেখে আসছে।

সকলে মোঘল সম্রাটকেই দেশের প্রকৃত মালিক বলে জ্ঞাত করত। তাই সবগুলির অনেক গভর্ণর যদিও নিজেকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বাধীন ঘোষণা করছে এতদসত্ত্বেও তার এই রাজত্বে বৈধতা প্রমাণের জন্য সম্রাট থেকে অনুমতিপত্র লাভ করাকে আবশ্যক মনে করে আসছে। বুরহানুল মূলক নওয়াব সাদাত আলী খান মোঘল দরবারের একজন মন্ত্রীর প্রতীক লাগিয়ে অযোধ্যায় নিজের স্বাধীন সরকার গঠন করে নেয়। নেয়ামুল মূলক আসিফ জাহ সেই দরবারের 'আমীরুল উমারা'-র পরিচয় দিয়ে দক্ষিণ ভারতে স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করে। মারাঠারা যে বিদ্রোহ চালিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যেও বস্তুত এমন কোন সূত্র হস্তগত করে নেওয়ার মানসিকতাই কার্যকর ছিল। তাই দেখা যায় যে, তাদের নেতা বাজী রাও পেশোয়া ও মধুজী সিন্ধিয়াকে আমীরুল উমারা পদে নিয়োগ করা হলে মোঘল সম্রাটের স্বার্থ রক্ষা তাদের কাছেও পবিত্র ও নৈতিক দায়িত্ব বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য বৈধ করে নেওয়ার স্বার্থে সম্রাট থেকে দেওয়ানীর সনদ লাভ করা আবশ্যক জ্ঞান করে। তারপর দিল্লী

হস্তগত করার পরও অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল দিল্লীর সিংহাসনে মোঘলদের কোন সদস্যকে পুতুল হিসাবে হলেও বসিয়ে রাখে।

তাছাড়া পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মক বিপ্লব সাধনের এই শ্লোগান কেবল সম্রাট কিংবা সম্রাটতন্ত্রীদের জন্যই বিপদ সংকেত ছিল তাই নয় বরং বিদ্যমান ঐ সকল উদীয়মান শক্তিগুলোর জন্যও অশনি সংকেত বহন করেছিল যারা মনে মনে মোঘলদের পৃষ্ঠপোষক কিংবা স্থলাভিষিক্ত হওয়ার আশা পোষণ করছিল। এভাবে সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা এক শ্রেণীর লোক যারা পেশাজীবী সিপাহীর সাহায্যে জায়গীরদারী ব্যবস্থার পতাকা উড্ডীন করে রেখেছিল তারাও সর্বাত্মক বিপ্লবের এ শ্লোগান পছন্দ করতে পারে নি।

অনুরূপে কেবল সম্রাট নওয়াব ও আমীরদের ব্যাপারই নয় ; হযরত শাহ সাহেব তদানিন্তন দুনিয়াদার উলামা, পীর, ফকীর ও কবি-সাহিত্যিকদেরও কঠোর সমালোচনা করেন। তার তাফহীমাতে ইলাহিয়্যা গ্রন্থে অদ্যাবধি সে সকল সমালোচনামূলক বক্তব্য বিদ্যমান। দেশের সাধারণ মানুষ ঐ সকল উলামা, পীর. ফকীর ও কবি-সাহিত্যিকদের অনুগত ছিল বিধায় এ শ্লোগান সর্ব সাধারণের কাছেও উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারে নি। কাজেই এক দিকে যেমন সাধারণ মানুষ অন্যদিকে তেমন ক্ষমতাসীন শ্রেণীর সকলেই এ কর্মসূচির বিরুদ্ধাচরণ করে। উল্লেখিত কঠিন বাধা-বিপত্তির ঝড়ো হাওয়া চলার মধ্যেই শাহ ওয়ালী উল্লাহ তার সর্বাত্মক সংস্কার আন্দোলনের ক্ষুদ্র আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বোলিত করেন।

প্রকাশনা ও প্রচারের ক্ষেত্রে জটিলতা

মার্কস এঞ্জেলস ও লেনিনের জন্য সৌভাগ্য ছিল যে, তাদের আন্দোলনের সমর্থনে তারা মুদ্রণ ও প্রকাশনা শক্তির সুবিধা পেয়েছিলেন। তাই অতি সামান্য সময়ের মধ্যেই তারা নিজেদের চিন্তাধারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হন। কিন্তু শাহ সাহেবের জন্য এ ভাগ্য প্রসন্নতা ছিল না তার কাছে বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনা, উন্নত উপস্থাপন পদ্ধতি ও যাদু বক্তব্যের সবই ছিল কিন্তু মুদ্রণ বিষয়ক সহযোগিতা লাভ থেকে তিনি বঞ্চিত থাকেন। রচনা ও সাংবাদিকতার সুবিধা থাকলে তার পক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষ প্রভাবিত করা সহজ ছিল। অথচ তাকে নিজের হস্ত লিখিত পান্ডুলিপির ওপরই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। সে আমলে ভারতবর্ষে প্রচার প্রসারের মাধ্যম হিসাবে স্থানে স্থানে

বক্তব্য দান কিংবা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আসর কায়েম ব্যতীত অন্য কোন উপকরণ চালু ছিল না। তার মূল্যবান গ্রন্থগুলো রচনার প্রায় দেড় শতক কাল পরে গিয়ে মুদ্রিত হতে শুরু করে।

বৈপ্লবিক ইশতিহার

তৎকালীন ভারতের রাজনীতির অঙ্গনে নেতৃত্বের অস্থিরতা, দিনের রাতের যে কোন মূহুর্তে প্রলয় কাণ্ডের উপস্থিতি তথা দিল্লীর ওপর মারাঠাদের আক্রমণ, অভিযান,[৪১] নাদির শাহের গণহত্যা,[৪২] দিল্লী নগরের ওপর ব্যাপক লুণ্ঠন তৎপরতা,[৪৩] আহমদ শাহ আবদালী কর্তৃক পানিপথ যুদ্ধ[৪৪] ইত্যাদি নিরবিচ্ছিন্নভাবে আপতিত হওয়ার দরুণ শাহ সাহেবের পক্ষে তার বৈপ্লবিক কর্মসূচি শৃঙ্খলাবদ্ধ করে সাজিয়ে পেশ করার মত কোন অবকাশ তার কাছে হয়ে উঠে নি।

তিনি তার বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তগুলো কোথাও কুরআন মাজীদ অনুবাদের সঙ্গে পেশ করেছেন। কখনও তাসাউফ ও ইসলামী দর্শনের[৪৫] আঁচলের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। আবার কোথাও ওয়ায নসীহতের[৪৬] আঙ্গীকে কিংবা ইসলামের ইতিহাস[৪৭] ও সাহাবী জীবনের আদর্শ ব্যাখ্যার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

সম্রাট পুজারীদের বিরুদ্ধাচরণ

শাহ সাহেব তার বক্তব্য প্রকাশে এতখানি সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও নিরাপদ থাকতে পারেন নি। শত্রুদের হাতে তাকে ও তার দলের লোকদেরকে নাশকতামূলক আক্রমণ ও বর্বরচিত শাস্তিভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের তিনি যখন ফার্সি অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেন এটি ছিল তার সংস্কারমূলক বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ তখনই তার ওপর জঘন্য আক্রমণ চালানো হল। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ বলে অদ্ভূত উপায়ে তিনি প্রাণে বেঁচে যান।[৪৮]

অমুসলিমদেরকেও বিপ্লবে সংযুক্তকরণ

উপরোক্ত নীতিমালার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিমের কোন পার্থক্য ছিল না। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্দীর মতানুসারে হিন্দু যুবক শ্রেণীকে গীতার শিক্ষাদানের মাধ্যমে সেই বৈপ্লবিক চেতনায় উজ্জীবিত করাও সম্ভব ছিল। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রেক্ষাপটে বিপ্লবকে সফল করার সংক্ষিপ্ত পথ একটিই ছিল যে, শাহ সাহেবের আশেপাশে অবস্থিত মুসলিম তরুণ শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবের অনুভূতি ও চেতনার সঞ্চার করে তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে দাঁড় করানো।

কেননা সমগ্র উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ স্থানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মুসলমানদেরই করায়ত্বে ছিল। আর তৎকালে তারাই যুদ্ধ ও সমর কৌশলে অধিকতর দক্ষতার অধিকারী ছিল।

তা ছাড়া উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের রাজপুত শাসিত রাজ্যগুলো মুসলমানদের শীর্ষ শক্তিকে সমর্থন করে আসছিল। তাদের রাজা মোঘল দরবারের অন্যতম মনসবদার এবং দরবারী ইরানী কিংবা তুরানীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাই দেখা যায় যে, বিশৃঙ্খলা চলাকালের দীর্ঘ সময়ে এ সকল অঞ্চলের কোন হিন্দু রাজা মোঘল সাম্রাজ্যের মিটমিটভাবে প্রজ্জ্বলিত আলো কখনও নির্বাপিত করার চেষ্টা করে নি। তৎকালের মারাঠাদের ব্যাপারেও তারা মোঘলদের উৎখাত চেয়েছিল বলে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত বলা দূরূহ। তাদের উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু ছিল যে, মোঘল দরবারের পক্ষ থেকে তাদের কর্তৃত্ব যেন স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। তারপর ১৮৫৭ সাল থেকে মারাঠাদের অবশিষ্ট শক্তি তো একথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে দেয় যে, এখনকার প্রেক্ষিত অনুসারে বিপ্লবকে সফল করার একমাত্র রাস্তা হল সিংহাসনে মোঘলদের কাউকে অধিষ্ঠিত রাখা হোক। তারপর এর অবলম্বনে সিংহাসনকে পুনর্বার আবাদ করা হোক। কাজেই এ সকল পরিস্থিতির বিচারে ধর্ম ও নৈতিকতা উভয়েরই দাবী ছিল বিপ্লব সফল করার লক্ষ্যে সর্ব প্রথম ঐ সম্প্রদায়কেই প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা চাই যাদের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের ওপর গোটা দেশের সকলেই আস্থাশীল।

এশিয়া মহাদেশে আন্তর্জাতিক শক্তি ছিল মুসলমানদের হাতে। কাজেই এই[৪৯] মুসলিম তরুণদের সংশোধন ও সুগঠিত করে তোলার দ্বারা সমগ্র এশিয়ার সংশোধন এবং তাদের মাধ্যমে ইউরোপের উদীয়মান সয়লাব প্রতিরোধ করা সহজ ছিল। মোট কথা এ সকল কারণেই তৎকালে ওয়ালী উল্লাহী চিন্তাধারার ওপর যারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে কেবল মুসলমানদের নামই পাওয়া যায়।

দেশীয় রাজশক্তির পতন গ্রস্থতা

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ যখন জন্ম লাভ করেন তখন ভারতবর্ষের রাজশক্তি উত্থানের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল। কান্দাহার থেকে আসাম ও মাদ্রাজ পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষের সুবিশাল ভূখন্ড তখন একই কেন্দ্রের নির্দেশে পরিচালিত হত।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ সম্পর্কীয় আলোচনার এটি শেষ অধ্যায়। কাজেই এ অধ্যয়ে তার ওফাতকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১১৭৬ হিজরীতে দেশীয় রাজশক্তি পতন গ্রস্থতায় কতটুকু নীচে নেমে গিয়েছিল তাও বর্ণনা করে দেওয়া ভাল হবে।

সেমতে দেখা যায় যে, ১৭৩৭/১১৫১ সালে নাদির শাহের বিখ্যাত আক্রমণ সংঘটিত হয়। এ আক্রমণে নাদির শাহ ৬ই যিলহজ্জ ১১৫১[৫০] হিজরী তারিখে দিল্লী নগরের ওপর গণহত্যা চালিয়ে হিন্দুস্তানের কোমর ভেঙ্গে দেয়।

এ গণহত্যায় মৃত্যুবরণকারীদের সংখ্যা ৮ সহস্র থেকে দেড় লক্ষ[৫১] পর্যন্ত অনুমান করা হয়েছে। রাজকীয় কোষাগার থেকে নগদ্ ২২ কোটি টাকা, প্রায় ৯০ কোটি টাকার সোনাদানা ও ময়ুর সিংহাসন প্রভৃতি লাল কেল্লা থেকে লুণ্ঠন[৫২] করে নিয়ে যায়। নগরের সাধারণ বাসিন্দাদের ঘর থেকে যে সম্পদ লুটে নিয়ে ছিল তারও পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০ কোটি টাকা। আর্থিকভাবে এহেন পর্যুদস্ত হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি তখন যা সাধিত হয় সেটি হল দেশীয় ঐক্যের শতধা বিচ্ছিন্নতা। পশ্চিম-উত্তর সীমান্ত থেকে সিন্ধু পর্যন্ত এবং পাঞ্জাবের কতিপয় এলাকা দিল্লীর হাত থেকে ছিনিয়ে ইরানের অন্তর্ভূক্ত করা হল।[৫৩] সিন্ধু নদ থেকে দিল্লী পর্যন্ত যদিও মুহাম্মদ শাহের কর্তৃত্ব ছিল কিন্তু এই টানাপোড়নের কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের মর্যাদা অন্তত এতদাঞ্চলে দারুণভাবে ক্ষুন্ন হল। পূর্বাঞ্চলে নবাব আলীবর্দী খান, মহব্বত খান প্রমুখ সুযোগ পেয়ে নিজেদেরকে স্বাধীন ঘোষণা করে। এভাবে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[৫৪]

নাদির শাহের আক্রমণের ১০ বছর পর ১৭৪৭/১১৬১ সাল থেকে শুরু হল আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণ। তার প্রথমবারের আক্রমণকালে দিল্লী সম্রাট তাকে পাঞ্জাব ও মুলতান সূবা ছেড়ে দিয়ে কোনমতে নিজের প্রাণ রক্ষা করেন।[৫৫] দ্বিতীয়বারে আবদালী ইরানী সমর শক্তিসহ দিল্লী এসে পৌঁছলে একটানা দু'মাস পর্যন্ত দিল্লী নগরী এভাবে লুণ্ঠিত হতে থাকে যে, জগতের ইতিহাসকে লজ্জিত করে দেয়।[৫৬] এ আক্রমণের ২০ বছর পর ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে আলীবর্দী খানের দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলার পতন ঘটে। সাথে সাথে আলীবর্দী খানের দখলকৃত অঞ্চলে পতাকা উড্ডীন হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর। এভাবে অপর এক প্রতিপক্ষ শক্তি ক্রমে ভারতবর্ষের মাটিতে নিজের আসন করে নেয়।

পলাশী যুদ্ধের সাড়ে চার বছর পর ১৭৬১ সালে আহমদ শাহ আবদালী পুনরায় আক্রমণ চালায়। ১৪ই জানুয়ারি ১৭৬১ খ্রিঃ মোতাবেক ৬ই জুমাদাল উলা ১১৭৪ হিঃ তারিখে পানিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মারাঠা শক্তি শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। তবে রোহিলা খন্ডে হাফিয রহমত খান ও দক্ষিণ ভারতে আসিফ জাহের রাজত্ব এ যুদ্ধের ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে নেয়।

মোদ্দা কথা হল শাহ সাহেবের ওফাতকাল পর্যন্ত আন্তদেশীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়ে বিচ্ছিন্নতার শিকারে পরিণত হয় এবং দেশীয় শক্তি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু গণমানুষের মনে একটি বিশ্বাস ও একটি ঐক্যের চিন্তাধারা তখনও অবশিষ্ট ছিল। তারা মনে করত সাম্রাজ্যের বৈধ ও প্রকৃত মালিক হলেন সম্রাট। গণমানুষের এ ধারণার ফল এ দাঁড়িয়েছিল যে, স্বয়ংসম্পূর্ণ সরকারগুলোও মোঘল সম্রাটকে অন্তত নিজেদের মুরুব্বী ও পৃষ্ঠপোষকরূপে মেনে নিতে বাধ্য ছিল। এমনকি কোথাও বিদ্রোহ ঘোষণাকারীরাও শেষ পর্যন্ত নিজেদের অধিকৃত অঞ্চলে আধিপত্যের বৈধতা দেখানোর জন্য সম্রাটের অনুমতি জোগাড় করে নেওয়ার চেষ্টা করে যেত।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)

সায়্যেদুনা হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ)-এর ইন্তেকালের[৫৭] পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত শাহ আবদুল আযীয় (রহ)[৫৮] তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত হন। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক স্থলাভিষিক্ত আমাদের এখানে অবশ্যই মৌলিক কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু এই উত্তরাধিকারী হযরত শাহ আবদুল আযীয দেশ ও জাতির জন্য যে কল্যাণ বয়ে এনেছিলেন নিঃসন্দেহে সেটি ইতিহাসের অবিস্মরণীয় একটি অধ্যায়।[৫৯] তাঁর যুগে শিক্ষাদীক্ষা ও প্রচার প্রসার তৎপরতা এতখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, গোটা ভারতবর্ষের কোন একটি শিক্ষা কেন্দ্র এমন খুঁজে পাওয়া যায়নি যেটি হযরত শাহ আবদুল আযীযের কেন্দ্রীয় শিক্ষাগার থেকে উপকৃত হয় নি।

ওয়ালী উল্লাহী দর্শনের মূলমন্ত্র فك كل نظام অর্থাৎ সর্বাত্মক একটি বিপ্লব সাধনের চিন্তা-চেতনা হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর ওফাতকাল পর্যন্ত মাত্র গুটি কতেক মনীষীর মস্তিষ্ক পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। কিন্তু শাহ আবদুল আযীযের যুগে এ চেতনার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। তাঁর ওফাতকালে পৌঁছে এটি দেশের আপামর গণমানুষের চেতনায় উন্নতি লাভ করে। তখন হাজার হাজার যুবকও এ চেতনার বাস্তবায়ন করার স্বার্থে নিজেদের জীবন সমর্পিত করে দেয়। আন্দোলনের সরব ও সোচ্চার ধ্বনি তখন ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে গিয়ে এশিয়ার দূর-দূরান্ত দেশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল।

প্রশিক্ষণদানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর এই প্রশিক্ষণাগার থেকে বহু মনীষী শিক্ষা লাভ করেন। তাদের অনেকেরই বিস্তারিত জীবন চরিত ফার্সি ও উর্দূতে রচিত বহু গ্রন্থে বিদ্যমান।[৬০] আলোচ্য গ্রন্থের শেষ দিকে আমরাও তাদের কতিপয়ের বিস্তারিত জীবনী তুলে ধরব। এ সকল জীবন চরিত থেকে বুঝা যায় যে, হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর সেই প্রশিক্ষণ দানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ, যথা ঃ

১. শিক্ষার্থীদের মন মস্তিষ্কে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ)-এর চিন্তাধারা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া।

২. তাদের মনে মহান আল্লাহ পাকের নির্ভেজাল ইবাদত ও তাঁর্ই প্রতি ভয় এবং যাবতীয় কলুষতা থেকে মুক্ত চরিত্র গঠনের প্রেরণা সঞ্চার করা।

৩. শিক্ষার্থীদের মন মস্কিষ্ক থেকে রাজতন্ত্র ও রাজতান্ত্রিকতার যাবতীয় দুষ্ট জীবাণু বিদূরিত করা।

৪. আত্মোৎসর্গী প্রেরণার উদ্রেক করা অর্থাৎ এমনভাবে গড়ে তোলা যেন সকলে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে প্রবল আগ্রহসহ সর্ব প্রকারের ত্যাগ-তিতিক্ষা বরণ করে নেয়।

৫. জনসেবার অভ্যাস গড়ে তোলা। বিশেষতঃ গণমানুষের প্রতি দরদ ও কল্যাণকামিতা পোষণ এবং নিজেরা সকল কষ্ট বরণ করে নিয়ে অন্যদের শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করার অভ্যস্ত বানানো।

৬. রাজকীয় জাঁকজমক ও আড়ম্বরতা পরিত্যাগ করে একান্ত সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার অভ্যস্থ বানানো।

৭. গণমানুষের মনে জিহাদী প্রেরণার উদ্রেক করা এবং কষ্ট সহিষ্ণুতা ও শ্রম সাধনাসহ সকল বিরূপ পরিস্থিতি সহ্য করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

৮. যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলন সমাজকে ক্রমে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয় সেগুলোকে বন্ধ করে দেয়া।

৯. ভোগ-বিলাসের মূলোৎপাটন করা এবং যে সকল দুষ্ট জীবাণু সমাজকে বিলাসপ্রবণ, আরামপ্রিয় ও কাপুরুষত্বের দিকে ঠেলে দেয় সেগুলোর সংশোধন করা।

প্রশিক্ষণ দানের পদ্ধতি

এখানে তিনটি উপায়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হত। যথাঃ শ্রেণী কক্ষে পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষাদান, আধ্যাত্মিক দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদান। নিম্নের বিস্তারিত বিবরণ লক্ষণীয় ঃ

এক. শ্রেণী কক্ষের শিক্ষাদান[৬১]

শিক্ষাদানের এ কর্মসূচি হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর আমল থেকেই শুরু হয়। কিন্তু শাহ আবদুল আযীযের যুগে এ শিক্ষাগার এতটুকু ব্যাপকতা অর্জনে সক্ষম

হয়েছিল যে, তৎকালে গোটা ভারতবর্ষের এমন একজন আলিমও অবশিষ্ট ছিলেন না যিনি সরাসরি কিংবা কোন মাধ্যম হয়ে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত নন।[৬২]

দুই. আধ্যাত্মিক দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান

এ ব্যাপারে এখানে সুফীয়ায়ে কেরামের অনুসৃত বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হত। তবে শাহ আবদুল আযীযের শিক্ষাগারের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের দিকটি ছিল যে, এখানে আত্মশুদ্ধির যে সব উপদেশ শোনানো হত বাস্তবভাবেও সেগুলো কার্যকরী করে অভ্যাসে রূপান্তরিত করা হত। প্রশিক্ষণার্থীদের মন থেকে স্বার্থপরতা, প্রবৃত্তির দাসত্ব ও ক্ষমতার লোভ ইত্যাদি বিদূরিত করা হত। পক্ষান্তরে তাদের অন্তরে ধৈর্য ও সহনশীলতা, শ্রম ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা, মায়া-মমতা ভালবাসা এবং সর্ব প্রকার জৈবিক স্বার্থের উর্ধ্বে আরোহণ করে গণমানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজনে এ ব্যাপারে সকল ত্যাগ-তিতিক্ষা বরণ করে নেয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করা হত।[৬৩]

তিন. বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সম্মেলনে বক্তৃতা দান

এ ব্যাপারে হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর সাপ্তাহিক কর্মসূচি সুনির্ধারিত ছিল। সপ্তাহের দু'দিন তিনি পাবলিক জলসায় ওয়ায় করতেন। দিল্লী শহর ও শহর থেকে দূর দূর এলাকার লোকজনও তাঁর এ সকল জলসায় এসে সমবেত হত। এ প্রোগ্রামের ওপর শাহ সাহেবের এতখানি নিরবচ্ছিন্নতা ছিল যে, মৃত্যু শয্যার শেষ দিনগুলোতে যতক্ষণ পর্যন্ত তার কথাবার্তা বলার শক্তি অবশিষ্ট ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সর্বসাধারণের প্রতি ওয়ায নসীহতের এই কর্মসূচি স্থগিত করেন নি।[৬৪]

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উলামায়ে কেরাম

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর এই প্রশিক্ষণাগার থেকে তৎকালে যে সকল আলিম প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তাদের বিস্তারিত তালিকা সুদীর্ঘ উদাহরণস্বরূপ এখানে মাত্র কতিপয়ের নাম উল্লেখ করা হল।[৬৫] (ইনশাআল্লাহ এ বুযর্গগণের বিস্তারিত জীবন চরিত স্বতন্ত্র একটি ভ্যলিয়ূমে পেশ করার চেষ্টা করব) ঃ

১. মাওলানা শাহ রফীউদ্দীন

২. মাওলানা শাহ আবদুল কাদির

৩. মাওলানা শাহ আবদুল গণী–

(এ তিনজন ছিলেন হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর ছোট ভাই। শাহ আবদুল আযীয নিজেই তাদের তারবিয়্যাত ও প্রশিক্ষণ দেন। কিন্তু ভাইদের সকলেই তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন।)

৪. মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক

৫. মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব

(তাদের উভয়ে ছিলেন জনাব শায়খ মুহাম্মদ আফযল সাহেবের পুত্র ও হযরত শাহ আবদুল আযীযের দৌহিত্র।)

৬. মাওলানা আবদুল হাই

(তিনি হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর জামাতা ছিলেন)

৭. মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল

(তিনি ছিলেন হযরত শাহ সাহেবের ভাতৃষ্পুত্র ও শাহ আবদুল গণীর পুত্র)

৮.হযরত সায়্যেদ আহমদ শহীদ

(বিস্তারিত জীবনী একটু পরেই আলোচিত হচ্ছে)

৯. মাওলানা রশীদুদ্দীন দেহলভী

১০. মাওলানা মুফতী সদরুদ্দীন দেহলভী

১১. মাওলানা মুফতী এলাহী বখশ কান্ধলভী

১২. মাওলানা শাহ গোলাম আলী দেহলভী

১৩. মাওলানা মখসূসুল্লাহ সাহেব

(যিনি মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেবের পুত্র)

১৪. মাওলানা করীমুল্লাহ দেহলভী; পিতা মাওলানা লুৎফুল্লাহ ফারুকী

১৫. মাওলানা মীর মাহবুব আলী দেহলভী

১৬. মাওলানা আবদুল খালিক দেহলভী

১৭. মাওলানা হাসান আলী লক্ষ্ণৌভী ও

১৮. মাওলানা হুসাইন আহমদ মালীহাবাদী।

সরকারি আমলা ও কর্তাব্যক্তিদের আচরণ

মোঘল বাদশাদের প্রায় সকলে এ খান্দানকে সম্মানের চোখে দেখতেন। কিন্তু পরিতারেপর কথা হল তদানিন্তন সম্রাটগণ নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলেন না। আমলাদের হাতেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কুক্ষিগত ছিল। অথচ তাদের অনেকেই ছিলেন এমন যারা কোন সংস্কার ও ইসলাহকে পছন্দের দৃষ্টিতে দেখতেন না।[৬৬] উপরন্ত

এই আমলারা হযরত শাহ আবদুল আযীয ও তাঁর সঙ্গীদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিতে সচেষ্ট থাকেন। যেমন ঃ

গুন্ডাদের লেলিয়ে দেয়া

এ ব্যাপারে হযরত শাহ সাহেব নিজেই বলেন, 'আমি যে কালে পুরান দিল্লীতে ছিলাম তখন স্বজাতি লোকদের হাতে আমাকে বহু দুঃখ যাতনা সহ্য করতে হয়েছিল। নির্লজ্জ ও দুষ্ট চরিত্রের লোকদের আমার ওপর লেলিয়ে দেয়া হত। ওরা আমার বাড়ির সন্নিকটে কোন বাড়ির ছাদে তাজিয়া স্থাপন করে নানা রকম কটু কথা ও অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকত। রমযান মাসে তারাবীহের নামায চলছে অথচ তারা জনৈকা বেশ্যা মহিলাকে মদ খাইয়ে দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মহিলাটি হাফেয সীরাজীর একটি চরণ আবৃত্তি করছিল। আর গুন্ডাদের একদল তার সাথে ডোল বাজাচ্ছিল এবং নানা রকম আওয়াজ ও চিৎকার দিয়ে আমাদের ঝালাতন করছিল।[৬৭] এসব গুন্ডাদের যদি কোন উত্তর দেয়া হত তা হলে নিশ্চিত যে সংঘাতের সূচনা হয়ে যাবে—যা আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ছিল খুবই ক্ষতিকারক।

সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা

গুন্ডাদের লেলিয়ে দিয়েও সফল না হওয়ার পর দুষ্ট লোকেরা হযরত শাহ সাহেবের বাড়ি বাজেয়াপ্ত করে এবং তাকে দিল্লী থেকে বহিষ্কার করে দেয়। হযরত শাহ ফখরুদ্দীন (রহ) তখন বিশেষভাবে তাকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি প্রথমতঃ শাহ সাহেবের জন্য সাময়িকভাবে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং পরে বাদশার সঙ্গে তাঁর যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল সেটি কাজে লাগিয়ে বাদশার মাধ্যমে বাড়ির জায়গা ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

শহর থেকে নির্বাসন

বাজেয়াপ্তের মামলা শেষ হতে না হতেই তাঁর ওপর আরেকটি মামলা তুলে দেয়া হল। এবার তাঁকে পরিবার পরিজনসহ দিল্লী শহর থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হল। এ আদেশের সময় হযরত শাহ ফখরুদ্দীনের ব্যক্তিগত সম্পর্কও তা ঠেকাতে পারেনি। ফলে হযরত শাহ আবদুল আযীয ও তাঁর ভাইদেরকে নিজ নিজ পরিবার পরিজনসহ 'শাহদরাহ' পর্যন্ত পায়ে হেটে যেতে হয়েছিল। শাহদরাহ থেকে পরিবার পরিজনদের জন্য হযরত শাহ ফখরুদ্দীন সাওয়ারীর ব্যবস্থা করে দেন।[৬৮] সাধারণত কখনও কোন উযীর কিংবা আমীর কারুর ওপর

অবিচার করলে সেটির পুনর্বিচার করে দিতেন সম্রাটের স্থানীয় নিজস্ব প্রতিনিধি। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তখন স্থানীয় প্রতিনিধি যিনি ছিলেন তিনিও হযরত শাহ সাহেবের বিপক্ষে ছিলেন।[৬৯]

হত্যা করার ষড়যন্ত্র

তারপর এতটুকু নির্যাতনের ওপরই বিরুদ্ধবাদীরা সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা হযরত শাহ্ সাহেবকে হত্যার জন্য দু'বার তার আহারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহে তিনি উভয় দফা বেঁচে যান। এতদসত্ত্বেও শারীরিকভাবে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হন। বর্ণিত আছে যে, তারা শাহ্ সাহেবের শরীরে এক ধরনের মসলা জাতীয় জিনিস মেখে দিয়েছিল ফলে তার সারা দেহে শ্বেতরোগ ছড়িয়ে পড়েছিল।[৭০] মোদ্দাকথা এ সব নির্যাতনের ফলাফল যা ছিল তা হল ঃ তার দৃষ্টিশক্তি নিঃশেষ হয় যায়, তাকে শ্বেতরোগ আক্রমণ করে, রক্তের চাপবৃদ্ধি পায়, শরীরে নানা রোগব্যাধির সূচনা ঘটে।

টীকা ঃ

৩০. আরও আশ্চর্য্যের কথা যে, হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) মোঘল সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য সম্রাটদের পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিভ্রান্ত সরকার ও ভ্রষ্ট নেতৃত্ব' বলে আখ্যা দেন। তারপর তৎকালীন হক্কানী উলামা ও সচেতন মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

دور دور میگریزند وازیں قرب وجوارمی بر بزند واز مجالس سلاطین دست بر داری شوند واز مصاحبتي اشاں بیزار

অর্থাৎ তৎকালীন আকাবিরে মিল্লাত ও বুযর্গানে উম্মত তাদের (সম্রাটদের) সংস্পর্শ থেকে দূরে অবস্থান করতেন। তারা সম্রাটদের প্রতিবেশী কিংবা নিকটে থাকাকেও পছন্দ করেন নি। তারা সে সকল বাদশাদের সঙ্গে উঠাবসা কিংবা একত্রে অবস্থান করাকে খুবই অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে দেখতেন।'

তাই দেখা যায় হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্র পিতা হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল রহীম সাহেবকে সম্রাট আলমগীর আলিমদের সেই বোর্ডের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন যারা 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' সংকলন করেন কিন্তু সম্রাটের এহেন পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও মাওলানা আবদুর রহীম সেই সদস্য পদ গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান। আলিমগণ যে ফাতাওয়া গ্রন্থ সংকরন করেন তা অদ্যাবধি ফাতাওয়া আলমগীরী ও ফাতাওয়া হিন্দিয়া নামে বিদ্যমান, তারই অবলম্বনে আজও ফতওয়া প্রদান করা হয় অথচ মাওলানা আবদুর রহীম সেই বোর্ডে অংশগ্রহণ পছন্দ করেন নি। তবে ফতওয়া গ্রন্থের কাজ চলছে বলে সময়ে সময়ে তিনি বোর্ড সদস্যদেরকে পথ নির্দেশ দান অব্যাহত রাখেন। বলা বাহুল্য এ ধরনের সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার বৈধতা সম্পর্কে হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ বলেন যতদিন পর্যন্ত তারা প্রজাপালন ইনসাফ ভিত্তিক দেশ পরিচালনা করে যাবে ততদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়। (মনসবে ইমামত, পৃঃ ৯১-৯৪)।

৩১. হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ সাহেবের পত্রাবলির একটি সংকলন কিছুদিন পূর্বেই আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মাওলানা খালীক আহমদ নিযামী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ সংকলন থেকে বুঝা যায় যে, নাজীবুদ্দৌলা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিহাসে যদিও বলা হয়েছে যে, আহমদ শাহ্ আবদালীকে ভারত আক্রমেন জন্য যারা আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন তারা ছিলেন নিযামুল মূলক আসিফ জাহ, হাফিয রহমত খান, নাজীবুদ্দৌলা ও রোহিলা নেতৃবৃন্দ। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শীয়া নওয়াব শ্রেণী ও মারাঠাদের শক্তি খর্বের ব্যবস্থা করে দিল্লীর কেন্দ্রীয় দরবারের প্রধান মন্ত্রীত্ব অর্জন করা। কিন্তু অধুনা প্রকাশিত শাহ্ সাহেবের পত্রাবলির সংকলন থেকে বুঝা যায় যে, আবদালীকে একটি পত্র শাহ্ সাহেবের তরফ থেকেও দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখিত তথ্য যদি সঠিক হয় তাহলে এর ব্যাখ্যা হল এই যে, শাহ্ সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল আবদালীর মাধ্যমে তদানিন্তন বিশৃংখল পরিস্থিতির ওপর সাময়িকভাবে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। কারণ তখন মারাঠা, জাট, মেওয়াতী ও নানা দল উপদলের নেতৃত্বে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের পুনঃ পুনঃ রদবদল, দিনে রাতে নতুন নতুন বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট ও অস্থির করে রেখেছিল। ফলাফল ঘটেছেও তাই। আবদালীর আক্রমণের পর অস্থিরতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলো একের পর এক খতম হয়ে যায়

এবং শাহ সাহেবের বিপ্লবী কাফেলা ক্রমে অগ্রসর হতে শুরু করে। পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৩২. ফুয়ুযুল হারামাইন ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ কী সিয়াসী তাহরীক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩৩. তাফহীমাতে ইলাহিয়্যা, পৃঃ ১২৫ খ.১।

৩৪. মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী বলেন, শাহ ওয়ালী উল্লাহর আমলে দিল্লী এমন একটি কেন্দ্রীয় স্থান ছিল যেখানে বিশ্ব জাতিসমূহের সকলেরই নমুনা বিদ্যমান ছিল। দিল্লী নগরীতে এতটুকু যোগ্যতা অবশ্যই ছিল যে, এর মাধ্যমে শাহ সাহেবের শিক্ষাদান গোটা ভারতবর্ষে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশেও প্রসারতা লাভ করতে পারে। (শাহ ওয়ালী উল্লাহ কী নিয়াসী তাহরীক, পৃঃ ৪০, আছারুস সানাদীদ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

৩৫. শাহ ইলমুল্লাহ (মৃত. ১০৯৬, আনুমানিক ১৬৮৫ খৃঃ) এ খানকার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাই এটি তাকিয়ায়ে শাহ ইলমুল্লাহ নামে পরিচিত। কিন্তু দীনের প্রতি দরদের সাথে সাথে দেশের প্রতি তার মনে কতখানি মায়া ও ভালবাসা ছিল তার একটি নিদর্শন নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে অনুমেয়। তিনি মক্কা শরীফ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় নিজের সঙ্গে কাবা শরীফের একটি চিত্র ও একটি বিশুদ্ধ জরিপ নিয়ে আসেন। তারপর হিজরী ১০৮৪ মোতাবেক ১৬৮৫ খৃঃ সেই নকশা ও পরিমাপ অনুসারে নদীর তীরে নিজ দেশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। স্থাপনের সময় তাতে জমজমের পানি ঢালা হল। মহান আল্লাহর ঘর বানানোর ক্ষেত্রেও তিনি সুন্নাতে ইবরাহীমী নিজের আমলে আনেন। তার সন্তান ও আওলাদগণ হযরত ইসমাঈলের ন্যায় পিতার সঙ্গে এ কাজে সাহায্য করে যান। (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ)।

৩৬. ওহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত এ আন্দোলনের প্রথম পতাকাবাহী ছিলেন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ)। তার শাহাদত লাভের পর আন্দোলন সাদিকপুর কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হতে থাকে। সাদিকপুরকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া হলে অবশিষ্ট সৈনিকগণ 'আযাদ কাবায়েলে' পৌঁছে নিজেদের সংহতি কায়েম করে এবং তাদের অবশিষ্ট সৈনিকগণ ইংরেজদের শেষদিন তথা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তাদের শিরপীড়ার কারণ হিসাবে অব্যাহত থাকে।

৩৭. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, তৃতীয় মুদ্রণ।

৩৮. এখানে নওয়াব নাজীবুদ্দৌলার উদ্যোগে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের চিন্তাধারা শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। নওয়াব নাজীবুদ্দৌলা এমন এক সজাগ মস্তিষ্কের ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাদের অধঃপতিত সিংহাসনকে মেরামতের কাজে সচেষ্ট থাকেন এবং ১৭৬৯ সালে ইন্তেকালের পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত ইংরেজ আধিপত্যের বন্যা দিল্লীর সীমানায় পৌঁছতে প্রতিবন্ধকের কাজ করেন।

৩৯. তার নসব পরম্পরা হল মাওলানা মখদুম লৌখনবী ইবন হাফিয মুহাম্মদ নওয়ায ইবন মৌলভী আবদুস সমী ইবন সায়্যিদ মুহীউদ্দীন মাশহাদী। তার দাদা সায়্যিদ মুহীউদ্দীন মাশহাদী সর্বপ্রথম মাশহাদ থেকে দিল্লী আগমন করে বসবাস শুরু করেন। তারপর লৌখনো চলে যান। মাওলানা মখদুম সাহেব পাঠ্য গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করেন মাওলানা কতবুদ্দীন সাহালবীর পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহেবের নিকট। তিনি ছিলেন বাহরুল উলুম

মাওলানা আবদুল আলী সাহেবের সহপাঠি। দরসে নেযামীর শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি দিল্লী আগমন করেন এবং হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর নিকট অধ্যয়ন করেন। তারপর লাখনৌ ফিরে গিয়ে অবশিষ্ট জীবন শিক্ষা-দীক্ষা দানের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। শেষ জীবনে নানাতক ফালসাফা শাস্ত্রের শিক্ষাদান বন্ধ করে কেবল হাদীস তাফসীর ও দীনিয়্যাতের শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকেন। ১২২৯ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। (তাযাকিরায়ে উলামায়ে হিন্দ, পৃঃ ২২৩, নওল কিশোর প্রেস)।

৪০. তার জীবনী সংক্রান্ত আলোচনা পরে হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর আলোচনার সাথে পেশ করা হবে।

৪১. এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল হিজরী ১১৪৯ মোতাবেক ১৭৩৬ সালে।

৪২. হিজরী ১১৫১ মোতাবেক ১৭৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েক ঘণ্টার মাঝে অর্থাৎ সকাল ভোর বেলা থেকে দুপুর পর্যন্ত এ সামান্য সময়ের মধ্যে গোটা দিল্লী নগর শবদেহে ভরে গিয়েছিল। নিহতদের সংখ্যা আট হাজার থেকে দেড় লক্ষ বলে অনুমান করা হয়েছিল।

৪৩. আনুমানিক ৭০ কোটি মানুষ লুণ্ঠনের শিকার হয়েছিল। শাহী মহল থেকে সোনারূপা ও অলংকারাধিসহ ময়ুর সিংহাসনের মূল্য অনুমান করা তো আরও কঠিন।

৪৪. পানিপথের যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় ১৭৬১/১১৭৪ সালে।

৪৫. যেমন হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, আল বুদুরুল বাযিগা, ফুয়ুযুল হারামাইন প্রভৃতি গ্রন্থ।

৪৬. যেমন তাফহীমাতে ইলাহিয়্যা।

৪৭. যেমন ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা ইত্যাদি।

৪৮. হায়াতে ওলী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ কী সিয়াসী তাহরীক, উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী প্রভৃতি গ্রন্থ।

৪৯. তাই কিছুকাল পরেই দেখা যাচ্ছে যে, ওয়ালী উল্লাহী দলের তরুণ নেতা সায়্যিদ আহমদ শহীদ, নওয়াব আমীর আলী খান প্রমূখ মারাঠা রাজা জশোবন্ত সিংহের সাথে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিপরীতে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। আরও পরে ১৮৫৭ সালে এ দলের সদস্যগণই হিন্দুদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজ আধিপত্য নির্মূলের জন্য বিদ্রোহের সূচনা করেন। তারপর বিংশ শতকের শুরুর দিকে যখন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করে তখন এ দলের আলিমগণ যারা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিলেন-তারা কংগ্রেসের সঙ্গে একই প্লাট ফরমে দাঁড়িয়ে হিন্দুদেরসহ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েন।

৫০. খৃঃ ১৭৩৭ সালের মার্চ মাসে এ আক্রমণ সংঘটিত হয়। কিন্তু অংকের হিসাবমতে সালটি ১৭৩৮সাল বুঝায়।

৫১. তারীখে হিন্দুস্তান, শামসুল উলামা, খঃ ৯ পৃঃ ২৫৮।

৫২. ইমাদুস সাযাদাত, পৃঃ ৩১।

৫৩. তারীখে হিন্দুস্তান পৃঃ ২৫৯, ইমাদুস সায়াদাত, পৃঃ ৩১।

৫৪. ইমাদুস সায়াদাত, পৃঃ ৩২, সিয়ারুল মুতাসাখ খিরীন।

৫৫. তারীখে হিন্দুস্তান ও সিযারুল মুতাআখখিরীন।

৫৬. প্রাগুক্ত।

৫৭. হিজরী ১১৭৬ মোতাবেক ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

৫৮. এ সময় হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর।

৫৯. হযরত শাহ আবদুল আযীযের এ সকল কৃতিত্ব প্রমাণ করে যে, শাহ ওয়ালী (রহ)-এর এ পদে তার স্থলাভিষিক্ত বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের কারণে নয় ; বরং নিজস্ব যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণেই তাঁর ওপর এ মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।

৬০. যেমন আল ইয়ানিউল জানিয়্যি (আরবী), আবজাদুল উলূম (আরবী) কৃত নওয়াব সিদ্দীক হাসান ভূপাল, নুযহাতুল খাওয়াতির খ. ৬-৭ (আরবী), ওকায়িয়ে আহমাদী, মানযূরাতুস সুআদা ফী আহওয়ালিল গুযাতি ওয়াশ শুহাদা, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ রচিত 'আছারুছ ছানাদীদ', মৌলভী নূর আহমদ সাহেব নিগরামী রচিত 'নূরে আহমদী', সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী রচিত 'মাখযানে আহমদী', আদ দুরারুল মানসুর ফী আহওয়ালি সাদিকপুর, ইত্যাদি।

৬১. হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ) তার পিতার ইন্তেকালের পর মাদরাসায়ে রহীমিয়্যায় অধ্যাপনা শুরু করেন। এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁরই পিতা শাহ আবদুর রহীম (রহ)। বর্তমানে সেহেন্দীয়াঁ নামক যে স্থানটিতে শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর সন্তানদের সমাধিসমূহ বিদ্যমান উল্লেখিত মাদরাসা-এ রহীমিয়্যা তৎকালে সেখানেই ছিল। (হায়াতে অলী, পৃঃ ২২) কিন্তু পরবর্তীকালে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রসিদ্ধি যখন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে আর দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা তার দিকে ছুটে আসতে থাকে তখন মাদরাসা-এ-রহীমিয়্যায় স্থানাভাব দেখা দিলে তদানিন্তন বাদশাহ সম্রাট মুহাম্মদ শাহ মাদরাসার জন্য বিশাল একটি ইমরাত দান করেন। ফলে মাদরাসার প্রাচীন ভবনটি অনাবাদ পড়ে থাকে। এদিকে নতুন ভবনটি একটি বিশ্বব্যিালয়য়ের আকার লাভ করে। ভবনটি এতখানি মজবুত ছিল যে, ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় থাকে। কিন্তু সে বছর সিপাহী বিপ্লবোত্তর ইংরেজদের নির্যাতনের সময় মাদরাসা ভবন লুণ্ঠিত হয়। ভবনের এক একটি ইট পর্যন্ত খুলে নিস্ত নাবুদ করে দেওয়া হয় এবং ভূমি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। এ মাদরাসা কতটুকু এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল তার একটা অনুমান এভাবে মিলে যে, বর্তমানে সেই জায়গায় বিশাল একটি মহল্লা আবাদ হয়ে আছে। এ মহল্লা বর্তমানেও মাদরাসা-এ শাহ আবদুল আযীয নামে পরিচিত। (দারুল হুকমত দিল্লী, মৌলভী মুহাম্মদ বশীর, খ. ২ পৃঃ ২৮৬, খ. ৩ পৃঃ ১৬৭)।

৬২. ইমাম শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর নিকট থেকে প্রশিক্ষণ লাভের পর তাঁর এই প্রতিনিধিগণ ভারতবর্ষের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েন। তৎকালের জনৈক আলিম ভারতবর্ষের সকল এলাকা পর্যটন করে এমন কিছু হাদীস বিশারদ আলিমের সন্ধান করছিলেন যারা শাহ আবদুল আযীযের ছাত্র নন। কিন্তু পর্যটনকারী উক্ত আলিম সেই বিশেষণের একজন হাদীস বিশারদকেও ভারতবর্ষে খুঁজে পান নি। (শাহ ওয়ালী উল্লাহ কী সিয়াসী তাহরীক, পৃঃ ১১৮)।

৬৩. এটি শুধু হযরত শাহ আবদুল আযীয় (রহ)-এর সঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ খান্দানের সকলের মধ্যেই প্রশিক্ষণ দানের এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রার রূহানিয়্যাত অর্জনের একটি বাহ্য নিদর্শন এই ছিল যে, এ খান্দানের কেউ কখনও রাজকীয়

পদমর্যাদা কিংবা সম্রাটের পক্ষ থেকে প্রদত্ত কোন 'জায়গীর' গ্রহণে সম্মত হন নি। শাহ আবদুল আযীয় (রহ)-এর পিতামহ হযরত শাহ্ আবদুর রহীম (রহ) সম্রাট আলমগীর-এর যুগের প্রখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ আলিমরূপে বিবেচিত ছিলেন। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী গ্রন্থ রচনার জন্য আলিমদের যে বোর্ড বানানো হয়েছিল সেখানে সম্রাট হযরত শাহ আবদুল রহীম (রহ)কেও সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেন। শাহ্ সাহেবের আম্মাজানও তাকে সম্রাটের অনুরোধ রক্ষা করে বোর্ডের সদস্যপদ গ্রহণের পক্ষে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। কারণ সদস্য হওয়ার দ্বারা একেতো ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে দিন রাত ডাল রুটির অভাব অনটন ও দুশ্চিন্তা কিছু পরিমাণ লাঘব হবে। কিন্তু শাহ্ আবদুর রহীম সম্রাটকে পরিষ্কার ভাষায় অসম্মতির কথা জানিয়ে দেন এবং মাতার কাছে নিজের অপারগতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর জবের রুটির ওপর পরিতৃপ্ত থেকে জনসেবার কাজে জীবন অতিবাহিত করেন। অবশ্য আলমগীরী বোর্ডের সঙ্গে যেসব আলিম জড়িত ছিলেন তাদের সময়মত মূল্যবান পরামর্শ ও পথনির্দেশ দান করা থেকে বিরত থাকেন নি।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর আদর্শও ছিল অনুরূপ। শাহজাদা ও রাজপুত্ররা তাঁর দরবারে আসা যাওয়া করত। তাঁর পা দাবানোর সুযোগ লাভ করাকে নিজেদের সৌভাগ্য জ্ঞান করত। (মলফূযাত, পৃঃ ৫৩) পথিমধ্যে কখনও কোন নওয়াব কিংবা আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে তারা সওয়ারী থেকে নেমে মুসাফাহা ও খবরাখবর নিত। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২) স্বয়ং সম্রাটও যদি কোথাও সাক্ষাৎ পেতেন তাহলে পূর্ণ ইজ্জত মুহতিরাম প্রদর্শন করে মুসাফার জন্য অগ্রসর হয়ে আসতেন। কখনও কোন দুঃসংবাদ কিংবা অস্থিরতার সম্মুখীন হলে তাঁর কাছে দু'আ চেয়ে পাঠাতেন অথচ শাহ্ আবদুল আযীয (রহ) নিজের এতটুকু ইজ্জতের কথা জেনেও রাজকীয় হাদিয়া তোহফা গ্রহণের প্রতি এতখানি নিরাকর্ষণ ও অনীহা ভাব পোষণ করতেন যে, আমীর উমারা কিংবা সম্রাট কখনও তার কাছে কোন হাদিয়া পেশ করার হিম্মতটুকুও পেতেন না। কারণ তারা ভালভাবেই জানতেন যে, তাদের এ সকল বৈষয়িক হাদিয়া শাহ্ আবদুল আযীযের কাছে তুচ্ছ নজরে প্রত্যার্পিত হবে।

ور طمع خوابد زمن سلطان دین - خاك بر فرق قناعت بعد ازین (خسرُ)

মলফুযাত গ্রন্থ থেকে উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা হল ঃ

একবার দিল্লী শহরে মহামারী দেখা দিল। মুসলমান সকলে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, জামে মসজিদে সবাই একত্রিত হয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করবেন এবং দু'আ করবেন। সম্রাটের পক্ষ থেকে সমাবেশের আয়োজন করা হল। হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর কাছে সম্রাটের ব্যক্তিগত দূত উপস্থিত হয় এবং তাকে সে সমাবেশ উপস্থিত থাকার জন্য সম্রাটের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানায়। সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল সকাল ৮টা। যথাসময়ে শাহ্ সাহেব যখন গিয়ে পৌঁছেন সম্রাটের সওয়ারীও ঠিক সে মুহূর্তে এসে দাঁড়ায়। জামে মসজিদের সিঁড়িতে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটল। সম্রাট সামনে অগ্রসর হয়ে মুসাফা করলেন এবং সৌজন্যমূলক বললেন, এখানে আগমন করার জন্য আপনাকে কষ্ট দিয়েছি, অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি, আশা করি ক্ষমার চোখে দেখবেন।

শাহ্ আব্দুল আযীয ঃ এটা তো গণমানুষের কল্যাণার্থে আয়োজন। কাজেই এখানে অসুবিধার কি আছে? তারপর সম্রাট অনুরোধ জানিয়ে বললেন ; ছোট ভাই মাওলানা

রফীউদ্দীন সাহেবকে মেহেরবাণী করে বলে দিন তিনি যেন নামাযের ইমামত করেন। শাহ সাহেব বললেন, এ দায়িত্ব তো জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের। সুতরাং তাঁকেই বলে দিন, তিনিই ইমামত করবেন। এভাবে নামায শেষ হওয়ার পর যখন দু'আ ও ইস্তেগফারের সময় আসল সম্রাট তখন অনেক পীড়াপীড়ি করে হযরত শাহ আবদুল আযীযকে নিজের কাছে ডেকে আনলেন। তিনি একান্ত নিরূপায় হয়ে সম্রাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। ইত্যবসরে দিল্লীর অপর এক বুযর্গ হযরত শাহ গোলাম আলী সাহেবকে সামনে ঠেলে দিয়ে নিজে পেছনে সরে যান। (মলফুযাত, পৃঃ ৭৭-৭৮) মোট কথা, তদানিন্তন সম্রাটের কাছে তার এতখানি মান-মর্যাদা থাকাসত্ত্বেও না সম্রাটের এতটুকু হিম্মত হত যে তাকে কোন হাদিয়া পেশ করবেন আর না এ পক্ষে হাদিয়া গৃহীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল। কারণ রাজকীয় নজর নেওয়াজ একেতো হালাল ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত অপরদিকে এ হাদিয়া গ্রহণের কারণে স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়ার আশংকাও বিদ্যমান। হযরত শাহ আবদুল আযীযের এখানে অর্থকড়ির আদৌ প্রয়োজন ছিল না এমন কথাও নয়। তিনি বিশাল একটি শিক্ষাগার তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তার এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লঙ্গরখানাও জারী থাকত। তবে নিজ পরিবারের সকলে ছিলেন অনাহার বরণে অভ্যস্ত। একবার ক্রমাগত অনাহারের দরুন পরিবারের ছোট শিশুরা পর্যন্ত হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিল। কাজের মেয়েদের একজন অসহ্য হয়ে কোথাও এ কথা বলে ফেলে। ফলে তিনি মেয়েটিকে বিদায় করে দিয়ে বলেন, সে আমাদের পরিবারের গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে। (আমীরুর রেয়ায়াত)।

শাহ সাহেবের জনৈক বন্ধু অধ্যয়ন করার জন্য তাঁর নিকট থেকে কয়েকখানা কিতাব ধার নিয়েছিলেন। কিতাবগুলোর বাঁধাই পুরাতন হয়ে গিয়েছিল বিধায় তিনি এগুলোকে নতুনভাবে বাঁধাই পূর্বক ফেরত দেন। পরে হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর কাছে কিতাবগুলো ফেরৎ আসলে যেহেতু উক্ত বন্ধু সরকারি ভাতা ভোগী ছিলেন এ কারণে শাহ সাহেব কিতাবগুলো থেকে নতুন বাঁধাই ছিড়ে ফেলেন। উদ্দেশ্য ছিল যেন সরকারি আমদানীর সামান্য কোন অংশও নিজের ব্যবহারের ভিতর অন্তর্ভূক্ত না হতে পারে। মাওলানা রহীম বখশ সাহেব বলেন, ওফাতের সময় হযরত শাহ আবদুল আযীয অসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু সংবাদ যেন সম্রাটকে না জানানো হয় । (হায়াতে অলী, পৃঃ ৩৪৪)। তবে এখানে একটি কথা লক্ষণীয় যে, জনসেবার সঙ্গে জড়িত থাকা ছিল এ খান্দানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই চেতনা ও বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমরূপে মুদ্রণের কাজকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল (মলফূযাত, পৃঃ ৪৩)।

৬৪. মাওলানা রহীম বখশ দেহলভী বলেন, সপ্তাহের দু'দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার ও শুক্রবারে পুরাতন মাদরাসা ভবনে ওয়াযের মাহফিল অনুষ্ঠিত হত। সাধারণ মানুষ ও আলিমদের বহু সংখ্যক এ মাহফিলে যোগদান করতেন। শাহ সাহেবের যাদু বক্তৃতার মধ্যে এমন প্রভাব ছিল যে, বিরুদ্ধবাদীরা মাহফিলে আসার সময় মনে মনে নানা রকমের প্রশ্ন ও আপত্তি ঠিক করে আসত। কিন্তু মাহফিলে বসে ওয়াজ শ্রবণের সময় সে সব প্রশ্ন বা আপত্তির কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। ফলে নীরবে শ্রবণ করা ব্যতিরেকে কারুর জোরে শ্বাস নিক্ষেপেরও অবকাশ হত না। তাঁর উপস্থাপন পদ্ধতি ছিল বড় চমৎকার। সকল মাযহাব ও সকল

ধর্মের লোকেরা আনন্দচিত্তে মাহফিল শেষ করত। কারুর ওপর তাঁর কোন কথা ভারী বলে বোধ হত না। জনগণের প্রতি তার কল্যাণকামিতা শেষ জীবন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। জীবনের অন্তিমকালে যখন তিনি মৃত্যু শর্যায় শায়িত তখনও মাহলিফের নির্ধারিত দিন অন্যদের ওপর ভর করে ওয়াযের জন্য বসেন। ওয়ায শুরুর পর কিছুটা শক্তি অনুভব করলে সহযোগিতাকারী ব্যক্তিকে সরিয়ে দেন এবং পূর্বের ন্যায় যথারীতি আলোচনা চালিয়ে যান। তবে কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণে দুর্বলতার ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। এভাবে আলোচনা শেষ করার পর তিনি দু'আ করেন। তখন কিছু অসীয়তও করেছিলেন। এর কয়েকদিন পরেই তাঁর ওফাত হয়।

আলোচনা বিষয়বস্তু ঃ

মলফূযাত থেকে গৃহীত একটি উদ্বৃতি থেকেই আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, আমাকে যদি অযোধ্যার নবাব গাযীউদ্দীন হায়দার সাহেবও তার সেখানে আহবান করেন তা হলে আমি সেখানেও যেতে সম্মত আছি। তবে শর্ত হল সরকারি কোন পদ গ্রহণ কিংবা জায়গীর গ্রহণের কোন বাধ্য বাধকতা না থাকতে হবে। এবং আমি এভাবে আলোচনা করার জন্য সচেষ্ট থাকব যে, তাঁর চক্ষু খুলে যাবে এবং সে সরল পথে দীক্ষিত হতে বাধ্য হবে। তারপর বলেন, বর্তমানে আমাকে হত্যা করা হবে এমন ভয়ও আমার নেই। কেবল এতটুকু মনে আসে যে, যদি এ অবস্থায় আমাকে হত্যা করা হয় তা হলে আমার শুরু করা মহান উদ্যোগটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। (মলফূযাত, পৃঃ ৫১)।

গাযীউদ্দীন হায়দার অযোধ্যার নবাব ছিলেন। তার পূর্ব পুরুষগণ (সাদাত আলী খান, শুজাউদ্দৌলা, সফদর জঙ্গ প্রমুখ) এ মর্মে গর্ববোধ করতেন যে, তারা দিল্লীর রাজ দরবারে মন্ত্রীত্বের আসন অর্জন করে আছেন। কিন্তু গাডীউদ্দীন দিল্লী রাজ দরবারের সহিত পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্যবাহী সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ইংরেজ গভর্ণর জেনারেলের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন। (কাযসারুত তারীখ, তারীখে উধ, ইমাদুস সায়াদত প্রভৃতি)।

৬৫. হায়াতে অলী গ্রন্থের লেখক মাওলানা মুহাম্মদ রহীম বখশ দেহলভী তার কিতাবে মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদীকেও হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর শাগরিদদের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করেছেন। তবে শুদ্ধ মতে মাওলানা খায়রাবাদী শাহ সাহেবের সরাসরি ছাত্র ছিলেন না। তবে শাগীরদের শাগিরদ ছিলেন। অর্থাৎ মাওলানা খায়রাবাদীর উস্তাদ ছিলেন হযরত শাহ আবদুল কাদির (রহ)। তার উস্তাদ ছিলেন হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)। (সিয়ারুল উলামা, তাযকিরায়ে উলামায়ে হিন্দ, প্রভৃতি)।

৬৬. এ দলটি ছিল উপমহাদেশে ইংরেজ সমর্থক দল। দুর্ভাগ্য বশতঃ এরা ধর্মীয়ভাবে ছিল শীয়া মতাবলম্বী। তাদের নেতা ছিলেন নাজিফ খান-যাকে শুজাউদ্দৌলা ও ইংরেজদের অনুরোধে দিল্লীর আমীরুল উমারা নিযুক্ত করা হয়েছিল। মারাঠা রাজা এ পদে কোন রোহিলা সর্দারের নিযুক্তি কামনা করতেন। সেমতে মারাঠারা প্রথমতঃ নাযীবুদ্দৌলাকে এ পদের জন্য সমর্থন দেয়। নাযীবুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র যাবেতা খানকে তারা সমর্থন করে। বিস্তারিত পরে আলোচিত হবে। হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ) নযীবুদ্দৌলার

সমর্থক ছিলেন। একবার তার প্রশংসা করে তিনি বলেন, নাযীবুদ্দৌলার সরকারে প্রায় একশত জন আলিমই ছিলেন। পাঁচ টাকা থেকে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত তাদেরকে অযীফা দেওয়া হত। হানাফী, শাফেয়ী ও মোলেকী এ তিন মাযহাবের তিনজন বিজ্ঞ আলিম উচ্চ আদালতের বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন। (মলফুযাত, পৃঃ ৮১)

৬৭. কবিতার চরণটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

در کوئے نیك نامی مارا گزر نداند – در تونمی پسندی تغییر کن قظارا (ملفوظات ٥٤)

৬৮. আমীরুর রেওয়ায়াত, আরওয়াহে ছালাছা, পৃঃ ২৪।

৬৯. মানাকিবে ফরীদী, তারীখে মাশায়েখে চিশত গ্রন্থের সূত্র অনুযায়ী।

৭০. আরওয়াহে ছালাছা, পৃঃ ২৪।

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও কলহলিপ্ত শক্তিসমূহ

এ যাবৎ যা আলোচিত হয়েছে তা ছিল হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্ম-জীবনের সামান্য একটি ঝলক মাত্র। এখন আসুন, তৎকালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অঙ্গনে কেমন অস্থিরতা বিরাজ করছিল তার ওপরও একটি সংক্ষিপ্ত নযর বুলিয়ে নেয়া যাক। তা হলে সে সব জটিল পরিস্থিতির একটা অনুমান করা সম্ভব হবে যেগুলোর আবেষ্টনীর মধ্যে অটল দাঁড়িয়ে হযরত শাহ আবদুল আযীয রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে মূল্যবান অবদান রেখে গিয়েছেন।'

পলাশী যুদ্ধের (রমযান ১১৭১ হি., মে ১৭৫৭ খৃ.) পর নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতন ঘটার মধ্য দিয়ে যে কালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশের কর্তৃত্ব লাভ করে সে কালে মোঘল সিংহাসন জাট[৭১], মারাঠা[৭২], শিখ[৭৩] ও আহমদ শাহ আবদালীর[৭৪] নানাবিধ আবর্তনের মধ্যে বন্দী অবস্থায় ছিল। উপরোক্ত ঝড় তুফান ছাড়াও তখন প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ[৭৫], মন্ত্রী পরিষদ ও আমীরদের মধ্যে সৃষ্ট পারস্পরিক সংঘাত রীতিমত ক্যানসারের আকার ধারন করে মোঘল সাম্রাজ্যের অস্তিমজ্জা ক্রমে ধ্বংস করে যাচ্ছিল। এই দূরারোগ্য ক্যানসারই পরে হিজরী ১১৭২ সালের মুহাররম মোতাবেক ১৭৫৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের হত্যাকান্ডের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।[৭৬] যার অণিবার্য পরিণতি আহমদ শাহ আবদালীকে শক্তি পরীক্ষার এক চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য বাধ্য করে এবং মারাঠাদের বিশাল শক্তির অকল্পনীয় পতন ঘটে।

এ সকল ঝড় তুফান অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও পলাশী যুদ্ধোত্তর দিল্লীর অধিপতি হিসাবে মোঘল সম্রাটের ওপর অর্পিত দায়িত্ববোধ থেকে তিনি উদাসীন থাকেন নি। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সেই দূরারোগ্য ক্যানসার যা মোঘল সালতানাতের এক একটি বাহু অকেজো করে যাচ্ছিল সেটি প্রথমতঃ সম্রাটের কর্তব্য পালন পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং পরে তাঁর আত্মরক্ষার যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টাকেও ব্যর্থ করে দেয়।

ইতিহাসের একজন সাধারণ পাঠকের কাছেও এ কথা অজানা নয় যে, যে কালে বাংলা ও বিহার অঞ্চলে স্বদেশীয় রাজাদের কর্তৃত্ব বিপন্ন হয়ে ইংরেজ আধিপত্য ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে সে কালে মারাঠাদেরকে রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত[৭৭] যিনি হাতছানি দিয়ে পৌঁছিয়ে দেন তিনি ছিলেন নেযামুল মূলক প্রথম আসিফ জাহ।[৭৮] তারপর এই মারাঠাদেরকে যিনি নানা কৌশলে অযোধ্যা[৭৯] ও রোহিলা খন্ডের[৮০] নওয়াবদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন এবং পাঞ্জাবের[৮১] রাস্তা দেখিয়ে আবদালীর মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দেন তিনি ছিলেন এই নেযামূল মূলক আসিফ জাহের জ্যেষ্ঠপুত্র ইমাদুল মুলক গাযীউদ্দীন খান।[৮২] সুযোগের সদ্ব্যবহারের দরুন তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কেননা পানিপথ রণক্ষেত্রে[৮৩] যখন প্রলয়ংকরী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল তখন রাজনৈতিক স্বার্থপুজারী এই গাযী সাহেব শামসুল উলামা যাকাউল্লাহ খান মরহুমের ভাষায়, 'তখন তিনি (গাযী উদ্দীন খান) নিজকে বাঁচিয়ে নিজের বন্ধু ভরতপুর মহারাজার (সুরজমল জাট) দূর্গে প্রবেশ করে আশ্রিত অবস্থায় থাকেন।

মোদ্দা কথা তদানিন্তন ঘটনাসমূহের ধারাবাহিক বিবরণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

পলাশী যুদ্ধের প্রায় ছয় মাস পূর্বে হিজরী ১১৭০ সালের জুমাদাল উলা মাসে (মোতাবেক ডিসেম্বর ১৯৫৬, জানুয়ারি ১৯৫৭ খৃঃ) আহমদ শাহ আবদালী যখন তার পঞ্চম অভিযানে জয় লাভ করে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তিনি রোহিলা নেতা নাজীব খানকে আমীরুল উমারা পদে সমাসীন করেন এবং নজীবুদ্দৌলা খেতাব প্রদান করে তাঁর উপর প্রশাসনিক দায়িত্বভার অর্পন করেন। অর্থাৎ তিনি তখন মোঘল সাম্রাজ্য রোহিলা পাঠানদের তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেন।

আবদালীর এ পদক্ষেপ খুবই উপযুক্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ ছিল। কারণ তিনি ভারত সাম্রাজ্য একটি উদীয়মান শক্তির হাতে অর্পন করেছেন। কিন্তু এখানে দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল যে, এই উদীয়মান শক্তিটি রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে ছিল সম্পূর্ণ একলা ও নিঃসঙ্গ। মারাঠা কিংবা জাটদের সাথে যেমন তাদের সম্পর্ক ছিল না তেমনি ইংরেজদে সাথেও তাদের কোন জানা শোনা ছিল না। উপরন্ত নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলও[৮৪] বিদ্যমান ছিল। ফলে এক বছর অতিক্রম হতে না হতেই গাযীউদ্দীন খান নিজের রাজনৈতিক বলয় সৃষ্টি করে

নজীবুদ্দৌলাকে দিল্লী থেকে বহিষ্কার করে দেয়। গাযীউদ্দীন খান রোহিলাদের অন্যতম একটি শক্তিশালী খান্দান 'বাঙ্গাশ'কে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেয় এবং যুদ্ধে নাজীবুদ্দৌলাকে পরাজিত করে দেয়। এ ব্যাপারে শামসুল উলামা যাকা উল্লাহ খান বলেন,

> 'দিল্লী থেকে যে মূহুর্তে আহমদ শাহ আবদালী প্রত্যাবর্তন করেন তখন গাযীউদ্দীন খান ফররুখাবাদে ছিলেন। তিনি নাজীবুদ্দৌলার বিপরীতে আহমদ খান বাঙ্গাশ (ফারুখাবাদের গর্ভণর)-কে আমীরুল উমারা নিযুক্ত করেন এবং শাহজাহানাবাদ (দিল্লী) অবরোধের জন্য সসৈন্যে যাত্রা করেন। তবে তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, নাজীবুদ্দৌলাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া তার একার পক্ষে সম্ভব হবে না। আর মারাঠাদের কাছ থেকেই তার প্রতি প্রচুর সাড়া জেগে উঠেছিল। কাজেই তিনি দক্ষিণ ভারত থেকে রঘুনাথ রাওকে ও মলহার রাও নিজের সাথে ডেকে নেন এবং শাহজাহানাবাদ অবরোধ করেন। সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর ও নাজীবুদ্দৌলা অবরুদ্ধ হন। সাতাইশ দিন পর্যন্ত উভয় পক্ষে তোপ কামানের লড়াই অব্যাহত থাকে। পরিশেষে সম্রাট মারাঠা নেতা হোলকারকে প্রচুর অর্থ ঘুষ দিতে সম্মত হলে অবরোধ তুলে নেয়া হয়।
>
> তখন ইমাদুল মূলক (গাযীউদ্দীন খান) অতি সহজে নাজীবুদ্দৌলাকে দিল্লী থেকে বহিষ্কার করে দিলে তিনি নিজের জায়গীর (সাহারানপুর, চাঁদপুর, বিজনৌর) অঞ্চলে চলে যান। এদিকে গাযীউদ্দীন খান অবশিষ্ট অফিসারদের মধ্যে যারা সম্রাটের পক্ষে ছিলেন তাদেরকে কারারুদ্ধ করেন।[৮৫]

সার কথা হল যে, পলাশী যুদ্ধকালীন ১৭৫৭ সালের মে (রমযান ও শাওয়াল, ১১৭১ হিঃ) মাসে মোঘল রাজত্বের সর্বোচ্চ দায়িত্বপদ নাজীবুদ্দৌলার ওপর অর্পিত ছিল। এই নাজীবুদ্দৌলা কেবল ক্ষমতার অভিলাষীই ছিলেন না। বরং তার মধ্যে স্বজাতির মর্যাদাবোধ ও স্বদেশ প্রেমের উন্নত বিশেষণও ছিল। তিনি সম্রাটকে পরামর্শ দিয়ে যুবরাজ অর্থাৎ শাহজাদা আলী গাওহার (যিনি পরবর্তীকালে শাহ আলম উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন)কে ঝজর ও হাঁসি প্রভৃতি অঞ্চলের জায়গীর প্রদান করে দিল্লী থেকে পাঠিয়ে দেন। তাছাড়া নাজীবুদ্দৌলা শাহজাদার জন্য একটি রাজকীয় ফরমানও নিয়ে দেন। ফরমানে লেখা ছিল ঃ

شماوارث ملك هستيد تا جانيكه نوايند عمل خود نمائيد

অর্থাৎ তুমি সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকারী। কাজেই যতটুকু সম্ভব নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নাও।

বলা বাহুল্য সাম্রাজ্যের দুর্যোগপূর্ণ এ সময়ে যখন গাযীউদ্দীন খানের পক্ষ থেকেও আক্রমণের আশংকা বরাবর লেগে ছিল এবং কয়েক মাসের ব্যবধানে তা বাস্তবেও ধরা পড়েছিল–নাজীবুদ্দৌলা ও সম্রাটের গৃহীত এ পদক্ষেপ দেশপ্রেমের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে।

নাজীবুদ্দৌলার শাসনাধীন আশাব্যঞ্জক অবস্থা মাত্র অল্প কিছুদিন স্থায়ী থাকে। তারপরই আবার শুরু হয় গাযীউদ্দীন খানের কুশাসন। তিনি কিছুতেই এ কথা সহ্য করতে পারতেন না যে, সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী তথা মোঘল যুবরাজ তার ক্ষমতার আওতামুক্ত থাকবেন। কাজেই তিনি সম্রাটের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন এবং শাহজাদাকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিতে বাধ্য করেন। নির্দেশ পেয়ে শাহজাদা নিরুপায় হয়ে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন এবং আলী মর্দান খানের দুর্গ সাদৃশ্য বাড়িতে অবস্থান করেন।

গাযীউদ্দীন খানের চিন্তা-ভাবনা ছিল যে কোন উপায়ে হোক শাহজাদাকে কারারুদ্ধ করা।[৮৬] যেন তিনি পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেন। কাজেই তিনি সৈন্য পাঠিয়ে আলী মর্দানের বাড়ি অবরোধ করান। কিন্তু শাহজাদা টের পেয়ে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে বেঁচে যান। শাহজাদা তার কতিপয় সঙ্গীদের নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ির জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েন।[৮৭] তারপর দেওয়াল টপকিয়ে গিয়ে ঘোড়াগুলো নদীতে নামিয়ে যমুনা অতিক্রম করেন। এভাবে তিনি মজনু টিলা পর্যন্ত পৌঁছে যান। সেখানে মারাঠা রাজার একটি সৈন্য শিবির স্থাপিত ছিল। রাজা শাহজাদার প্রচুর সমাদরসহ তাকে ফররুখ নগর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। এখানে কামগার খানের পুত্র মুসা খান বেলুচ তাকে কয়েক হাজার টাকা নজরানা দেন। মারাঠা সেখানে পৌঁছে পৃথক হয়ে গেলে শাহজাদা সাহারানপুর নাজীবুদ্দৌলার কাছে চলে আসেন। তারপর আট মাস পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। একালে বঙ্গ প্রদেশে রাজনৈতিক আমূল পরিবর্তন চলতে থাকে। মীর জাফর ইংরেজদের সহায়তা লাভ করে বঙ্গ দেশের ক্ষমতা কেড়ে নেন। কাজেই

পরিস্থিতি বিবেচনা করে নাজীবুদ্দৌলা শাহজাদাকে বঙ্গ দেশের অভিমুখে যাত্রা করার পরামর্শ দেন।[৮৮]

সম্রাটের হত্যাকান্ড

শাহজাদা গাযীউদ্দীনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মুরাদাবাদ, বেরেলী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ হয়ে তিনি পাটনা গিয়ে উঠেন এবং ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু সম্রাটের এই দুঃসাহস শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনের প্রতি হুমকির কারণে পরিণত হল।

গাযীউদ্দীন খান কেবল প্রধান মন্ত্রীত্বই নয় বরং সম্রাট রদবদলের কর্তৃত্বও চালাতে থাকেন।[৮৯] তিনি গোপনে সম্রাটকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত হিজরী ১১৭৩ সালের রবিউস সানি (নভেম্বর ১৭৫৯) মাসে আপন ষড়যন্ত্রে সফলতা অর্জন করেন।[৯০]

গণমানুষের অনুভূতি

গাযীউদ্দীন খান সম্রাটকে হত্যা করানোর পর একই দিন তদস্থলে সম্রাট আওরঙ্গজেবের জনৈক পৌত্র (মহীউস সুন্নাহ ইবন কাম বখশ ইবন আলমগীর)কে দ্বিতীয় শাহজাহান উপাধি দিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করান। কিন্তু এ নতুন সম্রাটকে লোকজন সম্রাট বলে মেনে নেয় নি। বরং শাহজাদা আলী গাওহারকেই সকলে সম্রাট হিসাবে বরণ করে। (বিস্তারিত পরে আলোচিত হবে)।

এরপর শুরু হয় ইতিহাসের নতুন অধ্যায়। এ ব্যাপারে আরও কিছু ইঙ্গিত পরে আলোচনা করা হবে। তবে এখানে একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, আহমদ শাহ আবদালীর চূড়ান্ত অভিযান অর্থাৎ যে অভিযানে তিনি মারাঠা শক্তির কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন সেটি শুধু মারাঠাদের বিপরীতেই ছিল না বরং গাযীউদ্দীন তখন এতটুকু বেড়ে গিয়েছিল যে, কোন আমীর কিংবা কোন উজীর তো তুচ্ছ স্বয়ং সম্রাট পর্যন্ত তার হাত থেকে নিরাপদ ছিলেন না। এ কারণেই তখন আহমদ শাহ আবদালীকে আহবান করার পক্ষে কেবল নাজীবুদ্দৌলা কিংবা পাঠান সম্প্রদায়ই ছিল না বরং মীর গোলাম হোসাইন খান তাবতাবায়ীর মতানুসারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজাগণও আবদালীকে আহবান করার কাজে অংশীদার ছিলেন। তাবতাবায়ী বলেন,

نجیب الدولة وجمیع افاغنه وراجهائے ہندوستان از دست مرہٹه وعماد الملك (غازی الدین خان) بجاں آمده عرائض بخدمت احمد شاه ابدالی نگاشته استدعا دردو واور در درحدود ہندوستاں کردند (سیر المتأخرین)

এ কারণে আমরা আবদালীর এই আক্রমণকে না হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ বলে অভিহিত করতে পারি আর না এটিকে শিয়া-সুন্নীর দ্বন্দ্ব বলা যায়। বাস্তবে এর সঠিক মন্তব্য হল এটি উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের মাঝে প্রাচীনকাল থেকে যে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল আবদালীর আক্রমণের মধ্যদিয়ে সেই দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে।[৯১]

ইতিহাসের এ অংশটির ওপর যেহেতু অসত্য বিবরণের কয়েক পরত পড়ে রয়েছে তাই আমরা ঝাড়ামোছা করে কিছু পরিচ্ছন্ন আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সম্মুখে আমাদের কাছেও আলোচনা দীর্ঘ করার অবকাশ নেই আর পাঠকদের হাতেও সেই সুযোগ কোথায় কাজেই সংক্ষেপে শাহজাদা আলী গাওহারের কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করা হল মাত্র।

আলী গাওহার দিল্লী থেকে যাত্রা করার পর

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শাহজাদা আলী গাওহার দিল্লী থেকে সরে গিয়ে সাহারানপুর নজীবুদ্দৌলার কাছে চলে যান। সেখানে প্রায় তিনি আটমাস অবস্থান করেন। নাজীবুদ্দৌলা এ সময় শাহজাদার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ রসদ ও পাথেয় আয়োজন করে দেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাকে বঙ্গদেশের দিকে পাঠিয়ে দেন। শাহজাদা সাহারানপুর থেকে যাত্রা করে নাজীবাবাদ, মুরাদাবাদ ও বেরেলী হয়ে লক্ষ্ণৌ পৌঁছেন। লক্ষ্ণৌর নবাব শুজাউদ্দৌলা শাহজাদার পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করেছেন তবে শাহজাদার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের কেবল এতটুকুই আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন যে, তাকে নগদে ও বিভিন্ন হাদিয়ার আকারে আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকার মত নজরানা পেশ করেন।

লক্ষ্ণৌ থেকে শাহজাদা চলে যান এলাহাবাদে। সেখানকার গভর্ণর ছিলেন মুহাম্মদ কুলি খান।[৯২] তিনি শাহজাদার সাহায্যের জন্য দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করেন[৯৩] এবং শাহজাদার নিকট থেকে বিহার ও বঙ্গদেশের সুবাদারীর ফরমান

অর্জন করেন। তারপর বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ শাহজাদার সঙ্গে বিহার অভিযানে যাত্রা করেন। শাহজাদা আযীমাবাদ দুর্গ আক্রমণ করে জয় করে নেন।[৯৪] এ সফরে তিনি বঙ্গদেশ যাত্রাকালে হিজরী ১১৭৩ সালের রবিউস সানি মোতাবেক ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে 'করমবাসা' অতিক্রম করছিলেন তখনই পিতা দ্বিতীয় আলমগীরের হত্যাকান্ড ঘটে। এ ঘটনার দীর্ঘ একমাস পর শাহজাদা যখন বিহারের কাতুনী গ্রামে[৯৫] অবস্থান করছিলেন তখন তার কাছে পিতার মৃত্যু সংবাদ গিয়ে পৌঁছে। শাহজাদা তৎক্ষণাৎ ' শাহআলম' উপাধি ধারণ করে রাজ সিংহাসনের[৯৬] অভিষেক গ্রহণ করেন।[৯৭]

শুজাউদ্দৌলা যেহেতু পূর্ব থেকেই দিল্লী রাজদরবারের মন্ত্রী পদে সমাসীন ছিলেন এবং তাকে নওয়াব উজীর শুজাউদ্দৌলা নামে অভিহিত করা হত। এবার শাহজাদা সম্রাটের পদ অবলম্বন করা ও মুহাম্মদ কুলি খানের সহিত শাহজাদার সদ্ভাবের কথা চিন্তা করে তিনি ভাবলেন মুহাম্মদ কুলি খান নতুন সম্রাটের কাছ থেকে মন্ত্রীত্বের পদ অর্জন করে নিতে পারে। কাজেই তিনি কুলি খানের এলাকায় সৈন্য প্রেরণ করে তার দুর্গ দখল করে নেন এবং মুহাম্মদ কুলি খানের পরিবার পরিজনকে বন্দী করেন। তারপর নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজা বিনী বাহাদুর ও রাজা বুলন্ত সিংকে আদেশ দেন যে, মুহাম্মদ কুলি খান ফিরে আসা মাত্রই যেন তাকে বন্দী করা হয়।

মুহাম্মদ কুলি খান এ দুঃসংবাদ শোনা মাত্রই নিজ দূর্গে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন। তার বিশিষ্ট সহচর ফরাসী জেনারেল 'মশিরলাস' তাকে শক্তভাবে বারণ করলেও তিনি তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজ এলাকার দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু যখনই তিনি নিজ অঞ্চলের সীমানায় প্রকেশ করেন তৎক্ষণাৎ তাকে বন্দী করা হয়।[৯৮] তারপর শুজাউদ্দৌলা আহমদ শাহ্ আবদালীর সাহায্যার্থে পানিপথের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে মুহাম্মদ কুলি খানের শিরচ্ছেদের নির্দেশ দিয়ে যান। মুহাম্মদ কুলি খান নিহত হলেন তবুও তিনি হতোদ্যম হন নি। মুশিরলাস[৯৯] সহ কামগার খান, দীলর খান প্রমুখ আফগান সর্দারদেরকে সঙ্গে নিয়ে আযীমাবাদের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূলে ছিল না বিধায় শেষ পর্যন্ত তাকে পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে হল। এটি ছিল সেই সময় যখন পানিপথে আহমদ শাহ আবদালীর শক্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত যুদ্ধ চলছিল।

মোট কথা আহমদ শাহ দুররানী শেষবারের মত কৃপা করে শাহ আলমকে সম্রাট, শুজাউদ্দৌলাকে উজীর ও নাজীবুদ্দৌলাকে আমীরুল উমারা নিযুক্ত করেন। এবং শাহ আলম দিল্লী প্রত্যাবর্তন করার পূর্ব পর্যন্ত তদীয় পুত্র 'জাওয়ান বখত' কে নায়েবে সালতানাত পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কথা হল

تہیدستان قسمت راچہ سود از رہبر کامل

(দুর্ভাগ্য যার চতুর্দিকে ঘিরে আছে দক্ষ পথ-প্রদর্শক তার কি কল্যাণ করতে পারে ?)

সম্রাট শাহ আলমের অবস্থা দাঁড়াল এমন যে, বার বার পরাজিত হওয়ার দরুন তিনি শুজাউদ্দৌলার কাছে আশ্রয়ের জন্য বাধ্য হয়ে গেলেন। সে কালে মীর কাসিম (মীর জাফরের জামাতা) যিনি বিহারের স্বাধীন গভর্ণর ছিলেন, যেহেতু ইংরেজরা তার সঙ্গে পলাশী ষড়যন্ত্রে কৃত গোপন অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল সেহেতু তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারপর যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন এবং অযোধ্যা অভিমুখে শুজাউদ্দৌলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শুজাউদ্দৌলা মুহাম্মদ কুলি খানকে হত্যা করার পর মুহাম্মদ কুলি খানের মত সমগ্র বিহারের রাজত্ব গ্রাস করার স্বপ্ন দেখতেন। মীর কাসিম সাহায্য প্রার্থনা করলে এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের দুয়ার উন্মুক্ত হয়। তিনি মীর কাসিমকে সাহায্য করার নামে বাদশা শাহ আলমকেও নিজের সঙ্গে নেন এবং বিহার অভিযানে যাত্রা করেন।

সম্রাট শাহ আলম ও শুজাউদ্দৌলা সুবিশাল সৈন্যবাহিনী সহ প্রচুর জাঁকজমকের সাথে বিহারের দিকে রওয়ানা দেন। সুস্থ বিবেক বুদ্ধি তাদের এ সকল পরিকল্পনা দেখে বিদ্রুপাত্মক হাসি হাসছিল। কারণ যে সকল সৈন্যবাহিনী দিয়ে যুদ্ধ করা হবে তাদের মধ্যেই কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল না। আবার নেতৃবৃন্দের মনে আন্তরিকতারও প্রচুর অভাব ছিল। সৈন্যদল ছিল নির্মম শকুনের মত। যে দিক দিয়ে যেত তার আশেপাশের নিরীহ গ্রামগুলোকে উজাড় করে ফেলত। গ্রামবাসীরা সৈন্যদের দুর্ব্যবহারে মনঃক্ষুন্ন হয়ে ইংরেজদের আশ্রয় লাভের ইচ্ছা পোষণে বাধ্য হত।[১০০]

স্বয়ং সৈন্যদের নিজেদের মধ্যেও একজন অন্যজনকে হত্যা করা কিংবা একজনের ধন-সম্পদ অন্যজনের হাতে লুণ্ঠিত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছিল। অথচ নেতৃবৃন্দের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি এ সকল বিষয়ের খোঁজ-খবর রাখবেন।[১০১]

সেনাধ্যক্ষ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের মন মানসিকতার মধ্যেও অসমতা বিরাজিত ছিল। মীর কাসিম ছিলেন হতোদ্যমের শিকার। এদিকে শুজাউদ্দৌলা সম্রাটকে নিজের ওপর অবাঞ্ছিত ভার বলে বোধ করতেন আর সম্রাটের ধারণা ছিল যে, তিনি শুজাউদ্দৌলার করায়ত্বে ক্রীড়নকের জীবন-যাপন করছেন। অন্যদিকে এখানে নানাবিধ ষড়যন্ত্রের সুযোগও উন্মুক্ত অবস্থায় কেননা শুজাউদ্দৌলার বাহিনীর মধ্যে রয়েছেন বীনী বাহাদুর ও রাজা বুলন্ত সিং। তাদের উভয়েই ছিলেন ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সহচর।[১০২]

এদিকে নিহত মুহাম্মদ কুলি খানের শ্যালক[১০৩] 'নাজিফ খান' যিনি সম্রাটের একান্ত ঘনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করে নেন তিনি ছিলেন ইংরেজদেরই হাতের পুতুল। কাজেই স্বাভাবিক নীতি অনুসারে এহেন আত্মপ্রবঞ্চনামূলক পদক্ষেপের যে পরিণতি ঘটার ছিল যুদ্ধে তাই ঘটে। বিরাট সৈন্যবাহিনী ইংরেজদের মোকাবেলায় পরাজয় বরণ করে। মীর কাসিম ভগ্নমনরথ হয়ে শুজাউদ্দৌলার সঙ্গ ত্যাগ করে এবং যুদ্ধে চূড়ান্ত ফয়সালা এখনও হতে পারেনি ইত্যবসরে সম্রাট শাহ আলম শুজাউদ্দৌলার করায়ত্বে অতিষ্ট হয়ে রাজকীয় কর্তৃত্ব ভার ইংরেজদের হাতে অর্পন করে দেয়।

ইংরেজরা এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল। তারা শুজাউদ্দৌলার তুলনায় বহুগুণ বেশি তোয়াজ তোষামোদ ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে হিজরী ১১৭৮ সালের ৪ঠা রজব মোতাবেক ২৯শে ডিসেম্বর ১৭৬৪ খৃঃ তারিখে সম্রাট থেকে বিহার ও বঙ্গদেশের দেওয়ানী ফরমান অর্জন করেন। ফলে ইংরেজরা তখন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বজন স্বীকৃত ও পরিচিত বিধি[১০৪] মোতাবেক বাংলা ও বিহারের বৈধ শাসনকর্তার মর্যাদা লাভ করেন।

শুজাউদ্দৌলা তারপরেও কিছুদিন পর্যন্ত রোহিলা পাঠান ও মারাঠাদের সাহায্য নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। পরে তিনি দেখলেন

যুদ্ধের দিকে না গিয়ে বরং তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করার মধ্যেই নিজ স্বার্থ বেশি অর্জিত হবে। কাজেই তিনি সন্ধির পথ অবলম্বন করেন।

এই আট বছর যাবৎ অব্যাহত রঙ তামাশার সর্বশেষ দৃশ্য ছিল কোড়া জাহানাবাদের সম্মেলন। যা প্রায় নয় মাস অন্তর ২৪শে সফর ১১৭৯ হিঃ মোতাবেক ১২ই আগষ্ট ১৭৬৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে শুজাউদ্দৌলার রাজত্ব হ্রাস করে কেবল অযোধ্যার শাসনভার তার দায়িত্বে অর্পন করা হয়। এদিকে এলাহাবাদ গাযীপুর প্রভৃতি এলাকা সম্রাটের নিজস্ব জায়গীর সাব্যস্ত হয়। অন্যদিকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইতিপূর্বেই ইংরেজদের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। এ তিন প্রদেশের জন্য খাজনা বাবদ বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হল। তবে শর্ত ছিল যে, এই ছাব্বিশ লক্ষ টাকার মধ্য থেকে বাৎসরিক দু'লক্ষ টাকা নাজিফ খানকে দেওয়া হবে। ইংরেজরা দেওয়ানী অর্জনের পর সম্রাটকে বাৎসরিক খাজনা প্রদানের (২৬ লক্ষ টাকা) একটি সংক্ষিপ্ত পন্থা উদ্ভাবন করেন। অর্থাৎ নগদ ভাবে এ অর্থ আদায়ের পরিবর্তে তারা শুজাউদ্দৌলার রাজত্ব থেকে লাভকৃত এলাহাবাদ ও গাযীপুর প্রভৃতি এলাকা সম্রাটের জন্য জায়গীর হিসাবে ছেড়ে দেন। তা হলে এ অঞ্চল থেকে সম্রাট নিজের প্রাপ্য ২৬ লক্ষ টাকার খাজনা নিজেই তুলে নিবেন। এদিকে এসব এলাকার প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব 'নাজিফ খানের' ওপরও অর্পন করা হয়। সম্মেলনে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, এতদঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের স্বার্থে খাজনা হিসাবে উত্তোলিত এই ২৬ লক্ষ টাকার মধ্যে দু লক্ষ টাকা নাজিফ খানের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

মোট কথা হল সম্রাট শাহ আলম বাংলা ও বিহার পুনর্দখলের জন্য দিল্লী থেকে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের দরুন পুনর্দখল করার পরিবর্তে তিনি ইংরেজদের একজন ভাতাভোগী হয় প্রত্যাবর্তন করেন। এই ভাতাভোগীও এমন সহজ সাধিত ভাতাভোগী যার জন্য ইংরেজদের কখনও একটি কানা পয়সাও ব্যয় করার প্রয়োজন হয় নি। তবে এ সন্ধি চুক্তি স্থাপিত হওয়ার মাধ্যমে যিনি উপকৃত হয়েছেন এবং যার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে তিনি ছিলেন নাজিফ খান। যিনি একদিকে যেমন ইংরেজদের দালাল ও শুজাউদ্দৌলার স্বার্থ রক্ষাকারী ছিলেন তেমনি অন্যদিকে তিনি সম্রাট শাহ আলমের এতখানি

ঘনিষ্ঠতা ও বিশ্বাস অর্জন করেন যে, চুক্তি স্বাক্ষরের পর সম্রাট যখন দিল্লী গিয়ে পৌঁছেন তখন তাকেই তিনি নিজের প্রধান মন্ত্রীত্বের পদে নিযুক্তি দেন।

এখানে স্মরণযোগ্য কথা হল যে, এই নাজিফ খানই ছিলেন সেই ব্যক্তি যার মন্ত্রীত্বকালে (১৭৭৩-১৭৮২ খ্রিঃ)[১০৫] হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (রহ) কে বারংবার নির্বাসন দেয়া হয়, তার ওপর অমানসিক নির্যাতন চালানো হয়। এমন কি সর্বজন বরেণ্য বুযুর্গ হযরত মীর্জা মাযহার জানে জানানকে এই আমলেই শহীদ করা হয়েছিল।

টীকা

৭১. দিল্লী থেকে সোয়াশ দেড়শ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ডেগ, কামা, বিয়ানা প্রভৃতি অঞ্চল বর্তমান কালেও সুপ্রসিদ্ধ। এসব অঞ্চলের রাজধানী ছিল ভরতপুর। ১৯৪৭ সালে স্থানীয় স্বাধীন সরকার সমূহের বিলুপ্তির সময় ভরতপুর জেলা হেড কোয়ার্টারে পরিণত হয়। এ এলাকার সীমানা আগ্রা ও মথুরা পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল। আগ্রা থেকে ভরতপুর মাত্র চৌত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। কথিত আছে যে, হিন্দুদের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। এ অঞ্চলেই তার পূর্ব পুরুষের বসতি ছিল। ভরতপুর সম্পর্কে বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্যের নামে এতদঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মাতুলালয় ছিল কামা। এ সকল কারণে এ অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান ও ধর্মীয় পূণ্যভূমি হিসাবে গণ্য ছিল। মোঘল রাজত্বের উত্থান যুগে এসব এলাকা শাহী খান্দানের কোন সদস্যের হাতে জায়গীর হিসাবে থাকত। উত্থান যুগের প্রভাবশালী সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের ওপর এতদাঞ্চলের জায়গীর ন্যাস্ত ছিল। এ এলাকায় হিন্দু জাটদের সংখ্যা যদিও গরিষ্ঠ সংখ্যক ছিল না তবু প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তির দিক থেকে তারাই ছিলেন প্রবল। তবে তাদের বহু খান্দান ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। ইতিহাসে তাদেরকে মেওয়াতী বলা হয়। এই মেওয়াতী মুসলমানগণ যদিও ধর্মীয় দিক থেকে পৃথক ছিলেন কিন্তু ধর্মীয় পৃথক মত তাদের ঐতিহ্যপূর্ণ সামাজিকতা, স্থানীয়ভাবে বসবাস, লেনদেন, উঠাবসা, রাজনীতি, এমনকি যুদ্ধ বিগ্রহ ও সন্ধি স্থাপনের মধ্যেও তারা একদল অন্যদলের শরীক ও সাহায্যকারী ছিলেন। মোঘল রাজত্বের কেন্দ্রীয় শক্তি যখন দুর্বলগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্ব-স্ব প্রদেশে স্বাধীনভাবে শাসন কার্য পরিচালনা শরু করেন তখন ভরতপুরে জাটদের মধ্যে স্বাধীন সরকার গঠনের অভিলাষ দেখা দেয়। তাদের নেতা ছিলেন সরদার বদন সিং। ১৭২৩ সালে ডেগ নামক স্থানে তিনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষনা দেন এবং দিল্লীর অধীনতা বর্জন করে শাসনকার্য চালাতে থাকেন। বদন সিংহের রাজধানী ছল ভরতপুর। তার ২২ জন পুত্র সন্তানের মধ্যে 'সুরজমল' ছিলেন সর্বাপেক্ষা তেজস্বী, দূরদর্শিতা সম্পন্ন ও রাজনৈতিক কর্ম-কুশলতার অধিকারী। ফলে বদন সিং তাকেই যুবরাজ ঘোষণা দেন এবং রাজ্যের যাবতীয় কাজকর্ম তার ওপর ন্যাস্ত করেন। অতঃপর ১৭৫৬ সালে মোতাবেক ১১৭০ হিজরীতে বদন সিং তার তেত্রিশ বছর দু'মাস দশ দিন রাজত্বের পর মৃত্যুবরণ করলে 'সুরজমল' স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি জাটদের রাজা হিসাবেও স্বীকৃত ছিলেন। তার দুর্দান্ত সাহসিকতা তৎকালের রাজনৈতিক অঙ্গনে তাকে এতটুকু উচ্চাসন দান করেছিল যে, দেশের কোন একটি রাজনৈতিক শক্তি তাকে উপেক্ষা করার সাহস করত না।

আহমদ শাহ আবদালীর সাথে মোকাবেলা করার জন্য মারাঠারা তাকে নিজেদের পক্ষে নিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি পরম সচেতনতার সাথে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে কেবল দূরদর্শীতারই পরিচয় দেন নি, নিজের রাজত্বও অক্ষুন্ন রাখেন। এ সময় রাজা সুরজমল

মারাঠা যোদ্ধাদেরকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, আবদালীর সঙ্গে যুদ্ধে বড় ধরনের আয়োজন করা কিংবা রাজকীয় পদ্ধতিতে যুদ্ধ শিবির বা খিমা রচনা মারাঠাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না। বরং রাজকীয় এ সকল পদ্ধতির অবলম্বন নিজেদের জন্য শক্তিকারক হওয়ার আশংকাও বিদ্যমান। কেননা মারাঠারা সর্বদা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত। এই গেরিলা পদ্ধতিতে আবদালীকে পরাস্ত করা কঠিন হবে না। তাই মারাঠা দলের জন্য উচিত হবে তারা নিজেদের যাবতীয় আসবাবপত্র ভরতপুর দূর্গগুলোর মধ্যে সংরক্ষিত রেখে গেরিলা পদ্ধতিতে আবদালীর মোকাবেলা করা। মারাঠাদের কতিপয় সর্দারগণও এ মতের সমর্থন করেন। কিন্তু তাদের প্রধান সেনাধ্যক্ষ ও কমান্ডার ইন চীফ এ মতের সমর্থন করেননি। তিনি সুরজমলকে সামান্য একজন জমিদার ও যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ মনে করে তার মতামত অগ্রাহ্য করে দেন। ফলে সুরজমল ভাল সুযোগ পেয়ে যান এবং মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। সুরজমলের সর্বাপেক্ষা বড় ভুল ছিল এটি যে, তিনি সাধারণ একটি কথার ওপর নিজের দীর্ঘদিনের বন্ধু নাজীবুদ্দৌলাকে নিজের শত্রুতে পরিণত করেন। তারপর নাজীবুদ্দৌলার অসুস্থতাকালে দিল্লীর ওপর আক্রমণ করে বসেন। কিন্তু ফলাফল দাঁড়িয়েছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বিজয়ী দলেল হাতে 'সুরজমল' আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং শত্রুদের হাতে নিহত হন। সুরজমল আহত হয় মাটিতে পড়ার সময় তার ঘনিষ্ঠ সহচরদের যারা তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল তাদের মধ্যে একজন মুসলমান পীরজাদা শায়খ আহমদও ছিলেন। উক্ত পীরজাদা ছিলেন ফতেপুরের অধিবাসী ও সুরজমলের অন্যতম বিশ্বস্ত বন্ধু। সুরজমলের ওপর থেকে আক্রমন প্রতিহত করার মূহুর্তে তিনিও মারা যান। শেষ পর্যন্ত সুরজমলও নিহত হন। হিজরী ১১৭৭ সাল মোতাবেক ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সুরজমল মাত্র ৮ বছর ২ মাস ১৫দিন রাজত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। (তারীখে রাজস্থান, কর্ণেল টাড, ওয়াকায়িয়ে রাজস্থান-হাকীম নাজমুল গণী)।

৭২. নিযামুল মূলক-যিনি দক্ষিণ ভারতে নিজস্ব একটি রাজত্ব কায়েমের জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং পাশাপাশি দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারেও নিজের কর্তৃত্ব বহাল রাখতে ইচ্ছুক তিনি সর্ব প্রথম মারাঠাদেরকে দিল্লী আক্রমণের পথ বাতলিয়ে দেন। হিজরী ১১৪৯ মোতাবেক ১৮৩৩ সালে মারাঠারা দিল্লীতে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে। কয়েকদিন পর্যন্ত অবস্থান করে দিল্লীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক প্রত্যাবর্তন করে। মারাঠাদের এই অভিযান চালানোর সুফল কেবল এতটুকু হয়েছিল যে, প্রজা ও পরাজিত রাজাদের নিকট থেকে কর হিসাবে গৃহীত জমির ফসলের এক চতুর্থাংশ মূল্য আদায়ের অধিকার নিয়ে তাদের যে দাবী সম্রাট আলমগীরের আমল থেকে চলে আসছে এই চুক্তিতে তাদের সে অধিকারকে মেনে নেয়া হয়েছে। তবে নিয়ামুল মূলক অবশ্য বড় ধরনের স্বার্থ উদ্ধার করে নিয়েছেন। এ অভিযানে দক্ষিণ ভরতে তার নতুন রাজত্ব মারাঠাদের উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী উজিরদের ওপর তিনি প্রভাব বিস্তারের সুযোগ লাভ করেন। ঐতিহাসিক তাবতাবায়ী বলেন, সম্রাটের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির হোতা নিযামুল

মূলক। কিন্তু তার পক্ষে এটি মেনে নিয়ে নিযামুল মূলকের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন বিকল্প ছিল না। কাজেই মারাঠারা বিদায় নেয়ার পর ১১৫০/১৭৩৭ সালে সম্রাট নিযামুল মূলকের বরাবরে অতিশয় আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষায় ফরমান লিখে তাকে দিল্লীর রাজ দরবারে ডেকে পাঠান। সম্রাট তার মন-সন্তুষ্টির জন্য তাকে 'আসিফ জাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। হাশত হাজারীর পদমর্যাদা দান করেন এবং তাকে ওকালতে সুলতক তথা প্রশাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পন করেন। (সিয়ারুল মুতা আখখিরীন, প্রভৃতি) মোট কথা এ অভিযানের কারণে দিল্লীর সহিত মারাঠাদের নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হল। তবে অন্যদিকে নিযামূল মূলকের এ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে শীয়া মতাবলম্বী উজিরগণ নাদির শাহকে ভারতবর্ষ আক্রমণের আমন্ত্রন জানায়। ফলে ১১৫২/১৭৩৯ সালে নাদির শাহের প্রসিদ্ধ লুণ্ঠনাভিযান সুচিত হয়। নাদির শাহ দিল্লীর রাজ সিংহাসন সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে অর্পন করে গেলেও কাবুল, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কয়েকটি জেলা ইরান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে নেন। নাদির শাহের এই বিভাজন নতুন আরেকটি সমস্যার উদ্ভব করে। কেননা ইরান সম্রাট এতদঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন অন্যদিকে ভারতের নতুন উদীয়মান শক্তিগুলোও এতদাঞ্চলকে নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে নেয়ার জন্য সচেষ্ট ছিল। ফলতঃ এই বিবাদমান পরিস্থিতি পরবর্তীকালে আহমদ শাহ আবদালী কর্তৃক হামলা চালানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবদালীর আক্রমণ অভিযানের কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, কাবুল সিন্ধু ও পাঞ্জাবের এতদঞ্চলে মারাঠারা লুটতরাজ চালিয়েছে অথচ এসব এলাকা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত।

৭৩. কপুরথলার শিখ সর্দার জসসিং ১৭৪৩ সালের এক আক্রমণ অভিযান চালিয়ে লাহোরের সুবাদার যাকারিয়্যা খানকে হত্যা করে। তখন থেকে দুপক্ষের সংঘর্ষের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। পরে ১৭৬৬ সালে জসাসিং দিল্লী অবরোধ করলে এ সংবাদ আহমদ শাহ আবদালীর কানে পৌঁছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র আবদালী দিল্লীর দিকে যাত্রা করলে জসসিং অবরোধ তুলে নেয় এবং পার্বত্য অঞ্চলের দিকে পলায়ন করে। সে মূহুর্তে যদিও জসসিং দিল্লীর ওপর কোন হামলা চালাতে ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু পালিয়ে গিয়ে পাঞ্জাব অঞ্চলে নানা রকম লুণ্ঠন তৎপরতা অব্যাহত রাখে। অবশেষে ১৭৮৩ সালে সর্দার জসসিং মারা যান। (তারীখে কপুরথলা, লেপল গ্রীকস–আন্ডার সেক্রেটারী পাঞ্জাব গভঃমেন্ট, ১৮৭০ খ্রিঃ)।

৭৪. আহমদ শাহ আবদালী তিনি আহমদ শাহ দুররাণী নামেও পরিচিত। প্রথমে তিনি একজন আফগানী সিপাহী ছিলেন। নাদির শাহের সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী করতেন। কিন্তু নিজ যোগ্যতার দ্বারা তিনি সামান্য সিপাহীর পদ থেকে সামরিক কর্মকর্তা তথা সেনাপতির পদে উন্নতি লাভ করেন এবং নাদির শাহের একান্ত বিশ্বস্ততা অর্জনে সক্ষম হন। ১১৬০/১৭৪৭ সালে নাদির শাহ নিজের জনৈক কর্মচারীর হাতে নিহত হলে আহমদ শাহ পারস্যের পূর্বাংশের আধিপত্য গ্রহণ করেন। তৎকালে সুবা পাঞ্জাবে গোলযোগ চলছিল বিধায় রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করার অনতিবিলম্বেই তাকে ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করতে হয়। এভাবেই আবদালী কর্তৃক ভারত আক্রমণের প্রথম সূচনা হয়েছিল। হিজরী ১১৭০

সালে রঘুনাথরাও, শমশের বাহাদুর, বালাজী ভ্রাতৃদ্বয় ও হোলকার প্রমুখের নেতৃত্বে পাঞ্জাব আক্রমণ হয়। এ আক্রমণে সম্মিলিত মারাঠা বাহিনী লাহোর নিজেদের দখলে নিয়ে গেলে লাহোরের শাসনকর্তা যুবরাজ তৈমুর শাহ কাবুলের দিকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। (সিয়ারুল মুতা আখখিরীন) মারাঠাদের এ আক্রমণের প্রতিবাদে আবদালী উপর্যুপরি ছয় বার ভারতের ওপর আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করেন। ষষ্ট বারের চুড়ান্ত আক্রমণ পানিপথ রণক্ষেত্রে সূচিত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ যুদ্ধ অন্যতম প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হিসাবে পরিচিত।

৭৫. সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত দিল্লীর রাজ দরবারে সৈয়দ পরিবারের সদস্যদের অপরিসীম আধিপত্য কায়েম থাকে। তাদের দৌরাত্ম তখন এতখানি বেড়ে গিয়েছিল যে, লোকেরা সৈয়দ হাসান আলী খান ও সৈয়দ আবদুল্লাহ খান ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্রাট বানানোর কারিগর নামে অভিহিত করতে শুরু করে। মোঘল সাম্রাজ্যের সিংহাসন ও রাজমুকুট ছিল তাদেরই হাতের মুঠরে। তারা যাকে ইচ্ছা সিংহাসন চ্যুত করে অন্যকে সেখানে আরোহণ করাতেন। শেষ পর্যন্ত দিল্লীর সম্রাট তাদের প্রভূত্বে অতীষ্ট হয়ে নিযামূল মূলক প্রথম আসিফ জাহ সহ তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভূত্ব নির্মূল করে দেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন ঘটানোর কাজে মীর মুহাম্মদ আমীন বুরহানুল মুলক নওয়াব সাদাত আলী খান এ নিযামূল মূলক সম্রাটকে সাহায্য করে ছিলেন। সে সুবাদে বুরহানুল মূলক অযোধ্যায় নিজের কর্তৃত্ব স্থাপনপূর্বক সম্রাটকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখতে চেষ্টা করেন। আর অন্যদিকে নিযামূল মূলক নিজের সুবিধা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হওয়া পছন্দ করলেন না। ফলে বুরহানুল মুলকের কর্তৃত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে দেখে নিযামূল মূলক মারাঠাদেরকে ডেকে এনে দিল্লী লুণ্ঠন করান। এরপর থেকে মন্ত্রীত্বের পদ যদিও বুরহানুল মূলকের হাতে থাকে তবে মন্ত্রীত্বের চেয়েও উচ্চতর পদ 'ওকালতে মুতলকা' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের পদ নিযামূল মূলকের ওপর অর্পিত হয়। নিযামূল মূলকের এই প্রতিশোধমূলক উদ্যোগের জবাব দেওয়ার জন্য বুরহানুল মূলকের হাতে ভারতীয়দের মাধ্যমে চালানো যায় এমন কোন চাল কিংবা গুটি ছিল না। অবশেষে তিনি ইরানী রক্ত-পিপাসু নাদির শাহকে দিল্লীর ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য আহবান করেন। এভাবে নাদির শাহ আক্রমণের জন্য দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেও নিযামূল মুলক তার গুটি চালনায় অপরাভূত রয়ে গেলেন। অর্থাৎ তিনি নাদির শাহের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসেন এবং তাকে নগদ দুই কোটি টাকা প্রদানের ওপর পত্যাবর্তনের জন্য সম্মত করতে সক্ষম হন। নিযামূল মুলকের কর্তব্য সম্পদানে সন্তুস্ট হয়ে মোঘল দরবার থেকে তাকে আমীরুল উমারার পদ প্রদান করা হয়। বুরহানুল মুলক বিরক্ত মনে সব সহ্য করেন এবং নিজের আখেরী প্রতিশোধ উদ্যোগের অপেক্ষা করতে থাকেন। এভাবে তিনি নাদির শাহকে দিল্লী নগরীর ওপর আক্রমণ চালানো এবং নগর লুণ্ঠনের জন্য গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে দিল্লীর প্রসিদ্ধ লুণ্ঠনাভিযান কার্যকরী হয়েছিল, যার ফলে নগরের সকল বাড়িঘর লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয় এবং লক্ষাধিক নর-নারী প্রাণ হরায়। আজ পর্যন্ত নাদির

শাহের সেই লুণ্ঠনাভিযান দিল্লীর ছোট বড় সকলের মুখে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। বুরহানুল মুলক টের করতেও পারেনি যে, তিনি নাদির শাহের জন্য (নগদ পনর কোটি টাকা, পঞ্চাশ কোটি টাকার মনিমুক্তা ও অলংকার এবং শাহজাহানের ভূবন বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন লাভেন) ব্যবস্থা করে দিয়ে তার কাছ থেকে কোন বিনিময় লাভ করার পূর্বেই মৃত্যুর ফেরেশতা সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তার ক্যানসারের যন্ত্রণা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে তিনি দুনিয়া থেকে চির বিদায়ের জন্য বাধ্য হন।

একালে তৃতীয় অপর একটি শক্তি দিল্লীর অদূরে উত্তর-পূর্ব দিকে জন্ম নিতে থাকে। এটি ছিল রোহিলা পাঠানদের শক্তি। এ শক্তিটি আলী মুহাম্মদ খান ও তার ঘনিষ্ঠ সহচর ও পরবর্তী উত্তরাধিকারী হাফেয রহমত খানের নেতৃত্বে ক্রামন্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটি এমন একটি সুবিন্যাস্ত সরকার গঠনেও সক্ষম হয়েছিল যে এ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য লর্ড হেস্টিংসকে বড় ধরনের বিশ্বাস ঘাতকতার অবলম্বন করতে হয়। এই রোহিলা দলেরই একটি অংশ ছিল বাঙ্গাশ সম্প্রদায়ের লোকেরা। তাদের নেতা ছিলেন নওয়াব মুহাম্মদ খান বাঙ্গাশ। নাজীব খান ছিলেন এ শক্তির অন্যতম সদস্য। দিল্লীর রাজ দরবারের সঙ্গেও ছিল তার ঘনিষ্ঠতা। এই ঘনিষ্ঠতাই তাকে দিল্লীর রাজ দরবার থেকে নাজীবুদ্দৌলার উপাধি লাভের পথ সুগম করে দিয়ে ছিল। উদীয়মান রোহিলাদের এ শক্তিটি ভৌগলিকভাবে বুরহানুল মুলকের উত্তরাধিকারী সফদর জঙ্গ ও শুজাউদ্দৌলার জন্য আশংকার পাত্র ছিল। ফলে তাদের মধ্যে পুনরায় নতুনভাবে অর্ন্তদ্বন্দ্বের সূচনা হয় যা পরবর্তীকালে নাদির শাহের ন্যায় আহমদ শাহ আবদালীকে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করার পথ সহজ করে দেয়।

৭৬. ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, হিজরী ১১৫০ মোতাবেক ১৭৩৭ সালে নিযামূল মুলক ১ম আসিফ জাহ وكالت مطلقه নিরংকুশ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিনিধি) এর পদ অর্জন করে নেন। তিনি এ পদ লাভ করার পর কিছুকাল পর্যন্ত দিল্লীতে অবস্থানরত থাকেন তারপর হায়দ্রাবাদ চলে যান। এদিকে নিজের জ্যৈষ্ঠপুত্র গাযিউদ্দীন খানকে দিল্লীতে নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে যান। নিযামূল মুলক ও গাযীউদ্দীন উভয়ের শক্তির প্রকৃত অবলম্বন ছিল মারাঠা শক্তি। সম্রাটের ওপর গাযীউদ্দীন খানের প্রভূত্ব বিস্তারিত হলে তিনি মারাঠাদেরকে বুরহানুল মুলকের উত্তরাধিকারীদের (অযোধ্যার নওয়াবগণ) বরুিদ্ধে লেলিয়ে দেন। অন্যদিকে নাজীবুদ্দৌলাকে পদানত করার জন্যও তিনি এ পেশী শক্তিকে কাজে লাগান। কিন্তু সম্রাট নিজে ব্যক্তিগতভাবে নাজীবুদ্দৌলার হিতাকাংখী ছিলেন। ঘটনাক্রমে মারাঠারা অযোধ্যার নওয়াবদের (মুজাউদ্দৌলা) হাতে পরাজিত হয়। তারপর এই মারাঠারা রোহিলাদের ওপর আক্রমণ চালালে হাফিয রহমত খান, নাজীবুদ্দৌলা ও আহমদ খান বাংকিশ সম্মিলিতভাবে এবং শুজাউদ্দৌলার পক্ষ থেকে সামরিক সাহায্য লাভ করে মারাঠাদেরকে পরাজিত করে দেয়। গাযিউদ্দীন খানের উপরোক্ত কূটনীতি ফলদায়ক হতে পারল না। উপরন্তু তার মনে নিজের ব্যাপারেও আশংকা দেখা দের। কারণ তিনি ভাবছিলেন, ত্রিশক্তির (নাজীবুদ্দৌলা, শুজাউদ্দৌলা ও রোহিলা শক্তি) ঐক্য যেভাবে

মারাঠাদের প্রচন্ড শক্তিকে পরাজিত করে দিয়েছে সেই ঐক্য দ্বারা হয়ত তারা দিল্লীকেও দখল করে সম্রাটকে নিজেদের করায়ত্বে নিয়ে যেতে পারে। আর তখন গাযীউদ্দীন খানের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। তাই তিনি নিজের নিষ্কৃতির জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি এটাই ভাবলেন যে, সকলের সকল আকাঙখার মধ্যমণি (সম্রাট)কেই গোড়া থেকে উৎপাটিত করে দেওয়া হোক। এ সূত্রেই তিনি সম্রাটকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আর এ ষড়যন্ত্রে তিনি জয়লাভও করেন। গাযীউদ্দীন খানের এহেন বাড়াবাড়ী ও হস্তক্ষেপের কারণে নাজীবুদ্দৌলা ও অন্যরা আহমদ শাহ আবদালীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। শিয়ারুল মুতাআখরিরীন গ্রন্থে বলা হয়েছে।

نجیب الدوله وجمیع افاعنه (دوٗسله) ورجهٗائے هندوستا از دست مرهٹ وعماد الملك (غازی الدین) بحال آمده عرائض کخدمت شاه ابدالی نگاشته ودورار استدعاء درهندوستاں کردند

অর্থাৎ নাজীবুদ্দৌলা আফগান খান বৃন্ধ ও হিন্দুস্থানের অন্যান্য রাজন্য বর্গ মারাঠা ও ইমাদুল মুলকের (গাযীউদ্দীন খান) অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে নিষ্কৃতির জন্য আহমদ শাহ আবদালীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এ স্থানে মনে রাখতে হবে যে, আহমদ শাহ আবদালীকে আমন্ত্রনকারীদের মধ্যে কেবল মুসলমানরাই ছিল তা নয়, অনেক হিন্দু রাজারাও তাতে শরীক ছিল। অনুরূপভাবে আবদালীর সাথে মোকাবেলা কেবল মারাঠারাই করে নি বরং গাযীউদ্দীন খানও করেছিলেন। কাজেই এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুদ্ধকে যেমন হিন্দু-মুসলিমের যুদ্ধ বলা যায় না তদ্রুপ এটি শীয়া-সুন্নী যুদ্ধও নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এটি ছিল দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের মধ্যকার পারস্পরিক লড়াই। (মুহাম্মদ মিয়া)

৭৭. ইতিপূর্বের টীকায় এ কথা আলোচিত হয়েছে যে, বুরহানুল মুলক প্রমুখকে পদানত করার লক্ষ্যে এবং সম্রাটের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিযামুল মুলক ১ম আসিফ জাহ মারাঠাদের দিল্লীর দিকে অগ্রসর করান। তারপর এ চাপের মুখে তিনি সম্রাট থেকে নিজের জন্য وكالت مطلقه (নিরংকুশ ক্ষমতার) পদ অর্জন করে নেন।

৭৮. নিযামুল মুলক ১ম আসিফ জাহ-এর আসল নাম ফখরুদ্দীন খান পিতার নাম মীর শিহাবুদ্দীন খান ও দাদার নাম আবিদ খান। ফখরুদ্দীন খান দীর্ঘকাল যাবৎ চীন কুলাইজ খান বাহাদুর নামে পরিচিত ছিলেন। তারপর ফতহে জঙ্গ, নিযামুল মুলক ও আসিফ জাহ ইত্যাকার রাজকীয় খেতাবেও ভূষিত হন। তার দাদা ছিলেন সমরকন্দের (তাতার) বাসিন্দা। তিনি সমরকন্দ থেকে তিন ক্রোশ দূরে আলীয়াবাদ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা দীক্ষা অর্জনের পর নিজ প্রতিভা বলে এমন উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন যাকে যুগের শায়খুল ইসলাম বলা যায়। এই আবিদ খান সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে দিল্লী আসেন। সম্রাটের কাছ থেকে উচ্চ মর্যাদা ও জায়গীর অর্জন করেন। তারপর সম্রাট আলমগীরের নৈকট্য ও আস্থা অর্জন পূর্বক মাহুলী দুর্গের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হন।

গোলকুন্ডা দুর্গের বিরুদ্ধে যেকালে সম্রাট আলমগীর অভিযান পরিচালনা করছিলেন তখন আবিদ খান কামানের গোলার আঘাতে আহত হন। ২৪শে রবিউল আউয়াল হিজরী ১০৯৮ মোতাবেক ১৬৮৬ সালে ইন্তেকাল করেন। তার চারিত্রিক ধৈর্য, সহ্য ও দৃঢ়তার কিছু অনুমান এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, আহত হওয়ার পর জুমালায়ে মুলক আসাদ খান তার শারিরীক অবস্থার কথা জানার জন্য যখন তার কাছে যান সে মূহুর্তে চিকিৎসক আবিদ খানের কাধের ভিতর থেকে ভেঙ্গে পড়া হাড্ডির টুকর গুলো বের করে আনছিলেন। অথচ আবিদ খান তখন চৌজানু হয়ে বসে কথাবার্তা বলছেন, আর অন্য হাতে কফি পান করছেন এবং খুব প্রফুল্ল চেহারায় বলছিলেন চিকিৎসক খুব দক্ষ কারিগর। কিন্তু এ যখম থেকে তিনি মুক্তি লাভ করতে পারেন নি।
নিযামুল মুলক আসিফ জাহের পিতা মীর শিহাবুদ্দীনও একজন বীরত্ব সম্পন্ন লোক ছিলেন। যেকালে আবিদ খান ভারতবর্ষে এসে রাজকীয় উচ্চপদ লাভ করেন সেকালে তিনি নিজ সন্তানকেও দিল্লীতে ডেকে আনেন। সেমতে পুত্র শিহাব উদ্দীন হিজরী ১০৭৯ মোতাবেক ১৬৬৮ সালে ভারতে পৌঁছে সরকারি চাকুরী গ্রহণ করেন। তারপর ধীরে ধীরে উন্নতি করে উচ্চপদ পর্যন্ত পৌঁছে যান। ১১০০ হিজরীতে একবার মারাত্মক মহামারী দেখা দিলে আক্রান্ত হন এবং অন্ধ হয়ে যান। জীবনের শেষ মূহুর্তে পৌঁছেও সেই অন্ধত্ব আর দূর করা যায় নি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাজকীয় উচ্চ পদের দায়িত্ব পালন এমন কি রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনার কাজও তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন। পরিশেষে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৭ই শাওয়াল ১১২২ হিজরীতে আহমদাবাদ শহরে ইন্তেকাল করেন। তিনি তার জীবদ্দশায় দিল্লীতে আজমেরী গেইটের বহির্ভাগে একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন। মাদরাসার সঙ্গে একটি গোরস্থানও বানানো হয়। ইন্তেকালের পর তার শবদেহ আহমদাবাদ থেকে দিল্লী আনা হয় এবং এই গোরস্থানে দাফন করা হয়। এরই সন্নিকটে কোন এক স্থানে শাহ্ অজীহুদ্দীন সাহেবেরও মাযার ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সেই মাদরাসাটি বর্তমানে দিল্লী কলেজ নামে পরিচিত। মীর শিহাবুদ্দীন সম্রাট শাহজাহানের প্রসিদ্ধ উজীর সাদুল্লাহ খানের কন্যাকে বিবাহ করেন। নিযামুল মুলক আসিফ জাহ সেই ঘরেরই সন্তান। তিনি ৭৯ বছর জীবন যাপন করার পর ৪ঠা জুমাদাল উখরা হিজরী ১১৬৬ সালে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পর তাকে مغفرت مآب খেতাবে ভূষিত করা হয়। তার মৃত্যু তারিখ নির্দেশকারী স্মরণীয় বাক্য হল خلد منزلت।

৭৯. নওয়াবানে উধ (অযোধ্যার নবাবগণ) যারা পরবর্তীকালে শাহানে উধ নামে পরিচিত হন। তাদের বংশের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন বুরহানুল মুলক নওয়াব সাদাত খান যার আসল নাম ছিল মুহাম্মদ আমীন। তিনি নিশাপুরে জন্ম লাভ করেন। আলমগীরের পুত্র সম্রাট শাহ আলম ১ম বাহাদুর শাহ-এর শাসনামলে দিল্লী আসেন এবং সরকারি উচ্চপদে চাকুরী গ্রহণ করেন। তারপর সম্রাট মুহাম্মদ শাহের আমলে নওয়াব হোসাইন আলী খানের হত্যা কাজে তিনি সম্রাটের সাহায্য করেন। অতঃপর নিহত হোসাইন আলী খানের ভাই কুতবুল মুলক আবদুল্লাহ খানের সহিত মোকাবেলা ও যুদ্ধে পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত কর্ম-সম্পাদন পূর্বক বিজয়

অর্জন করেন। এ সকল ক্ষেত্রে সম্রাটের উপকার করার সুবাদে প্রথমতঃ তাকে আকবরাবাদ সুবার প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। তারপর অযোধ্যা সুবার দায়িত্বভারও তার ওপর অর্পিত হয়। ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসক হওয়ার পথ লাভ করেন। নাদির শাহের আগমন তারই আমন্ত্রনে হয়েছিল তারই পরামর্শে দিল্লীর ওপর লুণ্ঠন তৎপতরা চলে। আর একালেই তিনি ৯ই যিলহজ্জ ১১৫১ হিজরী মোতাবেক ১৭৩৮ সালে মারা যান। কথিত আছে যে, বুরহানুল মুলক যখন অযোধ্যার সুবাদারী লাভ করে তা হস্তগত করার জন্য যাচ্ছিলেন তখন ফররুখাবাদ থেকে তার নৌকা গঙ্গা নদী অতিক্রম করার সময় গঙ্গার স্রোতে একটি মাছ লাফিয়ে তার কোলে এসে পড়ে। নওয়াব এ ঘটনাটিকে নিজের জন্য শুভ লক্ষণ জ্ঞান করেন। তাই এই মাছটি তিনি সংরক্ষণ করেন। মাছটির কাটাগুলো নওয়াব ওয়াজিদ আলী খানের আমল পর্যন্ত রাজকীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত ছিল। সম্ভবত এ শুভ লক্ষণের ধারণা থেকেই কায়সার বাগ প্রভৃতির ফটোর মধ্যে আজো বিদ্যমান। অযোধ্যা সরকারের চালু কৃত মুদ্রা ও সরকারি দলিল দস্তাবেজ ও কাগজপত্রে ঐ মাছটিরই চিত্র দেখা যায়। বুরহানুল মুলকের মৃত্যুর পর তার চার কন্যা উত্তরাধিকারী হয়। সবচেয়ে বড় কন্যা বিবাহ করেছিলেন তারই ভ্রাতুষ্পুত্র মির্জা মুহাম্মদ মুকীম। পরবর্তীকালে তিনি বুরহানুল মুলকের স্থলাভিষিক্ত হন এবং দিল্লী কেন্দ্র থেকে সফদর জঙ্গ ও উজীরের পদ লাভ করেন। ১৭ই যিলহজ্জ ১১৬৭ হিজরী মোতাবেক ১৭৫৩ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র শুজাউদ্দৌলা পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

৮০. অর্থাৎ নাজীবুদ্দৌলা ও হাফিয রহমত খান, আহমদ খান বাঙ্গিশ ও দুন্দে খান প্রমুখ।

৮১. এ কথা অনস্বীকার্য যে, আহমদ শাহ্ আবদালীর এ হামলা চালানোর আসল কারণ ছিল যে, মারাঠারা পাঞ্জাব অঞ্চলে আবদালীর নিয়োগকৃত গভর্ণরকে তার শিখ বাহিনীসহ পরাজিত করে ছিল এবং ১৭৫৭ সালে আটক নদীর তীর পর্যন্ত সমগ্র পাঞ্জাব নিজেদের করায়ত্বে নিয়ে এসেছিল। আবদালীর নিযুক্ত গভর্ণর ছিলেন তারই পুত্র তৈমুর শাহ। আবদালী তার পুত্রের সাহায্যের জন্য জনৈক পাঠান অভিজ্ঞ সরদার জাহান খানকে নিযুক্ত করে ছিলেন কিন্তু তাতে কোন সুফল হয়নি। এ কারণেই পরে আবদালী নিজে অভিযান করার মনস্ত করেন। এখন কথা হল মারাঠারা পাঞ্জাব আক্রমন করতে গেল কেন? সে বিষয়ে গাযীউদ্দীন খানের প্ররোচনা ছাড়াও আরও একটি কারণ ছিল যে, আদিনা বেগ যাকে জাহান খান দোযাবার শাসন কার্য থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। তিনি বরখাস্ত হওয়ার পর জাহান খানের সহিত মোকাবেলায় অবতীর্ণ হন। আর তখন তিনি এই মারাঠাদের কাছে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিলেন।

৮২. প্রকৃত নাম ছিল মীর মুহাম্মদ পানাহ। উপাধি ছিল ফীরোজ জঙ্গ গাযীউদ্দীন খান ইত্যাদি অর্থাৎ দাদার অর্জিত সকল খেতাব তিনিও অর্জন করেন। এই মীর মুহাম্মদ পানাহ গাযীউদ্দীন খান ১১২১ হিজরী মোতাবেক ১৭০৯ সালে অর্থাৎ নিযামুল মুলক ১ম আসিফ জাহের মৃত্যুকালে তিনি দিল্লীর আমীরুল উমারা পদে অদিষ্ঠিত থাকেন। নিযামুল মুলকের

মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় পুত্র মীর আহমদ খান নাসির জঙ্গ পিতার মসনদ লাভ করেন। অতঃপর ১৬ই মুহাররম ১১৬৪ হিজরী মোতাবেক ১৭৫০ সালে নাসির জঙ্গ এক যুদ্ধে নিহত হলে নিযামুল মুলকের অসীয়ত অনুসারে তারই দৌহিত্র সাদুল্লাহ খান মুযাফফর জঙ্গ মসনদে আরোহন করেন। ইনি ফরাসীদের ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন। কিন্তু মসনদে আরোহনের মাত্র দু'মাস পরেই ১৭ই রবিউল আউয়াল ১১৬৪ হিজরী মোতাবেক জানুয়ারি ১৭৫১ সালে তাকেও হত্যা করা হয়। এ সময় নিযামুল মুলক আসিফ জাহের তৃতীয় পুত্র মীর মোহাম্মদ খান মসনদে বসেন। মসনদে আরোহনের সময় তিনি আসিফুদ্দৌলা সালাবতে জঙ্গ ইত্যাদি উপাধি ধারন করেন। কিন্তু তৃতীয় ভ্রাতার মসনদে আরোহন লক্ষ্য করে গাযী উদ্দীন খানের অন্তরেও উচ্চাভিলাষের উদ্রেক ঘটে। ততদিনে তিনি আবদালীর সহিত যুদ্ধ ও মারাঠাদের পরাজয় ইত্যাদির পর আমীরুল উমারা পদ ভোগের স্বাদও গ্রহণ করে শেষ করে ফেলেন। কাজেই সম্রাটের কাছ থেকে দক্ষিণ ভারতের সুবাদারীর সনদ অর্জনপূর্বক তিনি মারাঠাদের ছত্র ছায়ায় পিতার রাজ্য অধিকার করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতের দিকে যাত্রা করেন। আসীর দুর্গ বুরহানপুর ও আওরঙ্গাবাদ প্রভৃতি তিনি জয় করেও নিয়ে ছিলেন। কিন্তু তখনও চুড়ান্ত লড়াইয়ের সুযোগ হয়ে উঠেনি। ইত্যবসরে তিনি নিজেই ৭ই যিলহজ্জ ১১৬৫ হিজরী মোতাবেক অক্টোবর ১৭৫৪ সালে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, সায়্যিদ মুহাম্মদ খান আসিফুদ্দৌলা সলাবত জঙ্গকেও কুরদতের হাত থেকে কোন অবকাশ দেয়নি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আক্রমণ থেকে তিনি রক্ষা পেয়ে গেছেন বটে তবে সেই মূহুর্তেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর নিযাম আলী খান গোপন এক ষড়যন্ত্র করে তাকে পদচ্যুত করে দেন এবং বেদর দুর্গে নজর বন্দীউ করে ফেলেন। তার অবশিষ্ট জীবন এ দূর্গে নজরবন্দী অবস্থার মধ্যেই অতিবাহিত হয়। অবশেষে ২০শে রবিউল আউয়াল ১১৭৭ হিজরী মোতাবেক সেপ্টেম্বর ১৭৬৩ সালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তারপর থেকে নিযামুল মুলক এ রাজত্ব এত নিষ্কন্টকভাবে পেয়ে যান যে, দীর্ঘ ৪২ বছর পর্যন্ত একটানা রাজত্ব চালিয়ে যান। এই চার দশকের দীর্ঘকালে সুলতান টিপু, ফরাসী ও ইংবেজদের বহু যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে গিয়েছে, বিভন্ন সময়ে রাজনৈতিক নীতি প্রকৃতিও বহুবার বহু রঙ্গ ধারণ করেছে, কিন্তু তিনি মসনদ থেকে মৃত্যুর পরেই পৃথক হন। দীর্ঘ ৪২ বছর রাজত্বের পর সাড়ে সত্তর বছরে ১৭ই রবিউস সানী ১২১৭ হিজরী মোতাবেক ৭ই আগষ্ট ১৮০৩ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর দ্বারা নিযামুল মুলক ১ম আসিফ জাহের সন্তানদের ধারাবাহিকতা নিঃশেষ হয়ে যায়।

৮৩. পানিপথের যুদ্ধ ঘটেছিল ৬ই জুমাদাল উখরা হিজরী ১১৭৪ সালে। (তারীখে হিন্দুস্তান খ.৯) ১৪ই জানুয়ারি ১৭৬১ সাল রোজ শনিবার।

৮৪. পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে রোহিলাদের শক্তি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ভাগগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ (এক) হাফিয রহমত খান ও তার সাথী দুন্দে খান প্রমুখ। এদের রাজধানী ছিল আনুলা যা বর্তমানে বেরেলী জেলার একটি গ্রামে পরিণত হয়ে আছে। এ রাজধানীর অধীনে বিশিষ্ট স্থান সমূহ ছিল বেরেলী বাদায়ুন, পিলীভেত, শাহজাহানপুর

প্রভৃতি। (দুই) নাজীবুদ্দৌলাহ, তার রাজধানী ছিল নাজীরাবাদ। এখানে বিশিষ্ট স্থান সমূহের মধ্যে ছিল সাহারানপুর ইত্যাদি। (তিন) আহমদ খান বাংগিশ, তার রাজধানী ছিল ফররুখাবাদ। তবে বিশিষ্ট স্থান সমূহের মধ্যে ছিল আইটা, কাসগঞ্জ প্রভৃতি।

৮৫. তারীখে হিন্দুস্তান, খ. ৯, পৃঃ ২৯৮।

৮৬. তিনি শাহজাদাকে জেলখানায় আবদ্ধ করিয়ে তাকে মেরেও ফেলত। কারণ দুই শাহজাদা অর্থাৎ আলী গাওহার এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ব থেকেই তার কাছে উপস্থিত ছিল। তিনি এ দু'জনের কোন একজনকে পরবর্তী সম্রাট ঘোষণা করিয়ে নিজের কৃতিত্বও জাহির করতে পারত।

৮৭. শাহজাদার সাহায্যকারী সঙ্গীদের মধ্যে একজন রাজা রামনাথ, দ্বিতীয় জন জাফর তৃতীয় জন সায়্যিদ আলী আজম খান। সায়্যিদ আলী আজম খান শাহাদাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে তাকে রক্ষা করেন অথচ নিজে শহীদ হয়ে যান।

৮৮. তারিখে হিন্দুস্তান, শামসুল উলামা যাকাউল্লাহ্ খান।

৮৯. কোন সন্দেহ নেই যে, সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের পর রাজ সিংহাসনে কাউকে বসানো কিংবা সরানোর সকল কৃতিত্ব নিযামুল মুলক আসিফ জাহ্ ও তার সন্তান তথা নাযিব গাযীউদ্দীন খান পালন করেন। সেমতে মাত্র কয় বছর পূর্বে (১০ই শাবান ১১৬৭ হিজরী মোতাবেক জুলাই ১৭৫৪ সালে) সম্রাট আহমদ. শাহকে পদচ্যুত করে মুইজুদ্দীন জাহাঙ্গীরের পুত্র আয়াজ্জুদ্দীনকে মসনদে বসিয়ে ২য় আলমগীর উপাধিতে ঘোষণা করা হয়। তারপর এক মাস যেতে না যেতেই নতুন সম্রাটও তার মাতাকে চোখ উপড়িয়ে অন্ধ করে দেয়া হলে তারা জগতের অদ্ভূত কান্ডকারখানা নিজের চোখে দেখে যাওয়ার সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়।

৯০. 'হায়াতে হাফিয রহমত খান' গ্রন্থের লেখক সায়্যিদ আলতাফ আলী বি. এ আলীগড়-এ মর্মঅন্তিক ঘটনা নকল করে বলেন গাযীউদ্দীন খানের মনে আশংকার সৃষ্টি হল যে, আহমদ শাহ দুররানী দিল্লী আগমন করলে সম্রাট ২য় আলমগীর হয়ত তার কাছে আমার সকল অপকর্মের কথা ফাঁস করে দিবেন। তখন নাজীবুদ্দৌলার জন্য পুনরায় উত্থানের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এ কারণে তিনি খানে খানান ইনতিযামুদ্দৌলা ও সম্রাটকে গোপন ভাবে হত্যা করার মনস্থ করেন। একালে ২য় আলমগীর রাজকীয় কাজকর্ম থেকে নিজেকে পৃথক করে নিরীহ ও নির্জন ও একাকী থাকতে ভালবাসতেন। ফকীর দরবেশদের ওপর তার গভীর আস্থা ছিল। একদিন গাযীউদ্দীন খানের সাথে ষড়যন্ত্রের কাজে লিপ্ত মাহদী আলী খান সম্রাটকে বলল ফিরোয শাহ মহল্লায় একজন কাশফ কারামত সমৃদ্ধ উচ্চমানের বযুর্গ আগমন করেছেন। অনেকেই তার সাক্ষাৎ করে ধন্য হচ্ছে। তারপর সম্রাটের সামনে কথিত সেই বুযর্গের অনেক কাশফ কারামতের ঘটনা শোনাল। (আসলে সবই মিথ্যা বরং এটি ছিল তার ষড়যন্ত্র) সরলমনা সম্রাট তার দুরভিসন্ধি থেকে অনবহিত ছিল। তার কথায় বিশ্বাস করে নিজে একাকী সেই উচ্চমানের বুযর্গের সহিত সাক্ষাতের জন্য বাইরে গেলেন। প্রথম গেইট অতিক্রম করার পরই মাহদী আলী খান সম্রাটের হাত থেকে তরবারি ছিনিয়ে

নেয়। তারপর পর্দা সরিয়ে দিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল। এদকে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল। সম্রাটের জামাতা মির্জা বাবর সাথে ছিলেন। পরিস্থিতি বুঝে তিনি তরবারি হাতে নেন এবং এক ব্যক্তিকে আঘাত করেন। কিন্তু তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে ফেলার দরুন পরাজিত হতে বাধ্য হন। পরিশেষে সম্রাটকে একটি আবদ্ধ পালকির মধ্যে ঢুকিয়ে সালিম দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সম্রাট দুর্গের ভিতর প্রবেশ করে দেখলেন মৃত্যুর ফেরেশতা প্রস্তুত হয়ে আছেন। চারজন উযবেকী সৈন্য খোলা তরবারী নিয়ে সম্রাটের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। মূহুর্তেই দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করে ফেলা হয়। তারপর মস্তক বিহীন শরীরটি যমুনা নদীর বালুর ওপর ফেলে দেয়। পাষন্ডরা সম্রাটের মৃত দেহ থেকে সতর খুলে বিবস্ত্র অবস্থায় ফেলে রাখে। কয়েকদিন পর সম্রাটের এ লাশ হুমায়ুনের কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়।

৯১. গাযীউদ্দীন খান যদিও মুসলমান ছিলেন কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রঈসের নাযির ও প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মরাঠাদের সাথে শরীক ছিলেন।

৯২. মুহাম্মদ কুলি খান ও শুজাউদ্দৌলা একজন অন্য জনের আত্মীয় এবং ভ্রাতৃতের সম্পর্কিত ছিলেন। কারণ শুজাউদ্দৌলার পিতা মির্যা মুহাম্মদ মুকীম (যিনি পরবর্তীকালে সফদর জঙ্গ উপাধি পেয়েছেন) এবং মুহাম্মদ কুলি খানের পিতা মির্যা মুহাম্মদ মহসিন উভয়ের মামা ছিলেন বুরহানুল মুলক মীর মুহাম্মদ আমীন। যেহেতু উভয়ের মাতা তাদের শৈশব কালে মারা গিয়েছেন উভয়ের লালন পালনের ভার অর্পিত হয় মামার ওপর। পরবর্তীকালে বুরহানুল মুলক তার এক কন্যাকে মির্জা মুহাম্মদ মুকীমের সহিত বিবাহ দেন। এ সূত্রে তিনি বুরহানুল মুলকের জামাতাও ছিলেন। (কায়সারুত তাওয়ারীখ, খঃ ১)।

৯৩. এমনও কথিত পাওয়া যায় যে, শুজাউদ্দৌলাও তাকে উঃৎসাহিত করে ছিলেন। তিনি মুহাম্মদ কুলি খান এলাহাবাদ থাকুক এ কামনা করতেন না। কারণ ছিল যে, সফদর জঙ্গের মৃত্যুর পর একদল লোক এ চেষ্টা করেছিল যেন শুজাউদ্দৌলা মসনদে আরোহন করতে না পারে। বরং সে স্থলে যেন মুহাম্মদ কুলি আরোহন করেন। ফলে শুজাউদ্দৌলা মুহাম্মদ কুলি খানকে নিজের প্রতিদ্বন্ধী বলে ভাবতে থাকে। তারপর থেকে শুজাউদ্দৌলা খুব চেষ্টা চালান যেন কোনক্রমে তার পথের এই কাটা অন্যত্র সরে যায়।

৯৪. জয় করে নেন কথাটি প্রকৃতভাবে ঠিক হলেও বাহ্যিকভাবে সঠিক নয়। কারণ তিনি যুদ্ধের জন্য মোর্চা এমনভাবে তৈরী করে নিয়ে ছিলেন বিজয় তার অবশ্যম্ভাবী। এহেন সময়ে হঠাৎ তার কাছে নিজ দেশের অস্থিরতার সংবাদ গিয়ে পৌঁছল। তা ছাড়া তিনি আরও জানতে পারলেন যে, ইংরেজদের শক্তিশালী বাহিনী নগর রক্ষার কাজে এগিয়ে আসছে তখন তার মন ভেঙ্গে যায়, তিনি সেখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করেন। (তারীখে উধ, খ. ২)

৯৫. তারীখে হিন্দুস্তান ও সিয়ারুল মুতাআখখিরীন।

৯৬. এ রাজ সিংহাসন শুধু নামে মাত্র। নতুবা সেখানে তখন আহারের দুটি টেবিল ব্যতীত কিছু ছিল না। উপস্থিতভাবে এ দুটিকে একত্রিত করে তারই ওপর একটি কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয়।

৯৭. তখনই তিনি নির্দেশ দেন যে, ইন্তেকালের তারিখ থেকেই আমার রাজত্বকাল শুরু হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৯৮. একটি বর্ণনা এমনও পাওয়া যায় যে, তিনি নিজে মতামত দিয়ে বলে ছিলেন যে, আমাকে শুজাউদ্দৌলার কাছে লক্ষ্ণৌ পৌঁছতে দাও। তার বিশ্বাস ছিল যে, শুজাউদ্দৌলার সাথে মুখোমুখি আলাপ হলে হয়ত সব ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে যাবে। এ কারণে তিনি এলাহাবাদে নিজের সৈন্যদেরকে বিদায় দেন এবং কয়েকজন সাথীসহ লক্ষ্ণৌ এসে পৌঁছেন। শুজাউদ্দৌলা তাকে দেখে পরম আন্তরিকাতর সহিত তার সাথে কোলাকুলি করেন। কিন্তু কোলাকুলি শেষ করে রওয়ানার মূহুর্তে তিনি দেখলেন যে, তিনি বন্দী হয়ে গেছেন। তারপর শুজাউদ্দৌলা প্যানিপথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে বিদায় মূহুর্তে তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে যান। রাজা বীনী বাহাদুর তার যাবতীয় মাল সামান যা কিছু এলাহাবাদে ছিল সব লুট করে নিয়ে যায় এবং তার সৈন্যদেরকেও ছত্রভঙ্গ করে দেয় । (তারীখে উধ, খঃ ২)

৯৯. মুশীরলস ছিলেন ফরাসী সৈন্যদের জেনারেল।

১০০. ইমাদুস সাদাত, কায়সারুত তাওয়ারীখ, তারীখে উধ প্রভৃতি।

১০১. কায়সারুত তাওয়ারীখ, ইমাদুস সাদাত প্রভৃতি।

১০২. ফররুখ বখশ, তারীখে উধ পৃঃ ১৬০- এর সূত্রে কায়সারুত তাওয়ারীখ।

১০৩. নাজফ খান ছিলেন ইরানের একটি শীয়া পরিবারের সদস্য। অতি তরুণ বয়সেই তিনি নিজ ভগ্নীর সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন। ষড়যন্ত্র কাজে পারদর্শিতা তাকে খুব অল্প দিনের মধ্যেই মুহাম্মদ কুলি খানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তারপর পরিচিতি আবার দ্রুত আত্মীয়তায় পরিণত হয় কারণ নাজফ খানের ভগ্নীকে মুহাম্মদ কুলি খান বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এরপর যখন মুহাম্মদ কুলি খানকে হত্যা করা হল তখন নজফ খান সম্রাট শাহ আলমের কাছে চলে যান এবং অল্প দিনের মধ্যেই সম্রাটের ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হন।

১০৪. সাধারণতঃ কোন দেশের মালিক হিসাবে ঐ ব্যক্তিকে জ্ঞান করা হয়ে থাকে যিনি সে দেশটি জয় করেছেন এবং সেখানে সরকার গঠন করেছেন। কিন্তু মোঘল সম্রাটদের ব্যাপারটি এর ব্যতিক্রম ছিল। তাদেরকে বংশানুক্রমিকভাবেই ভারত উপমহাদেশের বৈধ মালিক বলে তৎকালের সমাজের ধারনা ছিল। কারণ হল যে, মোঘল সম্রাটদের দীর্ঘ দুই শতাব্দীকাল রাজত্ব(যার অধীনে দশ বারটি রাজবংশ অতিবাহিত হয়েছে) গণমানুষের মনে একদিকে সম্রাটের ব্যাপারে 'অবতার' হওয়ার আকীদার প্রতিষ্ঠা করেছে অন্যদিকে এ কথারও সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, ভারতবর্ষের একচ্ছত্র মালিকানা হল মোঘল সম্রাটের জন্য। মোঘল সম্রাট মানুষের জন্য প্রেরিত অবতার এ ধারনা এতখানি উন্নতি লাভ করেছিল যে, স্বয়ং সম্রাট প্রত্যহ সকাল বেলা আগ্রা দূর্গের বারান্দায় উপবেশন করে যমুনায় স্নানকারীদেরকে দর্শন দান করতেন। আর এ স্নানকারীরাও সম্রাটের দর্শনকে ধর্মীয় পুজার ন্যায় আবশ্যক ও অনিবার্য বিষয় বলে জ্ঞান করত। অনুরূপে আব্বাসীয় খলিয়ারা যেমন এক দীর্ঘকাল মসনদ অলংকিত করে রাখার ফলে মুসলিম সমাজের

একমাত্র বৈধ শাসক শ্রেণী বলে পরিগণিত হয়ে ছিলেন যে সলতান মাহমুদ গযনবীর মত দেশ বিজয়ী ব্যক্তিও নিজের রাজত্বকে সত্যায়নের জন্য সেই আব্বাসী খলীফার সনদ লাভ করাকে আবশ্যকবোধ করতে হয়েছিল। এমন কি সেই দরবার থেকে 'সাইফুল্লাহ' উপাধি পাওয়ার পরেই মুসলমানরা তাকে বৈধ সম্রাট বলে মেনে নেয়। মোঘলদের ব্যাপারেও এমন অবস্থা ঘটে। মোঘলদের দীর্ঘ দুই শতাব্দীকাল রাজত্ব ভারত উপমহাদেশের হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে প্রতিটি প্রজার মনে এ ধারনা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, ভারতবর্ষের বৈধ শাসক একমাত্র মোঘল পরিবার। কাজেই স্থানীয় অন্যান্য শাসকদের মধ্যে যার কাছে ঐ মোঘলদের দেয়া সনদ বিদ্যমান থাকবে সেই একমাত্র বৈধ্য শাসক হিসাবে গণ্য হবে। মানুষের এই ধারণই মোঘলমদের শৌর্য-বীর্য নিঃশেষ হওয়ার এক দীর্ঘকাল পর পর্যন্তও তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। কারণ বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রঈস ও আমীরুগণ শক্তি সঞ্চয় করে বিশেষ বিশেষ অঞ্চল অধিকার করে লইতেন। কিন্তু গণমানুষের কাছে তার শাসনের বৈধতা দেখানোর লক্ষ্যে তখন তাকে সম্রাটের পক্ষ থেকে সনদ অর্জন আবশ্যক ছিল বিধায় স্থানীয় শাসক মণ্ডলী সম্রাটের বরাবরে নযরানা প্রেরণে বাধ্য থাকতেন। সেমতে শুজাউদ্দৌলা যখন মন্ত্রীত্বের সনদ অর্জন করতে চাইলেন তখন নযরানা হিসাবে তিনি সম্রাটের কাছে দুই কেটি টাকা পেশ করেন। এমন কি সুক্ষদর্শী ইতিহাসবিদদের মতে মারাঠারা যে দীর্ঘকাল যাবৎ যুদ্ধ চালিয়ে আসছিল সেখানেও তাদের উদ্দেশ্য ছিল মোঘল দরবার থেকে নিজেদের লক্ষ্যে সনদ অর্জন করে নেওয়া। তারা চেয়ে ছিল মোঘল পরিবার যেন তাদের রাজত্বকে সমর্থন দেয় এবং তাদেরকে খেরাজ তথা কর (যা চৌথ নামে মাথা পিছু ২৫% পয়সা করে আদায় করা হত) আদায় করার অনুমতি দেওয়া হয়। গণমানুষের এ ধারনা ও বিশ্বাসের কারণেই ইংজেরাও সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানীর সনদ লাভ করাকে আবশ্যক মনে করে। নতুবা যে সম্রাটকে বার বার পরাজিত করা হচ্ছে যাকে ভাতা ভোগী বানিয়ে রাখা হয়েছে তার কাছ থেকে সনদ অর্জন করার অর্থ কি ?

১০৫. নাজফ খান মারা যান ৩০শে জুমাদাল আউয়াল ১১৯৭ হিজরী মোতাবেক ২৬শে এপ্রিল ১৭৮২ সালে।

ইংরেজদের সাথে সন্ধির পর রাজনৈতিক মেরুবিভক্তি

কোড়া জাহানাবাদ সন্ধি চুক্তির দূরবর্তী প্রতিক্রিয়া এ দাঁড়িয়েছিল যে, তখন থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মেরুবিভক্তির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। বিগতকালে মেরু বিভক্তির আন্তদেশীয় বৈচিত্রের ভিত্তিতে হয়ে আসছিল। যেমন মারাঠা, মোঘল, পাঠান, রাজপুত কিংবা শীয়া সুন্নী ইত্যাদির ভিত্তিতে হয়ে আসে, কিন্তু ইংরেজদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মেরু বিভক্তির বুনিয়াদ হয়ে দাঁড়ায় ইংরেজদের পক্ষ বা বিপক্ষ অবলম্বনের ওপর। অর্থাৎ ততদিনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের ভূখন্ডে এতখানি উচ্চশক্তি অর্জন করে নিয়েছিল যে, গোটা উপমহাদেশের রাজনীতি তাদের সমর্থন ও অসমর্থনের ওপরই আবর্তিত হতে থাকে।

সেমতে লক্ষ্মৌর নওয়াব শুজাউদ্দৌলা ও সম্রাট শাহ আলম ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করেন। এর কিছুকাল পর ইংরেজরা হায়দ্রাবাদের নওয়াবদের সমর্থনও অর্জনে সক্ষম হয়। ফলে প্রতিটি নাজুক পরিস্থিতিতে হায়দ্রাবাদের এ নওয়াবদের সমর্থন তাদের বহুবিধ উপকার সাধন করেছিল।

অন্যদিকে তখন যে সকল শক্তি ইংরেজদেরকে সমর্থন করতে পারে নি তারা ছিল নিম্নরূপ ঃ

এক. রোহিলা পাঠান ঃ রোহিলাদের কর্তৃত্ব শাহজাহানপুর থেকে সাহারানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন হাফিয রহমত খান। নাজীব খান (যিনি নাজীবুদ্দৌলা উপাধি লাভ করে মোঘল দরবারের আমীরুল উমারা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন), নওয়াব ফয়েয মুহাম্মদ খান, মুহাম্মদ খান বাংগিশ, আহমদ খান বাংগিশ ও নওয়াব মুযাফফর জঙ্গ সহ ফররুখাবাদের নওয়াবগণ ছিলেন এ দলেরই উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তিত্ব।

দুই. মারাঠাশক্তি ঃ তাদের কর্তৃত্ব ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, মালাবার ও মধ্য ভারতের বিশাল অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।

তিন. দক্ষিণ ভারতে অপর একটি শক্তিও তখন ক্রমে অগ্রসর হয়ে আসছিল যাদের রূহানী সম্পর্ক ছিল হযরত শাহ আবূ সাঈদ[১০৬] ও শাহ আবুল লাইস[১০৭] (রহ)-এর মাধ্যম হয়ে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ)-এর সঙ্গে। সে শক্তিটি ছিল নওয়াব হায়দার আলীর শক্তি। দক্ষিণ ভারতের মহীশুর অঞ্চলে তিনি দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করে আসছিলেন। তারই কীর্তিমান সন্তান যিনি পরবর্তীকালে সুলতান টিপু নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, যার নাম শুনিয়ে ইউরোপীয় শিশুদেরকেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভয় দেখানো হত আর যাকে ভারতবর্ষের শিশু-বাছারা[১০৮] পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্রণী সৈনিক হিসাবে জানত।

অবাক হওয়ার কথা যে, তখন ইংরেজদের সমর্থন ও সাহায্য করার কাজে যারা অগ্রবর্তী ছিল যেমন বঙ্গদেশের মীর জাফর, মহীশুরের মীর সাদিক, লক্ষ্ণৌর নবাব শুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর নাজিফ খান তাদের সকলেই ছিল শীয়া মতাবলম্বী।

ইংরেজ বিপক্ষ শক্তিগুলোর দুর্ভাগ্যজনক পরিণাম

হাফিয রহমত খান

লক্ষ্ণৌর নওয়াব শুজাউদ্দৌলা রোহিলাদের ভূখন্ড করায়ত্ব করার ইচ্ছায় জেনারেল হেস্টিংস-এর ইঙ্গিত[১০৯] ও সাহায্য পেয়ে ১৭৭৪ সালে রোহিলা খন্ডের ওপর অভিযান প্রেরণ করে। তারপর প্রথমতঃ ফররুখাবাদের নওয়াব 'মুযাফফর জঙ্গ'-কে পরাজিত ও কর প্রদানে বাধ্য করে। এরপর একই বছর ২৩শে এপ্রিল মোতাবেক ১১৮৮ হিজরীর ১১ই সফর শুজাউদ্দৌলার সঙ্গে কাটরা মীরানপুরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রোহিলা আমীর হাফিয রহমত খান শহীদ হন। রোহিলাদের ওপর গণহত্যা চলে। তাদের সহায়-সম্পত্তি ও ধন-দৌলত লুণ্ঠন করে নেয়া হয়। নওয়াব ফয়জুল্লাহ খান লাল ডাঙ্গার দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের ভিতর পৌঁছে প্রাণ রক্ষা করেন। অবশিষ্ট রোহিলাগণও তার অনুসরণে সেখানে চলে যায়। প্রায় ছয়মাস পর্যন্ত সকলে সেখানে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার পর ইংরেজদের মধ্যস্থতায় শুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়। সেমতে কেবল রামপুর অঞ্চল জায়গীর হিসাবে তাদের অধিকারে থাকে। আর অবশিষ্ট অংশের সবটুকু ইংরেজ শুজাউদ্দৌলা ও নজফ খানের মধ্যে বণ্টন হয়ে যায়।

নাজীবুদ্দৌলাহ

আমীরুল উমারা নাজীবুদ্দৌলা ১৭৭০ সালে ইন্তেকাল করেন। তার পদে তারই সন্তান যাবিতা খানকে আমীরুল উমারা নিযুক্ত করা হয়। তিনি চিন্তাধারার

দিক থেকে ছিলেন ইংরেজ বিরোধী। এদিকে সম্রাট শাহ আলম ১৭৭০ সালে বাধ্য হয়ে ইংরেজদের জন্য দেওয়ানী মঞ্জুর করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৭১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তিনি ইংরেজ সৈন্যদের প্রহরাধীন লাল কিল্লায় প্রবেশ করেন। যাবিতা খান পরিস্থিতি দৃষ্টে পূর্বেই দিল্লী থেকে সরে নিজ জায়গীর নাজীবাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সুযোগে দিল্লীতে যাবিতা খানের জায়গায় নাজফ খানকে আমীরুল উমারা ঘোষণা করা হয়। নাজফ খানের আমীরুল উমারা পদ লাভ মারাঠাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। ফলে তারা সম্রাটের নিজস্ব জায়গীর অঞ্চলে আক্রমন করে বসে। অবশেষে উভয়ের মধ্যে যাবিতা খানকে পুনরায় ঐ পদে বহাল করার শর্তে সন্ধি স্থাপিত হয়। সেমতে ১৭৭২ সালে যাবিতা খানকে আমীরুল উমারা পদে ঘোষণা করা হল। কিন্তু এর পর পরই সম্রাটের কাছে ইংরেজ ও শুজাউদ্দৌলার পক্ষ থেকে নজফ খানকে আমীরুল উমারা বানানোর শক্তিশালী সুপারিশ গিয়ে পৌঁছে। সম্রাটের জন্য এ সুপারিশ এড়ানো সম্ভব ছিল না বিধায় ১৭৭৩ সালে পুনরায় নজফ খানকে আমীরুল উমারা ঘোষণা দেওয়া হয়। আর এভাবেই ইংরেজ কর্তৃত্ব লাল কিল্লার অভ্যন্তরে পৌঁছে নেতৃত্ব দিতে থাকে। অবশ্য তখন বাইরের প্রহরা মারাঠাদের হাতেই ছিল। এবার মারাঠা ও নজফ খানের দ্বন্দ্ব বস্তুত ইংরেজ ও মারাঠা দ্বন্দ্ব হিসাবেই চলতে থাকে।

ইংরেজ কর্তৃত্ব

এভাবে উত্তর ভারতে ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম থেকে দিল্লী পর্যন্ত একটানা ইংরেজ আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদ ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে আসে। কিন্তু সুলতান টিপু ও মারাঠাগণ ইংরেজদের সমর্থন করতে পারেনি বলে তারা বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। দুঃখের ব্যাপার হল যে, এ শক্তিদ্বয়ের নিজেদের মধ্যেও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। তাদেরকে দমন করার লক্ষ্যে ইংরেজরা প্রথমতঃ মহীশুরের দিকে অগ্রসর হয়। মারাঠাদের মাথায় হাত বুলিয়ে তাদেরকে চুপ করিয়ে দেয় এবং নিযামের সৈন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। এদকিে মীর সাদিক সহ জাতীয় গাদ্দার ও বিশ্বাস ঘাতকদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র ইতিপূর্বেই সম্পন্ন করা হয়েছিল। এখন অবশিষ্ট ছিল কেবল একটি যুদ্ধ অভিনয়ের যেখানে স্বাধীনতার দুর্জয় ব্যাঘ্র টিপুকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে শহীদ করে দেওয়া হবে।

৬ই মে তারিখ ছিল সেই ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার নির্ধারিত তারিখ। দিনের ১টা বাজে যুদ্ধ শুরু হল। স্বাধীনতা যুদ্ধের এ মহাবীর সেনাধ্যক্ষ নিজের কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর যাদের মধ্যে দেশপ্রেমিক মহিলারাও[১১০] ছিল তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজ আক্রমন প্রতিহত করতে থাকে। শত্রুরা চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখা সত্ত্বেও তিনি মে মাসের প্রচণ্ড গরমের ভিতর দীর্ঘ সাত ঘণ্টা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর সুলতান স্বদেশের স্বাধীনতার দাবীতে শাহাদাতের শরবত পান করেন।[১১১]

জগতের উত্থাপন-পতন ইতিহাসের পাতায় তার শাহাদাতের লাহু লিখে গেল ঃ

'ব্যাঘ্রের বীরত্বপূর্ণ জীবনের একটি মূহুর্ত শিয়ালের শতবর্ষ জীবনের চেয়েও উত্তম'।

কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি লর্ড হার্স যখন টিপুর রক্তমাখা শবদেহ দেখতে পেলেন তখন তার মুখ থেকে উচ্চরবে উচ্চারিত ধ্বনিটি ছিল, 'আজ থেকে ভারতবর্ষ আমাদেরই'।[১১২]

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি

খ্রিস্ট্রিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি লগ্নে ভারতীয় শ্রেষ্ঠত্বের সূর্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হতে থাকে। অন্যদিকে পরাধীনতার ভয়াল অন্ধকার সমগ্র দেশের আকাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আর ইংরেজ কর্তৃত্ব উষার আলো নিয়ে সম্মুখ যাত্রা শুরু করে।

তখন স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার কোলাহলহীন ময়দানে কেবল মারাঠা কর্তৃত্বের টিমটিমে একটি বাতি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। লাল কিল্লার যতটুকু উজ্জ্বলতা ছিল তা সেই মারাঠা শক্তিরই ছিল প্রতিবিম্ব। অবশ্য উত্তর শ্চিম দিকে দেশীয় অপর একটি বাতি উত্থানের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এটি হল রাজা রণজিৎ সিংহের শক্তি। এদিকে মুসলমানদের উল্লেখ যোগ্য সবগুলো শক্তি খতম হয়ে গিয়েছে। আর যেগুলো পূর্ণ নিঃশ্চিহ্ন হয়নি সেগুলো আহত ও বিশ্বস্ত অবস্থায় ইংরেজ কর্তৃত্বের সামনে মাথানত করে দাঁড়িয়ে আছে। ১৮০০ সালে তাই লর্ডলেক ইংরেজ বাহিনী সাথে করে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়। সিন্ধিয়া বাহিনী তখন লাল কিল্লার প্রহরায় ছিল। তারা প্রতিরোধের জন্য পূর্ণ চেষ্টা করেও

ইংরেজ বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করা সম্ভব হয় নি। পরাজিত দিল্লী বাধ্য হল ইংরেজদেরকে স্বাগত জানাতে। অবশেষে লর্ডলেক দিল্লী করায়ত্ব করেন এবং সম্রাট শাহ্ আলমের সঙ্গে নতুন চুক্তি সম্পাদন করে যান।

সিন্ধিয়া বাহিনী পেছনে হটে গেলে সম্মুখে এগিয়ে আসল হোলকার ও আমীর আলী খানের বাহিনী। দিল্লীর রণক্ষেত্রে তাদেরকেও পরাজয়বরণ করতে হল। অবশেষে সকলে শিখদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য লাভের আশায় পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করে। এখানে তারা সামান্য পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন বটে কিন্তু সামরিক সাহায্য দানের জন্য কেউই সম্মত হয়নি। মারাঠাদের মনে মহারাজা রণজিৎ সিংহের প্রতি বিরাট আশা ছিল। কিন্তু রাজাও পরিষ্কার বাক্যে সাহায্য দিতে অসম্মতি ব্যক্ত করল।[১১৩]

বাধ্য হয়ে মারাঠারা ইংরেজদের সামনে আত্মসমর্পন করে এবং পরে ১৮০৬ সালে লর্ডলেকের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের ভূখন্ডে প্রত্যাবর্তন করে। পরাজয়কে তারা মেনে নিয়েছিল কিন্তু ইংরেজদের প্রতি ক্ষোভ ও ক্রোধ তখনও তাদের অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। দূর্ভাগ্য যে, তখন গোটা ভারতবর্ষে এমন কেউ ছিল না–যিনি তাদের সমবেদনা করবেন, যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারেন। কেবল এক রাজা আর এক দরবেশ যারা তাদের বেদনায় শরীক হন। রাজা ছিলেন মারাঠা নেতা মধুজী সিন্ধিয়া আর দরবেশ ছিলেন হযরত শাহ্ আবদুল আযীয। হোলকার ও সিন্ধিয়া দলের পারস্পরিক শত্রুতা একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। এ শত্রুতা তাদেরকে অদ্যাবধি পৃথক করে রেখেছে। কিন্তু ঐ সময় ইংরেজ বিরোধীতার ব্যাপারটি সকলের দৃষ্টিতে অভিন্ন লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়েছিল। লক্ষ্যৌর অভিন্নতা তখন তিনটি দ্বান্দ্বিক সম্প্রদায়কে অভিন্ন এককে পরিণত করে। অর্থাৎ আমীর আলী, হোলকার ও সিন্ধিয়া দলকে একই মঞ্চে এনে দেয়।

ইংরেজ কর্তৃত্বের স্বরূপ ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গে একট জটিল প্রশ্ন

১৭৫৫ সালে পাটনা ও বক্সার যুদ্ধে নবাব শুজাউদ্দৌলা ও সম্রাট শাহ্ আলম যখন ইংরেজদের হাতে পরাজয় বরণ করেন তখনই ইংরেজদের পক্ষে দিল্লী অধিকার করে নেওয়া কোন জটিল ব্যাপার ছিল না। কারণ হল ইংরেজদের সামরিক শক্তি ততদিনে এতখানি উন্নতি করে গিয়েছিল যে, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে

তাদেরকে কেউ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হত না। কিন্তু তারা ধীরে বুদ্ধিমত্তার সহিত নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে অগ্রসর হয়। তারা পলিসি গ্রহণ করে যে, যে শক্তিটি পতনোন্মুখ অবস্থায় আছে তাকে তার স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করতে দাও। তাকে নির্দখল করার জন্য অনর্থক বন্দুকের কার্তুজ নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। এ জন্য ইংরেজ কূটনীতিকরা ভারতীয় রাজনীতির সকল জটিল মূহুর্তে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসে যদ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ধীরে বাস্তবতার রূপ লাভ করে এবং ব্যাধি রোগীর স্বাভাবিক মৃত্যুকে অনিবার্য করে তোলে। কিন্তু তারা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে একদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত জ্বরাজীর্ণ ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করার দিকে যায় নি। আর তাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের দাবীও ছিল এটি যে, অর্থ হাতড়িয়ে নেওয়া ও দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণের কাজটি ধীরে হোক। তার জন্য এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হোক যার কারণে তাদের ব্যাপারে গণমানুষের মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। ১৮০৩ সালে তারা যখন দিল্লী নগর কেড়ে নেয় তখনও এ স্থির সিদ্ধান্তের অনুকূলে কাজ করে যায়। অর্থাৎ তারা সম্রাটকে পদচ্যুত করে তার সিংহাসন দখল না করে রাজত্বের সেই পদ্ধতি চালু করতে চায় যা তাদের নিজ দেশ ইংল্যান্ডে বর্তমানেও চালু আছে। যে পদ্ধতির ওপর ইংরেজরা বহুকাল যাবৎ আমল করে আসে, সেটি হল সম্রাটকে তার নিজ সিংহাসনের ওপর বহাল রাখা এবং তার সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে নিয়ে আসা। এতদুদ্দেশ্যে তখন বলা হল দেশ পরিচালনার মূলনীতি হবে ঃ

خلق خدا کی ملك بادشاه سلامت کا الو حکم کمپنی بہادر کا

'ভূমি আল্লাহর, রাজত্ব মহান সম্রাটের আর কর্তৃত্ব থাকবে কোম্পানী বাহাদুরের'।

লক্ষ্য করুন পরিস্থিতি কতই নাজুক। খোদার খোদায়ীত্ব ও তার পরাক্রমশীলতার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে ধর্মের আঁচল দু'হাতে ধরে রাখা হয়েছে। সাথে সাথে মোঘল সম্রাট ও তৈমূর বংশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশকেও সংরক্ষণ করা হল। কেবল সরকারি কাজ কারবার যা এতদিন পর্যন্ত হিন্দু কিংবা মুসলিম আমীর উমারা ও মন্ত্রীদের হাতে ন্যাস্ত ছিল সেটি এখন থেকে ইস্ট-ইন্ডিয়া

কোম্পানীর হাতে সোপর্দ হল। এভাবে সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে শুধু এগুলোর যথার্থ সংরক্ষণের অঙ্গীকার ব্যক্তই নয় বরং হিন্দুদের সামাজিক বিষয়াদির দায়িত্ব তাদের পন্ডিত শ্রেণীর হাতে আর মুসলমানদের সামাজিক বিষয়াদি তাদের কাযীদের হাতে অর্পন করে সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্বায়ত্বশাসনও ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের জন্য তো প্রশ্নই নেই। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তথা আলিমদের বর্তমান সরকার ব্যবস্থার পার্থক্য নিরূপণ করা জটিল আকার ধারন করে। পূর্বে এ দেশে কর্তৃত্ব মন্ত্রীবর্গ ও আমীরদের হাতে ছিল। বর্তমানে সেই কর্তৃত্বই বৃটিশ পার্লামেন্ট ও কেবিনেট এবং ভারতের নিযুক্ত বোর্ড অব গভর্ণরস-এর হাতে অর্পিত হয়। এখানে পার্থক্য অবশ্যই আছে তবে খুবই সুক্ষ্ণ। এ পার্থক্য সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আপাতভাবে পড়ে থাকে নিজেদের ধর্ম, সভ্যতা ও সম্রাটের ওপর। অথচ এ তিনটি জিনিসকে তারা নিজ দখলের আওতা বহির্ভূত ঘোষণা করছে। এমতাবস্থায় তখনকার ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশ বলা যাবে না পরাধীন ? ইসলামী আইনের দৃষ্টিতেও এখানে জটিলতা বিদ্যমান। কারণ এহেন সরকার চালিত দেশকে পূর্বের ন্যায় দারুল ইসলাম জ্ঞান করা হবে, না দারুল হবর ? অথচ দারুল হবর যদি হল তাহলে এখানে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা অন্যথায় দেশ থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়া আবশ্যক। এহেন দেশকে 'দারুল আমান' বলা যায় কিনা এখানেও জটিলতা বিদ্যমান। যদি 'দারুল আমান' অর্থাৎ সরকার অমুসলিম বটে তবে তার দেশে মুসলমান নাগরিকদের জীবন সম্পদ ইত্যাদির নিরাপত্তা আছে–এমন পর্যায়ের জ্ঞান করা হয় তা হলে সেখানে সরকারের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।

মোট কথা তখনকার প্রেক্ষাপটে এটি ছিল একটি জটিল প্রশ্ন। একটি নতুন সমস্যা হিসাবে তখন খ্রিস্ট্রিয় উনবিংশ শতকের শুরুর দিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আলিমদের সামনে এ সমস্যা উপস্থিত হয়। সমস্যাটির সমাধানের ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রায় হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তবে সিদ্ধান্তের এ ভিন্নতা কুচক্রী ও কূটনীতিবিদ ইংরেজদের জন্য সহজলভ্য সুবিধার পথ করে দেয়। তারা এটির অবলম্বনে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও ভিন্ন পথে পরিচালনা করার কোন সুযোগ হাত ছাড়াও করেনি, কিন্তু হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-র

শিক্ষালয় থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা এ ভেল্কীবাজীতে প্রতারিত হওয়ার মত ছিল না। তাই দেখা যায়, তখনকার প্রেক্ষাপটে ওয়ালী উল্লাহী দলের নেতা হযরত শাহ আবদুল আযীয ফতওয়া প্রকাশ করে সমস্যাটির স্বরূপ ও সমাধান পেশ করেন।

শাহ আবদুল আযীয (র)-এর ফতওয়া

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) যে ফতওয়া দিয়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

دریں شہر حکم امام المسلمین اصلاً جاری نیست، وحکم روساء نصاری بے دغدغہ جاری ست ومراد از اجراء احکام کفر اینست کہ در مقدمہ ملك داری وبندوبست رعایا واخذ خراج وباج وعشور اموال تجارت وسیاست قطاع الطریق وسراق وفیصل عصومات وسزائے جنایات کفار بطور حاکم باشند آرے اگر بعضے احکام اسلام را مثل جمعہ عیدین وازان وذبح بقر تعرض نکنند نہ کردہ باشند لیکن اصل اصول این جیزها نزد ایشاں ہبہ وہدرست ز یرا کہ مساجد را بے تکلف ہدم می نمائند وہیچ مسلمان یا زمی بغیر استیمان ایشاں دریں شہر ودر نواح نمی تواند آمد، وبرائے منفعت خود از واردین ومسافرین وتجار مخالفت نمے نمایند اعیان دیگر مثلاً شجاع الملك ولایتی بیگم بغیر کحم ایشاں دریں بالد داخل نمے تواند شد وازیں شہر تا کلکتہ عمل نصاری ممتدست آرے درچپ وراست مثل حیدر آباد لکھنو ورام پور احکما خود

جاری نہ کردہ اند بسبب مصالحت واطاعت مالکان آں الخ

অর্থাৎ এতদঞ্চলে বস্তুত ইমামুল মুসলিমীনের কর্তৃত্বে কোন কর্তৃত্ব নেই। খ্রিস্টান নেতৃবর্গ (অফিসারবৃন্দ)-এর নির্দেশই এখানে নিরংকুশভাবে কার্যকরী। শরীয়তে বর্ণিত দারুল হবর তথা অমুসলিম কর্তৃত্ব ও নির্দেশ প্রয়োগের অর্থ হল রাষ্ট্রীয় যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, খিরাজ, ওশর, বাণিজ্যিক কর খাজনা, চোর-ডাকাত থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা, মামলা-মকদ্দমার মীমাংসা, অপরাধের শাস্তিদান ইত্যাদি (সামরিক ও বেসামরিক ব্যবস্থাপনা, পুলিশ বিভাগের পরিচালনা, দেওয়ানী ফৌজদারী বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ, কাস্টম ডিউটি ইত্যাদিসহ) সবকিছুর ক্ষেত্রে তারাই সর্বোচ্চ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। বলা বাহুল্য যে, বর্তমানে উপরোক্ত বিষয়াদিতে ভারতীয় নাগরিকদের আদৌ কোন কর্তৃত্ব নেই। তবে তারা মুসলমানদের জুমুআ, ঈদ, আযান ও গরু জবাইয়ের ক্ষেত্রে কোন বাধা দিচ্ছে না বটে। এতদসত্ত্বেও যে বিষয়টি উপরোক্ত সকল বিষয়ের মূল কথা ও স্বাধীনতার প্রকৃত বুনিয়াদ (অর্থাৎ ইচ্ছা ও মতামতের স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার লাভ) সেটি এখানে নিঃসন্দেহে অর্থহীন ও পদদলিত অবস্থায় পড়ে আছে। এ কারণেই ভ্রুক্ষেপ না করেই মসজিদগুলোকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া হচ্ছে, সর্বসাধারণকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমনকি হিন্দু কিংবা মুসলিম নির্বিশেষে কোন নাগরিক তাদের সরবরাহকৃত পাসপোর্ট কিংবা পারমিট ব্যতিরেকে এ শহর কিংবা শহরের উপকণ্ঠগুলোতে প্রবেশ করতে পারে না। মুসাফির কিংবা বণিকদেরকে নগরে যাতায়াতের যে অনুমতি দেওয়া আছে সেটিও দেশীয় স্বার্থ কিংবা নাগরিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে নয় বরং তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এতটুকু অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। পক্ষান্তরে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যথা শুজাউল মুলক বেলায়েতী বেগম প্রমুখ লোকেরাও তাদের অনুমতি লাভ ব্যতিরেকে এ দেশে প্রবেশের অনুমতি নেই। তবে ডান বামের কতিপয় অঞ্চল যথা হায়দ্রাবাদ, রামপুর ও লক্ষ্ণৌ ইত্যাদির নেতৃবৃন্দ যেহেতু ইংরেজ অনুগত্য মেনে নিয়েছে সেহেতু তাদের সে সকল অঞ্চলে খিস্ট্রানদের কর্তৃত্ব সরাসরিভাবে জারি নেই। তাতে গোটা দেশ দারুল হরব প্রমাণিত হওয়ার

মধ্যে কোন পার্থক্য আসে না। (ফাতাওয়ায়ে আযীযী, ফার্সী, খঃ ১, পৃঃ ১৭, মাতবায়ে মুজতাবারী থেকে মুদ্রিত)।

তিনি অপর একটি ফতওয়ার মধ্যেও বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগসমূহ খন্ডন করে ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' বলে প্রমাণ করেন (১ম খন্ড, পৃঃ ১০৫, ফাতাওয়ায়ে আযীযী)।

উপরোক্ত ফতওয়ার ভাষা ধর্মীয় আঙ্গীকের। কারণ এখানে এ ভূখন্ড দারুল ইসলাম না দারুল হরব্ সেটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু ফতওয়াটির মৌল নিবেদন একটি রাজনৈতিক বিষয়। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে দারুল হরব ঘোষিত হওয়ার অর্থ দাঁড়ায়[১১৪] ; যেহেতু –

১. বিধান নির্ধারণের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খ্রিস্টানদের হাতে আবদ্ধ হয়ে আছে ;

২. ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্ট হয়ে চলছে ;

৩. এবং গণমানুষের স্বাধীনতার ন্যায্য অধিকার হরণ করা হয়েছে।

সেহেতু এখন দেশপ্রেমিক প্রতিটি নাগরিকের জন্য অবশ্য কর্তব্য হল সেই ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে খোলাখুলি জিহাদ ঘোষণা করা। অনুরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত এ অশুভ শক্তিকে স্বদেশের ভূখন্ড থেকে বহিষ্কার না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকা প্রতিটি নাগরিকের জন্য হারাম বলে জানতে হবে।

এখানে আরেকটি কথা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নাজফ আলী খানের মৃত্যু (১৭৮২ খ্রিঃ)-এর পর থেকে প্রায় বিশ বছর পর্যন্ত কর্তৃত্ব মারাঠাদের হাতে অর্পিত ছিল। মারাঠাদের পেশোয়া (মধু নারায়ণ তৎপরে বাজীরাও) আমীরুল উমারা পদে এবং মধুজী সিন্ধিয়া নায়েবে আমীরুল উমারা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একালে যেমন ঘোষণা করা হচ্ছে যে, সর্বময় কর্তৃত্ব কোম্পানীর হাতে সংরক্ষিত তদ্রুপ বিশ বছর পূর্বে জগত শুনেছিল যে, কর্তৃত্বের যা কিছু আছে সবটুকু কথা তখন সিংহাসন ও সিংহাসনের বাইরের সর্বত্র এক অমুসলিম শক্তি অর্থাৎ মারাঠারা ঝেঁকে বসে রয়েছিল।

সে সময় শাহ আবদুল আযীয ও তার দলের সকল সদস্য দিল্লীতেই অবস্থানরত ছিলেন। মারাঠা উত্থানের সবকিছু তাদের চোখের সামনেই ঘটে চলছিল। তাদের মুখে ভাষাও ছিল হাতে কলমও ছিল। তাই যখনই মারাঠা শাসন ব্যবস্থার যেখানে তারা ত্রুটি ও অসন্তোষের বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন

সেখানেই তারা শক্তভাবে সমালোচনা করে যান। আজও সে সকল আরবী ফার্সী কবিতাসমূহ বিদ্যমান যেখানে মারাঠাদের গভীর সমালোচনামূলক বক্তব্য রাখা আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা এ বিশ বছরের কখনও না প্রিয় মাতৃভূমিকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করেছিলেন, আর না ভারতীয় নাগরিকদের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ কিংবা দেশ থেকে হিজরত করার অনিবার্যতার ওপর ফতওয়া প্রদান করেছেন। বরং তখনকার পরিস্থিতিতে তাদের কাছ থেকে বিপরীত উদ্যোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন মুসলমানদের যোদ্ধা একটি দল যারা হযরত শাহ আবদুল আযীযের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করত অর্থাৎ পাঠান শ্রেণী তারা এ আমলে মারাঠাদের সাথে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে নেয়। এখানে আরও একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত শাহ আবদুল আযীযকে নানাভাবে কষ্ট দানের যে সকল ঘটনাবলি বর্ণিত আছে তার যিনি মূল নায়ক ছিলেন তিনি দিল্লীর এই নাজফ আলী খান। যিনি পুরানকাল থেকেই ইংরেজদের ভাতাভোগী ও তাদের প্রতিষ্ঠাকৃত মন্ত্রী ছিলেন।

ফতওয়ার প্রতিক্রিয়া

সাধারণ মুসলমান যারা ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান শক্তির দৃষ্টে বিচলিত ছিলেন, যারা এহেন শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার বিষয়ে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সিদ্ধান্ত খুঁজে পাচ্ছিল না তাদের জন্য উপরোক্ত ফতওয়া সকল অস্পষ্টতা দূর করে গন্তব্যের পথ খুলে দিয়েছে। ফলতঃ অতি দ্রুত যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা হল তখন সাহসী যোদ্ধা শ্রেণীর লোকেরা ইংরেজদের বিপরীতে লড়াইরত শ্রেণী অর্থাৎ মারাঠাদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ শুরু করে।

তাই দেখা যায় যে, একালে মুসলমান ও মারাঠাদের মধ্যকার প্রাচীন শত্রুতামূলক মনোভাব নির্মূল হয়ে যায়। তখন মারাঠা অধ্যুষিত অঞ্চলের মুসলমানরা মারাঠাদের সাথে একযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তাই নয় বরং উত্তর ভারত থেকেও বহু মুসলমান দক্ষিণ ভারতে পৌঁছে মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে অংশ নেয়। স্বয়ং হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ) নিজের একান্ত ভক্ত ও মুরীদ হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদকে আমীর আলী খান সাম্বুলীর কাছে পাঠান। আমীর আলী খান সাম্বুলী তখন মারাঠা নেতা জশোবন্ত রাও হোলকারের সহিত মিলিত হয়ে এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির মোকাবেলারত ছিলেন।

টীকা

১০৬. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ গ্রন্থের লেখক মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী যিনি এ বংশের একজন গর্বিত সন্তান তিনি হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবু সাঈদ (রহ) সম্পর্কে লিখেন যে, মাদ্রাজ ও চীনাপটন অঞ্চলে তার গভীর জনপ্রিয়তা ছিল (পৃঃ ৬৫)। হযরত শাহ আবু সাঈদ (রহ)-এর বদান্যতা ও দানশীলতা সম্পর্কে বলেন, একবার তার দরবারে তৎকালের এক লক্ষ নগদ টাকা হাদিয়া হিসাবে এসেছিল। তিনি টাকাগুলো গৃহের বাইরে রেখে দেন এবং সেখানে বসেই পূর্ণ টাকা অভাবী লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন (পৃঃ ৬৫)। সম্ভবতঃ এ টাকাগুলো ছিল মহীসুরের নবাব হায়দার আলী (মৃঃ ১১৯৭ হিঃ ১৭৮২ খ্রিঃ)-এর দেওয়া উপঢৌকন। মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী এ অধমকে মৌখিকভাবে কথাটি শুনিয়ে বলেন, পারিবারিকভাবে যা বর্ণিত আছে তাও হল যে, নবাব হায়দার আলীর দরবার থেকে এ এক লক্ষ টাকা হাদিয়া হিসাবে এসেছিল।

১০৭. সায়্যিদ আবুল লাইস সাহেব তার পিতা সায়্যিদ আবু সাঈদ সাহেবের খলীফা ছিলেন। তিনি হজ্জের পর দক্ষিণ ভারতে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়। কোড়িয়াল বান্দরবন সমুদ্রের তীরে তাকে দাফন করা হয়। (হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের চাচা সায়্যিদ মুহাম্মদ মান্নান সাহেব রচিত গ্রন্থের বরাতে ডঃ আব্দুল আলী কর্তৃক বর্ণিত)।

১০৮. ভারতে প্রদেশসমূহ বিভক্ত করার নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর যখন বৃহত্তর মহীসুর প্রদেশের উদ্বোধন করা হচ্ছিল তখন ভারতীয় বার্তা সংস্থার রিপোর্টে বলা হয় যে, মহীসুর রাজ্যের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিস্টার হুনোমন্তিয়া যিনি এ প্রদেশের উন্নয়নের জন্য আন্তরিক চেষ্টা প্রচেষ্টা করে আসছেন তিনি নিম্নোক্ত পয়গাম জারি করেছেন। 'ঐতিহাসিক দলিলপত্রের সূত্রে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, টিপু সুলতান নেপোলিয়নের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। টিপু সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এক. ভারতবর্ষকে ইংরেজ আধিপত্য থেকে মুক্ত করা। দুই. মহীসুরের সরকারকে একটি গণতান্ত্রিক সরকারে পরিণত করা। এ কারণেই সুলতান টিপু তার অনেক দলিলপত্রে 'নাগরিক টিপু' নামে দস্তখত করতেন। আজ তারই দেড়শত বছর পর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস যা করছে তার স্বপ্ন বহু পূর্বেই সুলতান টিপু দেখে আসছিলেন। আর এ লক্ষ্যেই তিনি নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেন। বলা বাহুল্য সুলতান টিপু নিজেরই জেনারেল ও মন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে শাহাদাত বরণে বাধ্য হন। আজোও লোকেরা সেসব গাদ্দারকে অভিশাপ দিয়ে থাকে। ১৯৭৭ সালে টিপু সুলতানের শাসিত মহীসুর যতখানি ছিল বর্তমান বৃহত্তর মহীসুরের সীমানা ততটুকুই। খুবই অবাক হওয়ার কথা যে, সুলতান টিপু মঙ্গলৌরের অদূরে একটি সমুদ্র বন্দর নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। বর্তমানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পান মধ্যেও ঐ স্থানে সামুদ্রিক বন্দর তৈরীর চেষ্টা করা হচ্ছে। আধুনিক মহীসুরের ভবিষ্যত ও যাবতীয় সম্ভাবনা খুবই আশা-ব্যঞ্জক বলা চলে। চেষ্টা করা হলে এ মহীসুরকে ভারতের সর্বাধিক উন্নত একটি নগরে পরিণত করা সহজ। তবে শর্ত হল

আমাদেরকে শ্রম ও নিঃস্বার্থতার সাথে কাজ করে যেতে হবে। গাদ্দার ও বিশ্বাসঘাতকদের থেকে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে। আমি দুআ করি সেখানকার হিন্দ-মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সকলে একই পরিবারের সদস্যের ন্যায় মিলেমিশে দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টায় যেন সকলে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করতে পারে।

১০৯. তারীখে হিন্দুস্তান, শামসুল উলামা যাকাউল্লাহ্ খান ও হায়াতে হাফিয রহমত খান।

১১০. ক্যানেস্টামস পার্স তার 'শ্রীঙ্গাপট' গ্রন্থে লিখেন টিপু সুলতানের শবদেহের পাশে অগণিত মহিলাদের লাশ পড়া ছিল। তাদের লেবাস পোষাক দৃষ্টে বুঝা গিয়েছিল যে, সম্ভবতঃ তারা ছিলেন সুলতান পরিবারের রমনীবৃন্দ। মিঃ অ্যানিসন জন কিং বলেন মহিলাদের এ সকল লাশের মধ্যে রূপবতী জনৈকা ব্রাহ্মণ কন্যাও ছিল। (তারীখে সুলতানাতে খোদাদাদ পৃঃ ৩০৫)।

১১১. এটি একটি দুঃখজনক উপখ্যানের দিকে ইঙ্গিত। ঘটনা হল যে, সুলতানের সঙ্গীরা এমনটি তার ঘনিষ্ঠ অনুচর সেবক লোকটি যার হাতে পানির পাত্র সংরক্ষিত ছিল সেও ইংরেজদের কাছে পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় হয়ে গিয়েছিল। দরবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজ বাহিনীকে দুর্গে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেয়। সুলতান নিজের দেহরক্ষীদের কয়েকজনকে নিয়ে স্বদেশের মান-সম্মান রক্ষার্থে শত্রু-সৈন্যের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালে এ দেহরক্ষী লোকেরাও নিজেদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলে প্রমাণ করে। তিনি সৈনিক সুলভ বীরত্ব নিয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মৌসুম ছিল অতিশয় গরমের। প্রচন্ড পিপাসায় কাতর হয়ে সেবায় নিয়োজিত খাদিমের কাছে তিনি পানি চাইলেন। দুঃখের বিষয় তখন সাকীর হাত অগ্রসব হয়নি, মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পানি প্রার্থনা অবস্থায় বীর টিপু ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে যান। পানি বহনকারী অনুচরের মনে তখনও দয়ার উদ্রেক হল না। স্বল্প সময়ের এ পথিক সেই পিপাসা নিয়ে গাদ্দারদের দুনিয়া চিরকালের জন্য ত্যাগ করেন।

১১২. সালতানাতে খোদাদাদ মাইসূর, (পৃঃ ৩০৩-৩৪৯)।

১১৩. তারীখে পাঞ্জাব, পন্ডিত দেবী প্রসাদ পৃঃ ২৩ ; মহারাজা রণজিৎ সিং, কৃত অধ্যাপক সীতারাম কুহলী পৃঃ ৯৮-৯৯ ; নওয়াব আমীর আলী খান, কৃত মাওলানা শাহ্ আকবর খান।

১১৪. বর্তমানকালের সুপ্রসিদ্ধ নেতা ও জমিয়দে উলামায়ে হিন্দ-এর সভাপতি হযরত মাওলানা সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী উপরোক্ত ফতওয়ার অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

এক. হযরত শাহ্ সাহেব ইংরেজদের কৃত যে সকল অন্যায় অবিচারের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের কথাও তিনি উল্লেখ করে গেছেন। উভয় সম্প্রদায়ের কেউই দিল্লী কিংবা দিল্লীর শহরতলীতে ইংরেজদের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করতে পারত না। কাজেই এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি ইংরেজদের নির্যাতন থেকে শুধু মুসলমানদেরই নয় বরং হিন্দুদেরও মুক্তির ব্যবস্থা কামনা করতেন।

দুই. শাহ্ সাহেব ইসলামের দৃষ্টিতে কোন জনপদ দারুল ইসলাম প্রমাণিত হওয়ার জন্য কেবল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেই যথেষ্ট মনে করতেন না। বরং তিনি যেখানে মুসলমানগণ সম্মানজনক জীবন-যাপনের ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় প্রতীকী বিষয়সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় থাকাও আবশ্যক মনে করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন দেশে যদি রাজনৈতিক সর্বোচ্চ ক্ষমতা কোন অমুসলিম দলের হাতে থাকে এবং ঐ ক্ষমতার মধ্যে মুসলমানগণও শরীক থাকেন এবং তাদের ধর্মীয় প্রতীকী বিষয়গুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অবশিষ্ট থাকে তাহলে শাহ্ সাহেবের দৃষ্টিতে এমন দেশটি 'দারুল ইসলাম' হিসাবে গণ্য। তখন শরীয়তের দৃষ্টিতে মসুলমানদের কর্তব্য হল সেই দেশকে নিজেদের দেশ বলে জ্ঞান করে তার সামগ্রিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে যাওয়া। (নকশে হায়াত, খঃ ২, পৃঃ ১১)।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছর

রাজনৈতিক নানা রকমের পট-পরিবর্তন ও ওয়ালী উল্লাহী দলের পদক্ষেপ গ্রহণ

লর্ড ওয়েলেসলীর সপ্ত বর্ষীয় রাজত্বকাল (অর্থাৎ ১৭৯৮ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত) ছিল ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর উত্থাপন যুগ। ১৭৯৯ সালে সুলতান টিপুকে দমন করা হল। এরই আড়াই বছর পর মারাঠা সর্দার পেশোয়াকে বস্যতা স্বীকারে বাধ্য করে ১৮০২ সালে বসীনের প্রসিদ্ধ চুক্তি সম্পাদন করা হয়। তাতে বলা হয় যে, ইংরেজদের একটি সৈন্যদল পেশোয়ার এলাকায় সবসময় অবস্থায় করবে। তারপর সিন্ধিয়ার সৈন্যদেরকে পরাজিত করে ১৮০৩ সালে ইংরেজরা রাজধানী দিল্লী অধিকার করে। মহারাজা জশোবন্ত রাও হোলকার ও তার মুখডাকা ভ্রাতা আমীর আলী খানের শক্তিকেও দুর্বল করা হয়। ফলে এ সকল শক্তিও পেছনে হটে যেতে বাধ্য হল। তবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের পরিত্রাণ ও উদ্ধার চেষ্টা তারপরেও বরাবর অব্যাহত থাকে। তাই কিছুকাল পরেই দেখা গেল এ প্রচেষ্টার ফসল বিশাল আকারে ফুটে উঠে। জশোবন্ত রাও হোলকার ও আমীর আলী খানের পরাজিত সৈন্যগণ পুনরায় সুগঠিত হয়। পেশোরাও নিজের সৈন্যদেরকে প্রস্তুত করে নেয়। দৌলত রাও সিন্ধিয়া তার সৈন্য ও অস্ত্রাগার ইংরেবদের বলিষ্ঠ মোকাবেলার কেবল উপযুক্তই বানায়নি উপরন্ত তিনি নেপালের মহারাজার সঙ্গে গোপন চুক্তি করে নিতেও সমর্থ হন। মধ্য ভারতে পিন্ডারী[১১৫] নামে যাযাবরদের একটি দল কান্ড ঘটিয়ে চলল। তারা ইংরেজ-শাসিত এলাকা ও ইংরেজদের মিত্র রাজ্যগুলোর ওপর লুটপাট ও খুন-খারাবী শুরু করল। মোট কথা বারতবর্ষের পরাজিত ও অবশিষ্ট সব শক্তিগুলো তখন পুনর্বার একসঙ্গে ইংরেজ বিরোধী শিবিরে এসে জড়ো হল।[১১৬]

একালেই ইউরোপে নেপোলিয়ন বোনাপোর্ট রাজ্য বিজয়ের ধারা প্রবাহিত করে চলছিল। নেপোলিয়ন তার একটি দূতকে ইরান পাঠিয়ে ইরানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য হল এখান থেকে ভারতবর্ষে অবস্থিত

ইংরেজদের ওপর আক্রমণ পরিচালনার কাজ যেন সহজ হতে পারে।[১১৭] ইংরেজরাও এ পরিকল্পনা টের পেয়ে তা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে (সীমান্ত অঞ্চলে) মহারাজা রণজিৎ সিংহের সহিত ১৮০৮ সালের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সেমতে রণজিৎ সিং পটয়ালা নাভা ও কাপুরতলা ইত্যাদি অর্থাৎ সাতলজ নদীর অপর পাড়ে অবস্থিত রাজ্যগুলো ইংরেজ শক্তির ছত্রছায়ায় দখল করে নেয় এবং ইংরেজদের একান্ত বন্ধুতে নিজেকে পরিণত করে।[১১৮] মোদ্দা কথা এ আমলটি যা ১৮০৮ সাল থেকে শুরু হয়েছিল তখন ভারতীয় স্বদেশী শাসকমন্ডলী ও ইংরেজদের মধ্যে বহুবল পরীক্ষার চূড়ান্ত ও জটিলতর একটি যুগ ছিল। এ জটিল মূহুর্তে ওয়ালী উল্লাহী দলের নেতা হযরত শাহ আবদুল আযীয নিজেও নিরব থাকেননি। তিনি তার দলের লোকদেরকে নিজের একান্ত বিশ্বস্ত সাগিরদ ও মুরীদ হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জশোবন্ত রাও হোলকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নওয়াব আমীর আলী খানের সৈন্য দলে ভর্তি হওয়ার নির্দেশ দেন। আর এ প্রক্রিয়ায় তিনি আপন 'দারুল হরব' ফতয়ার একটি কার্যকরী রূপ মুসলমানদের সামনে পেশ করেন।

হযরত সায়্যিদ আহমদ রায় বেরেলীর এমন একটি খান্দানের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যাদের প্রতি গণমানুষের শ্রদ্ধাবোধ সমগ্র অযোধ্যা অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। তারই পূর্ব পুরুষ 'শাহ ইলমুলাহ' (রহ)-এর খানকা তাকিয়ায়ে শাহ ইলমুল্লাহ নামে সকলের কাছে ছিল পরিচিত। প্রায় একশত বছর পূর্ব থেকেই অযোধ্যাবাসী লোকেরা এ কানকার ফয়েজ বরকত লাভে ধন্য হয়ে আসছিল।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ) এ খানকাকেই নিজের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। সেখানকার হযরত শাহ আবু সাঈদ (রহ) যাকে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ সেই কেন্দ্রের ইনচার্জ তথা দায়িত্বশীল রূপে মনোনীত করে ছিলেন তিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের মাতামহ। তারই আধ্যাত্মিক ফয়েজ ও বরকত দক্ষিণ ভারতের মহীসুর অঞ্চল ও শৃঙ্গাপটম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তিনিই সুলতান হায়দার আলূ ও সুলতান টিপুর মনমস্তিষ্ক দেশ প্রেমিকতার দ্বারা সুশোভিত করে দিয়ে ছিলেন।

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ যৌবন বয়সে নিজ বাড়ি থেকে বের হন। পিতার স্নেহছায়া ইতিপূর্বেই চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে গিয়েছিল। তিনি

প্রথমতঃ জীবিকার সন্ধানে লক্ষ্ণৌ যান। কিন্তু সামান্য কয়দিন অবস্থান করার পরই লক্ষ্ণৌর পরিবেশ পরিস্থিতি তার কাছে অপ্রীতিকার অনুভূত হতে লাগল। তিনি বন্ধুদেরকে ছেড়ে একাকী চলে গেলেন দিল্লীতে। সেখানে হযরত শাহ আবদুল আযীয ও তার ভ্রাতৃবৃন্দ তাকে স্নেহের পরশে আবদ্ধ করে নেন। সায়্যিদ সাহেব নিজের অবশিষ্ট জীবন এ খানকারই সেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ নিয়মতান্ত্রি অধ্যয়ন লাভকারী মৌলভী ছিলেন না। তবে রূহানী ও আধ্যাত্মিক পর্যায়সমূহ তার পরিপূর্ণ অর্জিত ছিল। তারপর যখন পরিস্থিতির দাবী অনুসারে সকল এলাকার লোকজন ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারনের প্রয়োজন দেখা দিল সে মূহুর্তে তার সৈনিকসুলভ প্রকৃতি দেখে শাহ আবদুল আযীয (রহ) তাকে নওয়াব আমীর আলী খান ও জশোবন্দ রাও হোলকারের সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন।

এই আমীর আলী খান যিনি জশোবন্দ রাও হোলকারের সঙ্গী হিসাবে কাজ করছেন তিনিও বংশগতভাবে কোন নওয়াব বা বাদশা ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন জনৈক দরিদ্র পাঠান পিতার সুযোগ্য সন্তান। পিতার নাম মুহাম্মদ হায়াত খান। তিনি প্রথম জীবনে রোহিলা নওয়াব দুন্দে কানের সৈন্য বাহিনীতে চাকুরী করতেন। ইংরেজরা যখন শুজাউদ্দৌলার মাধ্যমে রোহিলা রাজত্ব ধ্বংস করে তখন মুহাম্মদ হায়াত খান চাকুরী ছেড়ে দেন এবং দুনিয়াদারী ত্যাগ করে সাম্বুলে অতি সাধারণ জীবন যাপন করতে তাকেন। সামান্য জমিজমা ছিল সেই আয়ের ওপরই সংসারের খরচ নির্বাহ করতেন। তারই সন্তান ছিল আমীর আলী খান। তার স্বভাব ও প্রকৃতি তাকে আরও অগ্রসরের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, বিভিন্ন নগর ও জনপদ পরিভ্রমণের পর তিনি নিজ উদ্যোগে একটি দল গঠন করেন। তারপর ধীরে ধীরে জশোবন্দ রাও হোলকারের ঘনিষ্ঠ ও একান্ত বন্ধুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সামরিক অভিযানে তার, দক্ষিণ হস্তের মর্যাদা লাভ করেন।

মোট কথা স্বাধীনতা রক্ষার চুড়ান্তর চেষ্টা প্রচেষ্টার যে যুগ ১৮০৮ সাল থেকে মুরু হয়েছিল সেটি ১৮১৭/১৮১৮ সালের দিকে (লর্ড হেস্টিংস-এর শাসনামলে) ভারতবাসীদের কপালে দুর্ভাগ্যের মোহর অংকিত করার মাধ্যমে শেষ হয়। মারাঠাদের সবচেয়ে শক্তিশালী সর্দার বাজী রাও পেশোয়াকে পদচ্যুত

করে কানপুরের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র একটি গ্রাম 'ভেটোর' এ পাঠিয়ে দেওয়া হল। সায়্যিদ যাইন আরবের নেতৃত্বে আরবীয়দের একটি সৈন্যদল ও রোহিলা পাঠানদের একটি সৈন্য বাহিনী যারা শেষ অবদি বাজী রাও পেশোয়ার পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছিল–তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হল।[১১৯] নাগপুরের শাসনকর্তা অপ্পী সাহেবকেও এ বছর পদচ্যুত ও গ্রেফতার করা হয়। আরবীয়দের অপর একট দল রাজাকে পদচ্যুত করার পরও কয়েকদিন পর্যন্ত প্রাসাদের প্রহরা অব্যাহত রাখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও আত্মসমর্পন করতে হল।[১২০] পিন্ডারী সর্দার চীতু যিনি এতদিন পর্যন্ত মহারাজা দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও যোধপুরের রাজা মানসিংকে এ কথা বলে আসছিলেন যে, আমার পরিবার পরিজনের জন্য আশ্রয়ের কোন ঠিকানা পেলে আমি কলিকাতা পর্যন্ত ইংরেজ শাসিত গোটা রাজ্য লুটপাট করে বিধ্বস্ত করে দিব[১২১]–তিনিও শেষ অবদি প্রাণ বাঁচিয়ে পলায়নে বাধ্য হন। তারই অপর সাথী কাদির বখশ নিজ সঙ্গীদের সহ আত্মসমর্পন করলে ইংরেজরা তাদেরকে গোরাক্ষপুর জেলে আবদ্ধ করে।

মহারাজা হোলকার যিনি বারংবার পরাজিতের গ্লানী পোহানোর দরুন মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন[১২২] – তিনি শেষ অবধি আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলের ওপর নিজেকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেন। আমীর আলী খানকে টুংক এলাকা এবং তার সাথী গফুর খানকে সুরুজ এলাকার কর্তৃত্ব প্রদান করে তাদেরকেও চুপ করিয়ে দেওয়া হল।

এখন শুধু সিন্ধিয়া এমন একজন প্রশাসক হিসাবে রয়ে গেলেন যার উপায় উপকরণে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি তবে স্যার জন ম্যাকলিমের ভাষায় তিনি নিজ কাজকর্মের দ্বারা তখন প্রমাণ করেছেন যে, এখন তার যাবতীয় সৎ সাহস স্তিমিত হয়ে গিয়েছে[১২৩]।

আমীর আলী খান থেকে সায়্যিদ সাহেবের বিচ্ছিন্নতা

আমীর আলী খান যুদ্ধ পরিত্যাগ করে ইংরেজদের কাছ থেকে টুংকের নবাবী গ্রহণে সায়্যিদ সাহেব সম্ম ছিলেন না।[১২৪] তিনি এর বিপরীত মতামত পেশ করেন। কিন্তু আমীর খান যখন সায়্যিদ সাহেবের রায় উপেক্ষা করে সন্ধির দিকে

অগ্রসর হচ্ছিলেন সায়্যিদ সাহেব তখনই তাকে নিজের বিদায়ীর প্রস্তাব দেন এবং সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই ১৮১৬ সালে তিনি দল পরিত্যাগ করে দিল্লী চলে আসেন[১২৫]।

নওয়াব আমীর আলী খান বস্তুত সায়্যিদ সাহেবকে নিজের পীরের মত আচরণ করে আসছিলেন। সায়্যিদ সাহেবের বিদায় তাকে গভীর মর্মাহত করে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধানর ও দূরত্ব ঘটে যাওয়ার পর সায়্যিদ সাহেবের পক্ষেও তার সংস্পর্শে অবস্থান অসম্ভব করে দিল। এতদসত্ত্বেও আমীর আলী খান নিজের শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশার্থে বিদায়ের মূহুর্তে যুবরাজ উযীরুদ্দৌলাকে হুকুম দিলেন সায়্যিদ সাহেবকে যেন দিল্লী পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া হয়।[১২৬]

যাই হোক ১৮১৮ সাল সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই ভারতবর্ষের দেশীয় সকল ছোট বড় শক্তি ইংরেজ সমীপে মস্তক অবনত করে দেয়। ইংরেজ আধিপত্যের পতাকা তখন সুদূর খায়বার থেকে রাজকুমারী পর্যন্ত এবং বোম্বাই থেকে আসাম ও বর্মার সমুদ্র তীর পর্যন্ত উড়তে থাকে। এখন সারা ভারতবর্ষে এমন আর কেউ অবশিষ্ট নেই যিনি ইংরেজ বাহাদুরের সম্মুখে মাথা উচিয়ে কথা বলতে সাহস করছে। তবে একটি শক্তি অতি ক্ষুদ্র হলেও এমন মানসিকতার অধিকারী ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ছিল যারা কোন বিকল্পেই ইংরেজ আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এটি ছিল সেই ক্ষুদ্র দল যেটি হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তাচেতনা ও তার নীতিমালার ওপর দন্ডায়মান, যারা فك كل نظام তথা পূর্নাঙ্গ ও সর্বাত্মক এক বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে বিগতকাল থেকেই চেষ্টা করে আসছে। তবে রাজনৈতিক নৈরাশ্যতার এ অন্ধকার যুগে পৌঁছে দলের বর্ষীয়ান নেতা হযরত শাহ আবদুল াাযীয নিজের বার্ধক্য, অসুস্থতা ও অন্ধত্ব সত্ত্বেও কোনরূপ দমিত না হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। নিজে পরিস্থিতির বিচারে বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি গ্রহণ করেন তারপর নিজের শিষ্য-শাগরিদ ও ভক্তবৃন্দের যাকে যে কাজের উপযুক্ত পেয়েছেন তাকে সেই কাজের জন্য নিয়োজিত করেন।

বিপ্লবী কর্মসূচির দায়িত্ব ও কর্মবন্টন

এক. হযরত সায়্যিদ আহমদ সাহেবের নেতৃত্বে একটি জামাআত গঠন করে দেওয়া হল। মাওলানা আবদুল হাই সাহেব ও মাওলানা ইসমাঈল (শহীদ) সাহেব এ জামাআতের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের

একান্ত উপদেষ্টা হিসাবে নির্ধারণ করা হল। এ জামাআতের ওপর নিম্নোক্ত দায়িত্ব অর্পিত হয়।

ক. সমগ্র দেশ সফর করে গণমানুষের মধ্যে বিপ্লবের প্রেরণা সৃষ্টি করা।

খ. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবক ভর্তি করা এবং তাদের জন্য সামরিক ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা।

গ. প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

ঘ. প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের সঙ্গে লিয়াঁজো কায়েম করা।

ঙ. সামরিক অভিযান তথা নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ পরিচালনা করা।

দুই. দ্বিতয়ি অপর একটি জামাআত গঠন করা হয় যার নেতৃত্ব স্বয়ং শাহ আবদুল আযীয নিজ হস্তে রেখে দেন। নিজের বর্ষীয়ান মুরীদ ও শাগরিদবৃন্দকে এ জামাআতের সদস্য হিসাবে মনোনীত করেন। এ জামাআতের দায়িত্বে নিম্নোক্ত কাজ অর্পিত ছিল ঃ

ক. কেন্দ্র সংরক্ষণ করা।

খ. তালীম ও তারবিয়্যাত তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের যে ধারাবাহিকতা শাহ ওয়ালী উল্লাহর আমল থেকে চলে আসছে সর্বাত্মক বিপ্লব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের স্বার্থে সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া।

গ. যখন প্রথম জামাআত রণক্ষেত্রে পৌঁছে যাবে তখন দেশের পরিস্থিতি তাদের অনুকূলবর্তী করে রাখার দায়িত্ব পালন করা এবং নতুন স্বেচ্ছাসেবক ও রসদ জোগাড় করে প্রথম দলের অভিভাককত্বের দায়িত্ব পালন করা।

দ্বিতীয় জামাআতে শাহ আবদুল আযীয (রহ) সহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন ঃ

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলবী মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব দেহলবী মুফতী রশীদুদ্দীন সাহেব দেহলবী মুফতী সদরুদ্দীন সাহেব দেহলবী মাওলানা হাসান আলী সাহেব লক্ষ্ণৌবী মাওলানা হোসাইন আহমদ সাহেব মালীহাবাদী মাওলানা শাহ আবদুল গনী দেহলবী।

নেতৃত্বে সায়্যিদ সাহেবকে নিয়োগের কারণ

মাওলানা আবদুল হাই ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল দেহলবী হযরত সায়্যিদ আহমদ অপেক্ষা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা[১২৭] রচনা ও বক্তৃতা, জনপ্রিয়তা ও বংশ

মর্যাদা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ছিলেন। এমনকি বয়সেও তারা উভয়ে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ) থেকে বড় ছিলেন। কারণ যখন সায়্যিদ সাহেবকে নেতা ঘোষণা দেওয়া হয় তখন তার বয়স মাত্র চল্লিশ বছরের কাছাকছি ছিল। অথচ মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের তখন ছিল পঞ্চাশ বছর আর মাওলানা ইসমাঈল শহীদের ছিল আটচল্লিশ বছর। বংশগতভাবে মাওলানা আবদুল হাই ছিলেন হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর নিজের জামাতা আর মাওলানা ইসমাঈল শহীদ নিজেরই ভাতৃষ্পুত্র এতদসত্ত্বেও সায়্যিদ সাহেবকে নেতৃত্ব প্রদানের কারণ হল যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা হযরত সায়্যিদ আহমদের অর্জিত ছিল যা অপর দুবুজর্গের কাছে অর্জিত ছিল না। তা চাড়া সবচেয়ে বড় কারণ যেটি তখন চিন্তা করা হয়েছে তা হল হযরত সায়্যিদ সাহেবের রূহানী কামালাত ও যোগ্যতা। কেননা রূহানী কামালাতের ক্ষেত্রে তিনি গোটা জামাআতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এমনকি সায়্যিদ সাহেবের পীর হযরত শাহ আবদুল আযীয নিজে নিজের সকল শিষ্য, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদেরকে এ কথা বলে উপদেশ দেন যে, তারা যেন নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অর্জনে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ থেকে উপদেশ গ্রহণ করেন।

বলা আবশ্যক যে, এক সবাত্মক বিপ্লব যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কেবল রাজনৈতিকই নয় বরং গোটা সমাজের সকল কুসংস্কারের সংশোধন করাও তার উদ্দেশ্য–সেই বিপ্লবের নেতৃত্ব কেবল কোন চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ কিংবা সেনাধ্যক্ষ দ্বারা সম্পাদিত হওয়ার নয়। এখানে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথের এমন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আবশ্যক যিনি যুগের শ্রেষ্ঠ বুযর্গ হিসাবে বিবেচিত হতে পারেন। হযরত সায়্যিদ সাহেবের মধ্যে সেই যোগ্যতা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতা সে কালের শীর্ষ স্থানীয় বিদগ্ধ আলিমদেরকেও তার প্রতি অনুরাগী করে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ডব্লিও ডব্লিও হান্টার লিখেন ঃ

> তার মুরীদগণ তার রূহানী ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তার নির্দেশিত তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ কাজ কর্মও নিঃসংকোচে পালন করে যায়। প্রভাবশালী উলামা (মাওলানা আবদুল হাই, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা ইনায়েত আলী, মাওলানা বেলায়েত আলী সহ আরও অনেকে)

নগন্য সেবকের মত নগ্ন পদে তার পাল্কীর পেছনে হেটে চলাকে নিজেদের জন্য গৌরবের বিষয় বলে মনে করে[১২৮]।

কার্যকরী পদক্ষেপ ঃ গণবিপ্লবের উদ্দীপক সফরসমূহ

গণমানুষের মনে তখন পরাজয়ের মর্মপীড়া তাদের চিন্তা-চেতনাকে উত্তপ্ত করে যাচ্ছিল। কিন্তু পরদেশী নির্দয় আগ্রাসী শক্তির দুর্দমনীয় সামরিক ক্ষমতার কারণে তারা মুখ খোলার সাহস পাচ্ছিল না। অন্যদিকে ওয়ালী উল্লাহী শিক্ষাগার থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীগণ দেশের স্থানে স্থানে পৌঁছে সর্বাত্মক সেই বিপ্লবের চেতনা গণমানুষের মন-মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল। মানুষের মনে এ সকল চেতনা উদ্রেকের পাশাপাশি যখন তারা নিয়মতান্ত্রিক একটি পার্টি গঠিত হওয়ার কথা জ্ঞাত হল তখন দেশের নানা স্থান থেকে আমন্ত্রনপত্র পৌঁছতে শুরু করে। সেমতে সফরের কর্মসূচি গৃহীত হল। একটানা সাত বছর পর্যন্ত এ জামাআত দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে প্রধানতঃ তিনটি বিশাল আকারের সফর করে[১২৯]।

সফরকারি এ জামায়াতের মূল পুঁজি ছিল মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, ত্যাগ ও কুরবানী, মানুষের প্রতি সমবেদনা, পারস্পরিক সহানুভূতি, ধৈর্য সহ্য, সত্য ও ন্যায়ের সমর্থন এবং কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে নিজেদের সর্বময় প্রচেষ্টা ও সাধনা। এ পুঁজির ভিত্তিমূলেই এবং এর ওপর আস্থা করেই তারা সফরে অবতীর্ণ হন।

টীকা

১১৫. পিন্ডারী নামক এ যোদ্ধা দলটি ছিল কতিপয় বাহাদুরের একটি দল। তারা অনিয়মিত বাহিনীর ন্যায় লুটপাট করত। কখনও কখনও প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হত। সুযোগ হয়ে উঠলে তারা রোহিলা, মারাঠা, উজবেক ও খালসা বাহিনীর ন্যায় নিজেরা নিয়মিত কোন সরকার গঠন করার মত ছিল। ১৭৯৪ সালে পিন্ডারীদের প্রধান দুই নেতাকে মধুজী সিন্ধিয়া নারবদা উপত্যকার জায়গীর দান করেন। এ নেতাদ্বয়ের মৃত্যুর কারণে তাদের সন্তান দোস্ত মুহাম্মদ ও ওয়াসিল মুহাম্মদ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে তাদের এক সর্দার করিম খান বলিষ্ঠ শক্তির অধিকারী হলে তিনি হোলকারের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করেন। ১৮০৬ সালে তিনি এগার পরগনার অধিপতি হন। এখান থেকে বাৎসরিক তার প্রায় পনর লক্ষ টাকা আমদানী হত। সিন্ধিয়া তাকে নওয়াব উপাধিতে ভূষিত করেন। ভূপালের কিয়দাংশও তিনি করায়ত্ব করে নিয়েছিলেন। ইত্যবসরে দৌলত রাও সিন্ধিয়া তার ওপর এক কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পাঁচ বছরের জন্য গোয়ালিয়র কারাগারে বন্দী রাখেন। তখন চীতু প্রচুর বিশ্বস্ততা অর্জনে সক্ষম হল। দোস্ত মুহাম্মদ ও ওয়াসিল মুহাম্মদের দলও তার সাথে যোগ দেয়। করিম খান ছয় লক্ষ টাকা দিয়ে কোনমতে উদ্ধার হন। ইংরেজরা রাজস্থানের হিন্দু রাজাদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের পর পিন্ডারী দমনের প্রতি মনোযোগ দেয়। তারপর একজন একজন করে তাদের সকল সর্দারকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে। ১৮১৩ সালে হামদার খান আত্মসমর্পন করেন। করিম খান ও ওয়াসিল মুহাম্মদকে গোরাখপুর ও গাজীপুরের কিয়দাংশ জায়গীর দান করে শান্ত করিয়ে দেওয়া হল। চীতু আত্মসমর্পন করেনি। শেষ অবধি যুদ্ধ চালিয়ে গেল। তার কাছে ছিল পনর সহস্র অশ্বারোহী যোদ্ধা। তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন এবং শেষ পর্যায়ে পরাজিত হলে জঙ্গলের দিকে পলায়ন করেন। ১৮১৭ সালে তিনি ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হন। চীতু প্রকৃতভাবে ছিলেন মেওয়াতী ও এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মুসলমান। (তারীখে ওয়াসতে হিন্দ, মেজর জেনারেল স্যার ম্যাকলম, খঃ ১ ; তারীখে ভূপাল ও সায়্যিদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসূল মিহির।

১১৬. দ্রষ্টব্য সিয়াসী তারীখে হিন্দ, মেজর জেনারেল স্যার ম্যাকলম।

১১৭. প্রাগুক্ত, লর্ড মিন্টুর শাসনামল অধ্যায়।

১১৮. তারীখে রাজগানে পাঞ্জাব গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, স্যার ল্যাপল গ্রীফম।

১১৯. সীয়াসী তারীখে হিন্দ, পরিশিষ্ট-৫, অভিজ্ঞতার বর্ণনা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ম্যাকলম।

১২০. সিয়াসী তারীখে হিন্দ, খঃ ১, মিস্টার জাঙ্কস-এর অভিজ্ঞতার বিবরণ, লর্ড হেস্টিংস-এর আমল।

১২১. মার্কস হেস্টিংস-এর নামে লিখিল মেজর জেনারেল স্যার জন ম্যাকলম-এর পত্রাবলি, তারিখ ১৭ই জুলাই ১৮১৭ সাল।

১২২. তারীখে ইন্দোর, কাফী খান রচিত।

১২৩. সিয়াসী তারীখে হিন্দ, খঃ ১, অধ্যায় ৭, অনুচ্ছেদ ৫৯২।

১২৪. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, নতুন এডিশন, খঃ ১, পৃঃ ৮৭।

১২৫. সাওয়ানিহে আহমদী, পৃঃ ১৯।

১২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

১২৭. জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল এই যে, স্বয়ং শাহ আবদুল আযীয যিনি সকল আলিমদের শিক্ষক তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

اینشاں در علم تفسیر حدیث وفقه واصول ومنطق وغیره از فقیر کمتر نستند ، مهر ودسقخط اینشاں وستخط فقیر است

অর্থাৎ তারা (মাওলানা আবদুল হাই ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ) তাফসীর, হাদীস, উসূল, ফিকহ, মানতিক ইত্যাদি শাস্ত্রে আমার অপেক্ষা কোন দিকে কম নয়। কাজেই তাদের দস্তখত ও সীল যেন আমারই দস্তখত ও সীল হিসাবে গণ্য।

হযরক শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর এ চিঠি যেখানে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য পেশ করেন এটি লক্ষ্ণৌর মুনশী খাইরুদ্দীনের নামে প্রেরিত ছিল। হজ্জ ফরয হওয়া সম্পর্কে তিনি এ পত্রটি লিখেছিলেন। (বিস্তারিত বিবরণ পরে আলোচিত হবে)। হযরত শাহ আবদুল আযীয এ চিঠিতে তাদের ব্যাপারে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন এটি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ যোগ্যতার সর্বোচ্চ সনদ বলা যায়। তাছাড়া তিনি মাওলানা আবদুল হাই সাহেবকে 'শায়খুল ইসলাম' ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' এবং উভয়কে 'তাজুল মুফাসসিরীন ফখরুল মুহাদ্দিসীন ও মুহাক্কিক আলিম ইত্যাদি উপাধিতে স্মরণ করেন। (দেখুন সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, খঃ ১, পৃঃ ৮৯) মাখযানে আহমদী।

১২৮. হামারী হিন্দস্তানী মুসলমান, পৃঃ ২২।

১২৯. মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী বলেন, ইমাম হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ) তার শিষ্য হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদকে প্রথম বার হিজরী ১২৩১ সালে মানুষকে তরীকতের পথে মুরীদ করানোর জন্য প্রেরণ করেন। তারপর দ্বিতীয়বার প্রেরণ করে ছিলেন তাদের কাছ থেকে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য। তারপর গোটা কাফেলাসহ হজ্জে বায়তুল্লাহর জন্য গমন করতে নির্দেশ দেন। লক্ষ্য ছিল যেন কাফেলা সাথীদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনের ওপর শক্তিশালী অভিজ্ঞতা অর্জিত হতে পারে। কিন্তু হজ্জের সফর থেকে হিজরী ১২৩৯ সালে যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন শাহ আবদুল আযীয আর জীবিত ছিলেন না (শাহ ওয়ালী উল্লাহ কী সিয়াসী তারীখ, পৃঃ ১৫৩)।

সায়্যিদ সাহেবের কাফেলার প্রথম অভিযাত্রা

দিল্লী থেকে রায়বেরেলী, রায়বেরেলী থেকে বানারস ও দিল্লী পর্যন্ত

ওয়ারেন হেস্টিংসের রূঢ় শাসননীতি দেশীয় রাজ্যগুলোর সিংহাসন ক্রমে টলিয়ে দিচ্ছিল। ইংরেজদের পক্ষ থেকে বাজীরাও পেশোয়া, নাগপুরের নবাব আপ্পা সাহেব ও পিন্ডারীদের বিরুদ্ধে পুনঃপুনঃ আক্রমণ অব্যাহত রাখা হল। হোলকার, নবাব আমীর আলী খান ও সিন্ধীয়ার বিরুদ্ধেও ফৌজী অবরোধ কায়েমের চেষ্টা চলতে থাকে[১৩০]। এহেন পরিস্থিতিতে দেশের জন্য দরদী ও মুক্তিকামীদের ক্ষুদ্র একটি দল যাদের সংখ্যা সর্বমোট পঞ্চাশের বেশি নয়–তখন ১২৩১/১৮১৮ সালে বিপ্লবের নতুন সংকল্প বুকে ধারন করে দিল্লী থেকে যাত্রা করে[১৪০]।

মুক্তিকামী এ দলটির চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সর্বাত্মকভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক একটি বিপ্লবের সাধন। তবে তারা তাদের প্রথম এ অভিযাত্রার বাহ্যিক উদ্দেশ্য হিসাবে কেবল সমাজ সংস্কারমূলক কাজকর্মকেই নির্ধারণ করে নেয়। কারণ তৎকালীন রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল সেই প্রেক্ষাপটে তাদেরকে এমনটি করা ব্যতিরেকে কোন বিকল্প ছিল না। কাফেলার মধ্যে হযরত সায়্যিদ সাহেব, মাওলানা আবদুল হাই সাহেব ও মাওলানা ইসমাঈল সাহেব সহ আরও যারা ছিলেন তাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন যেমন ঃ হযরত শাহ আহলুল্লাহ সাহেবের পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব (অর্থাৎ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের ভাতুষ্পুত্র), মৌলভী ওয়াজীহুদ্দীন সাহারানপুরী, মাওলানা ওয়াহীদুদ্দীন সাহেব, তদীয় ভ্রাতা হাফিয কুতবুদ্দীন সাহেব, হাকীম মুগীসুদ্দীন সাহেব সাহারানপুরী, হযরত শাহ গোলাম আলী সাহেবের পুত্র শাহ আবু সাঈদ সাহেব দেহলভী।

সায়্যিদ সাহেব দিল্লীর উত্তর দিক থেকে যাত্রা শুরু করেন। তারপর গাযীউদ্দীন নগর (বর্তমান গাযিয়াবাদ), মুরাদনগর, মীরাঠ, সারধুনা, বড়হানা,

ফুলত, মুযাফফর নগর, দেওবন্দ ও সাহারানপু হয়ে গুড়মিকটীসর গিয়ে পৌঁছেন। সেখান থেকে পনরায় রামপুর ও বেরেলী হয়ে শাহজাহানপুর চলে যান। এ সফর সমাপ্ত করতে হযরতের আনুমানিক চার মাস সময় লেগেছিল। সফরের কর্মসূচি জারী থাকাকালেই তাঁর কাছে সংবাদ পৌছল যে, তার সহোদর ভাই সায়্যিদ ইসহাক সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি সম্মুখ যাত্রা ক্ষান্ত করে নিজ বাড়ি বেরেলী রওয়ানা হন। তখন কাফেলার সকলেই তার সঙ্গে বিদ্যমান। কাফেলার ততদিনে সদস্যদের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে বেড়ে গিয়ে আশি সংখ্যকে পরিণত হয়েছিল।

বলা বাহুল্য হযরত সায়্যিদ সাহেব হঠাৎ সম্মুখ যাত্রা ক্ষান্ত করে বাড়ি প্রত্যাবর্তন শুধু পারিবারিক প্রয়োজনেই করেছিলেন তা নয়, আন্দোলনের মহৎ উদ্দেশ্যও তাতে নিহিত ছিল। কারণ নতুন ভাবে সংযুক্ত সঙ্গীদেরকে তিনি কিছু দিন পর্যন্ত নিজ খানকায় অবস্থানপূর্বক দীক্ষাদানের বেশ প্রয়োজনবোধ করে ছিলেন। সেমতে বাড়ি পৌঁছে তিনি রায়বেরেলীতে অবস্থিত নিজেদের পারিবারিক খানকায় (তাকিয়ায়ে শাহ ইলমুল্লাহ) কয়েক মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। তাতে সঙ্গী সাথীদের মধ্যে কর্মের নতুন স্পন্দন জেগে উঠেছিল। ইত্যবসরে সে সকল লোকজনও এখানে এসে হযরতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেল যারা সফর কালে আন্তরিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তার সফরসঙ্গী হওয়ার সুযোগ পায় নি। এভাবে নবাগতদের দ্বারা এ কয়েক মাসে কাফেলার সঙ্গীদের সংখ্যা একশত সত্তর জন পর্যন্ত উন্নীত হল। এখানে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত অবস্থান করার আরও একটি সুফল এটি দাঁড়িয়ে ছিল যে, হযরত সায়্যিদ সাহেবের ব্যতিক্রমধর্মী এ কাফেলার চর্চা সমগ্র অযোধ্যা, কানপুরের জেলা সমূহ, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এদিকে আসতে শুরু করে। কয়েক মাস অবস্থানের পর সায়্যিদ সাহেব বায়বেরেলী থেকে এলাহাবাদের দিকে যাত্রা করেন। বিভিন্ন গ্রাম ও গঞ্জে অল্প সময়ের অবস্থান করে এক মাসের মধ্যেই তিনি এলাহাবাদ গিয়ে পৌছেন। তারপর এলাহাবাদ থেকে কানপুর, বানারস, সুলতানপুর প্রভৃতি স্থান হয়ে নিজবাড়ি বায়বেরেলী প্রত্যাবর্তন করেন। সে বারে প্রায় দু সপ্তাহ যাবৎ বাড়ি অবস্থানের পর সুবা অযোধ্যার রাজধানী অর্থাৎ লক্ষ্মৌর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সমাজ সংস্কার ও মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য প্রশিক্ষণ দান।

হযরত সায়্যিদ সাহেব তাঁর এ সফরে সামাজিক নানা কুসংস্কার ও অনাচারের সংশোধনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যেমন ঃ সাহারানপুর পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন যে, এখানে নিম্নশ্রেণীর লোকজন সামাজিকভাবে বিভিন্ন উৎপীড়নের শিকার হয়ে আছে। যেমন ঃ এক. নিম্নশ্রেণীর কেউ সে সকল খাদ্য-দ্রব্য পাক নিষেধ ছিল যা সাধারণতঃ আমীর উমারা ও অভিজাত শ্রেণীর ঘরে বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পাকানো হত। দুই. নিম্নশ্রেণীর লোকের অভিজাত শ্রেণীর কাউকে দাওয়াত করতে পারত না। তিন. তাদের সন্তান-সন্তুতির নাম রাখার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা ছিল অর্থাৎ অভিজাতদের কারুর নাম তাদের সন্তানদের জন্য রাখা নিষিদ্ধ ছিল।

সায়্যিদ সাহেবের কাফেলা সাহারানপুর পৌঁছে সর্বাগ্রে এ ব্যাধি সংশোধন করার প্রতি মনোযোগ দেন। তাতে কাফেলার ২০ দিন ব্যয় হয়েছিল কিন্তু ফলাফল দাঁড়াল যে, এ বিভেদ নীতি এভাবে প্রশমিত হল যে, বর্তমানে সে সবের আলোচনা করাও কাহিনী কিংবা রূপকথা বলে মনে হয়।

দেওবন্দে শায়খ হাফীযুল্লাহ সাহেবের সম্ভ্রান্ত পরিবারেও 'আসসালামু আলাইকুমের' স্থলে 'আদাব' বন্দেগী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার চালু হয়ে গিয়েছিল। একজন অন্য জনকে সাক্ষাতের সময় 'আদাব নিবেদন করছি' কিংবা 'বন্দেগী নিবেদন করছি' ইত্যাকার বাক্য নিঃসন্দেহে পরস্পরের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনকে প্রকাশ করে। কিন্তু এ পদ্ধতি ইসলামের পদ্ধতি নয়। ইসলামের স্বীকৃত পদ্ধতি হল ' আসসালামু আলাইকুম' বলা। উল্লেখ্য যে, 'আসসালামু আলাইকুম' বাক্য প্রচলিত করার দ্বারা ইসলাম মানুষের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও অভেদ নীতির দীক্ষা দিয়েছিল। এতদস্থলে আদাব বা বন্দেগী এ জাতীয় শব্দ চালু হওয়ার দ্বারা মুসলিম সমাজের সেই সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব চেতনা ভুলুণ্ঠিত হতে শুরু করে। অভিজাত মহল তাদেরকে সাধারণ শ্রেণীর কেউ 'আসসালামু আলাইকুম' বলবে–এ কথা তারা পছন্দ করতেন না। কারণ তাদের চিন্তাধারা ছিল যে, এটি কেবল সমমানের ও সমান শ্রেণীর একজন অপর জনের অভিবাধনের জন্য বলবে। পক্ষান্তরে যারা ছোট তারা বড়দেরকে সাক্ষাতের সময় 'আদাব নিবেদন করছি' কিংবা বন্দেগী নিবেদন করছি এ জাতীয় বাক্য বলতে হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে সমাজ থেকে সালামের পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটতে থাকে আর সে জায়গায় আদাব নিবেদন চালু হয়।

ছোটরা বড়দেরকে, সন্তান পিতাকে, ছোট ভাই তার বড় ভাইয়ের জন্য এভাবে সালামের পরিবর্তে আদাবের ব্যবহার করতে থাকে। তাছাড়া যেহেতু মানুষ লৌকিকভাবে নিজেকে ছোট বলে দেখায়, সেই সূত্রে বড়রাও সালামের সময় ছোটদেরকে 'আদাব নিবেদন' বলতে থাকে। অবশ্য 'বন্দেগী নিবেদন' বাক্যটি কেবল নিম্নশ্রেণীর ব্যবহারে জন্য অবশিষ্ট রয়ে যায়।

সায়্যিদ সাহেবের এই বিপ্লবী দলের অন্যতম মৌল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ পুনর্জাগরিত করা এবং মানুষের মস্তিষ্ক থেকে শ্রেণী বৈষম্য ও বিভেদ নীতির যাবতীয় বিষাক্ত জীবাণু বিদূরীত করা। তাই এ বিপ্লবীরা প্রথমতঃ নিজেদের খান্দানগুলো থেকে এ সকল কুপ্রথা বিলুপ্ত করার উদ্যোগ নেন। তারপর সমাজের যেখানে যেখানে এ ব্যাধি বিদ্যমান দেখেছেন সেখানেই এটি সংশোধন করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তারা দেওবন্দে পৌঁছে শায়খ সাহেবের পরিবারে এ কুপ্রথা দেখতে পেয়ে এখানেও এ প্রথা মওকুফ করে দেন। হযরত সায়্যিদ সহেবের সেই মেহনতের কারণে বর্তমানে দেওবন্দের এক খান্দানই নয় বরং প্রতিটি খান্দানের মধ্যেই আসসালামু আলাইকুম এমনভাবে প্রচলিত হয়েছে যে, কোনকালে তাদের মধ্যে এতদভিন্ন অন্য কোন অভিবাধন নীতি চালু ছিল বলে—কল্পনাও করা যায় না। তবে হিন্দু কোন পরিচিতের সাক্ষাতে 'আদাব আরজ' শব্দটি বলা হয়ে থাকে।

হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

হযরত সায়্যিদ সাহেবের এই ব্যতিক্রমধর্মী কাফেলা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের চোখেই ইজ্জত ও সম্মানের পাত্র বিবেচিত ছিল। এই কাফেলা পথিমধ্যে গাযীউদ্দীন নগরে গিয়ে উঠলে যে সকল মানুষ কাফেলার প্রতি ভক্তি ও আন্তরিকতা প্রকাশার্থে বিভিন্ন হাদিয়া তোহফা পেশ করেছিল তাদের মধ্যে স্থানীয় তহসীলদার শ্রী হরিরাম সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে[১৩২]।

সাহারানপুর শহরে এ কাফেলা বেশ অনেক দিন পর্যন্ত অবস্থান অব্যাহত রেখেছিল। ফলে মুসলমানদের দেখাদেখি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা কাফেলার ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। একবার সায়্যিদ সাহেব নিজেও তাদের মহল্লায় গমন করেন। তাদের সাথে আহার গ্রহণে শরীক হন। প্রসঙ্গতঃ এখানে তহসীলদার ধোকল

সিং-এর বাড়ি দাওয়াত গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

একদিন সাহারানপুরের স্থানীয় তহসীলদার ধোকল সিং আসলেন। তিনি দুয়ারে দাঁড়ানো অবস্থায়ই বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'এ অধমের বাড়িতে জনাবের নিমন্ত্রণ'। সায়্যিদ সাহেব বললেন, আপনি বসুন। তিনি বললেন, না ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নিমন্ত্রণ গৃহীত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বসব না। সায়্যিদ সাহেব বললেন, ঠিক আছে, আপনার নিমন্ত্রণ গৃহীত হল। তহসীলদার বসলেন। তারপর বললেন, তাহলে আগামীকাল কোন সময়ে আমি আপনার জন্য সাওয়ারী নিয়ে উপস্থিত হতে পারি ? সায়্যিদ সাহেব বললেন, সকাল হওয়ার পর ঘণ্টা দুয়েক, পরে আপনি কাউকে পাঠিয়ে দিবেন। তাহলে আমরা পৌঁছে যাবো। সেমতে পরবর্তী দিন তহসীলদার সাহেব নির্ধারিত সময়ে নিজের দুইশত পাইক পেয়াদাসহ উপস্থিত হন। তাদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম। সায়্যিদ সাহেব সাওয়ারীতে আরোহণ করে তহসীলদারের বাড়ি যান। তহসীলদারের সাথে যে সকল মুসলিম কর্মচারী এখানে এসেছিল তাদের সকলেই তখন সায়্যিদ সাহেবের হাতে মুরীদ হল। তিনি আগত অতিথি আপ্যায়নের জন্য উচ্চমানের আয়োজন করেন। বিভিন্ন রকমের আহার সামগ্রী রান্না করে আহার করান। আহার শেষে নানা সুগন্ধী ও পান সুপারীও পেশ করেছিলেন। সন্ধ্যার দিকে পুনরায় উপস্থিত হয়ে কাফেলার সকল সদস্যকে নিজ বাড়ি নিয়ে যান। এ সময় পোলাও, জর্দা ও বিভিন্ন রকমের মিষ্টান্ন দ্বারা তাদের আতিথেয়তা করেন। এভাবে তখন তহসীলদার তাদের প্রতি আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বিনয় ও দিলদারী প্রকাশের কোন ক্ষেত্রেই কোন ত্রুটি রাখেননি[১৩৩]।

ব্যায়াম ও চান্দমারীর অনুশীলন

হযরত সায়্যিদ সাহেবের এ কাফেলায় যেভাবে সমাজ সংস্কার ও আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন কর্মসূচি চালু ছিল অনুরূপে সিপাহী সুলভ নানা রকমের ব্যায়াম ও অনুশীলন কর্মসূচিও অব্যাহত ছিল। ফুলত কামরায় হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের গ্রামের বাড়ি বিধায় সেখানে দুই সপ্তাহ যাবৎ অবস্থানের সুযোগ হয়েছিল। তখন মাটির স্তুপ দিয়ে রীতিমত একটি টিলার মত বানিয়ে নেয়া হল। কাফেলার সঙ্গীগণ এখানে হাত সইয়ের অনুশীলন করতে থাকে। নিয়ম ছিল যে,

প্রথমতঃ ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত শারীরিক ব্যায়াম চলত। তারপর শরীর মালিশের কাজ শেষ করে হাত সইয়ের প্রশিক্ষণ চলত।

লক্ষ্ণৌ শহরে অবস্থান করার মেয়াদ প্রায় তিন মাস পর্যন্ত ছিল। এ সময় অবস্থানস্থল থেকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হলে প্রায়ই তিনি সামরিক বাহিনীর ন্যায় পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় বের হতেন। একদিন তিনি কান্দাহারী লোকদের ছাউনীতে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি নিজেও অস্ত্রসজ্জিত আর সঙ্গীদের যারা তার সঙ্গে ছিলেন তারাও সজ্জিত অবস্থায় রওয়ানা হন। এ অবস্থা দেখে খান আবদুল বাকী সাহেব হযরতকে বললেন, হযরত ! আপনার সব কিছুই ভাল লাগে। তবে এই যে তরবারী, বন্দুক ইত্যাদি সঙ্গে রাখা এগুলো হল জাহেলী সভ্যতা। এগুলো আপনার শরীরের জন্য শোভনীয় নয়। তাছাড়া আপনি পারিবারিক দিক থেকে যে সম্ভ্রান্ত খান্দানের জ্যোতিষ্ক হিসাবে মানুষের কাছে পরিচিত–এ সব অস্ত্রসস্ত্র সঙ্গে করে হাটা সে খান্দানের ঐতিহ্য বিরোধীও বটে। খান আবদুল বাকী সাহেবের কথায় তাঁর মুখমন্ডল ক্রোধে লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলতে লাগলেন, যে জিনিস প্রিয়নবী (সা) নিজে ব্যবহার করেছেন সেটিকে আপনি জাহেলী সভ্যতা বলে আখ্যা দিলেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) অস্ত্রসজ্জিত হয়ে রণক্ষেত্রে তশরীফ নিয়ে গেছেন আর আপনি অস্ত্রসজ্জিত হওয়াকে বুযুর্গানে দীনের জন্য লজ্জাষ্কর বিষয় ভাবছেন ? ধিক এহেন বুযুর্গীর ওপর[১৩৪]।

পরিশ্রম ও ধৈযসহ্য

রায়বেরেলীতে হযরতের অবস্থান কয়েক মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময়কার অবস্থা সম্পর্কে জীবনীকারদের সকলের ঐক্যবদ্ধ বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

‘এ সময়ের অবস্থান ছিল এক বিষ্ময়কর উদ্যম ও উদ্দীপনার অবস্থান, অমৃতের আস্বাদন মধুরিমা গ্রহণ ও শ্রম সাধনার অবস্থান। ইসলামের প্রথম যুগে মদীনায় মুহাজিরদের অবস্থানই ছিল এর উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। সায়্যিদ সাহেব ও সাথীবৃন্দ যাদের মধ্যে ভারতবর্ষের শীর্ষ স্থানীয় আলেম উলামা ও খ্যাতিমান পীর মাশায়েখও বিদ্যমান–সকলে সীমাহীন আগ্রহ ও উদ্দীপনাসহ নিজ হাতে কঠিন কঠিন কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। তাঁরা কাঠ কেটে লাকড়ী সংগ্রহ করছেন, ঘাসপাতা জোগাড় করছেন, মাথায় করে ইটের বোঝা বহন করছেন, আবার নিজ হাতে মসজিদ নির্মাণের কাজ করছেন ইত্যাদি। নিজেদের মধ্যে অনাহার অর্ধাহার

চলছে অথচ এতদসত্ত্বেও সবাই প্রফুল্লচিত্ত। তাদের মধ্যে অনেক বড় বড় খান্দানের লোকজনও বিদ্যমান। অবস্থাপন্ন আমীর ও জমিদারদের সন্তানরাও আছেন। মুজাহিদদের এ দলে এমন লোকজনও ছিলেন দেশে যাদের হাজার হাজার ভক্ত ও মুরীদ বিদ্যমান। তারা সকলে নিজ নিজ ঘরবাড়ি, আরাম-আয়েশ, গদী-পীরগীরী সবকিছু ত্যাগ করে এখানে সায়্যিদ সাহেবের দুয়ারে পড়ে রয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ শাহ আবদুর রহীম সাহেবের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষে তার ভক্তবৃন্দের সংখ্যা কয়েক সহস্র হবে। অথচ তিনি সে সকল সেবা উপভোগ ত্যাগ করে এখানে নগন্য একজন সেবক হয়ে থাকছেন। মানুষকে মুরীদ করা ছেড়ে দিয়ে নিজেই অন্যের মুরীদ হয়ে সাধনাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। অনুরূপভাবে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ফুলতী মখদূমে জাহান, অলীউল্লাহী খান্দানের কৃতি সন্তান মাওলানা আবদুল হাই সাহেব, মাওলানা ইসমাঈল সাহেব প্রমুখের নামও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে[১৩৫]।

স্বয়ং এ কাফেলার অধিনায়ক অর্থাৎ হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ)-এর নিজের অবস্থা ছিল ;

তিনি সাধারণ লোকজনের সাথে মিলে নিজেও কষ্টসাধ্য ও শ্রমের কাজসমূহ আঞ্জাম দিতেন। নিজে কাঠ কাটতেন ও বোঝা মাথায় করে আনতেন।

কাফেলার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য কারুর কাছে কোন কিছু চাওয়া বা হাতপাতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। আইন ছিল যে, যে ব্যক্তি কোন কিছুর জন্য কারুর কাছে প্রার্থনার হাত বাড়াবে সে এ কাফেলার সদস্য হিসাবে থাকতে পারবে না। তার সদস্যপদ নষ্ট হয়ে যাবে। দলের হাতে কোন অর্থ না থাকলে এ নীতি তখন অনাহার গ্রহণের আকারে প্রতিফলিত হয়ে উঠত। বলা-বাহুল্য অনাহার যাতনাকে সয়ে নিতে সক্ষম হওয়া এমনই একটি যোগ্যতার সৃষ্টি করে যে, ব্যক্তি তখন কঠিন থেকে কঠিনতর কোন বিপদের সামনেও ধৈর্য হারা হয় না।

মহান আল্লাহর পথের এ সৈনিক দল ক্ষুধা ও অনাহার যাতনাকে এতখানি সহজ করে নিয়েছিল যে, এটি তাদের সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। এক সঙ্গে কয়েক বেলা পর্যন্ত অনাহারে থেকেও নিজেদের উৎফুল্ল চিত্ততার মধ্যে বিন্দুমাত্র তফাৎ আসত না।

মাওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব ছিলেন হযরত সায়্যিদ আহমদ সাহেবের ভ্রাতূষ্পুত্র। 'মাখযানে আহমদী' নামক সায়্যিদ আহমদ শহীদ-এর জীবনী গ্রন্থটি তিনিই রচনা করেছিলেন। এই মাওলানা মোহাম্মদ আলী নিজেও কাফেলার এক সদস্য ছিলেন। তার কাফেলা জীবনের প্রথম দিকেই অনাহারের ঘটনা শুরু হল। ঘটনাক্রমে সেই দিনটি ছিল ঝড়বৃষ্টির দিন। অনাহার ও ঝড়বৃষ্টি উভয়ের কষ্ট একসঙ্গে দেখা দিল। ঝড়ও থামছে না ফলে অনাহার থেকে উদ্ধার লাভেরও কোন ব্যবস্থা হয়ে উঠছে না। মাওলানা সাহেব কাফেলার নবাগত ব্যক্তি। ক্ষুধার যাতনায় তিনি সম্পূর্ণ অস্থির হয়ে আছেন। কিন্তু পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তার বিস্ময়ের সীমা ছিল না যে, তিনি ক্ষুধা ও অনাহারের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন অথচ সায়্যিদ সাহেব ও তাঁর সাথীগণ একই যন্ত্রণার তীব্র শিকার হয়েও নিজেদের মধ্যে এতখানি হাসি-আনন্দ, উৎফুল্লতা ও প্রাণ-চাঞ্চল্যতা বিদ্যমান যে, এখানে কোন অনাহার যাতনা আছে বলেও সন্দেহ করা যায় না[১৩৬]।

বাস্তব কথা হল যারা অনাহার যাপন করাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নেন তাদের পক্ষে উদরের এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ খেয়ে সময় পার করে দেয়া আদৌ কোন ব্যাপার নয়। হযরতের জীবনী গ্রন্থে এমন বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে সামান্য পরিমাণের আহার বহু সংখ্যক মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

জীবনীকারগণ এ সকল ঘটনাকে তার 'কারামত' বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আসল কথা হল এটি তার একার নয়, কাফেলার সদস্য সকলের কারামত বটে। কারণ সদস্যদের সকলেই অনাহারকে সাদরে বরণ করতে শিখে গিয়ে ছিলেন এবং ক্ষুধার্ত উদরে নিজ কর্ম চালিয়ে যেতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলেন[১৩৭]।

এ ক্ষেত্রে আরও একটি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। সেটি হল প্রিয়নবী (সা) একজন মুমিন বান্দার শান সম্পর্কে যে সকল কথা বলে গিয়েছেন সেগুলো এ কাফেলার সদস্যদের সাধারণ অভ্যাসের আকার ধারন করেছিল। প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন, একজন মুমিনের জন্য কোমর সোজা রাখতে পারে এত অল্প পরিমাণের কয়েক লোকমা আহারই যথেষ্ট হয়। যদি এতটুকুর ওপর সে যথেষ্ট না হয় তাহলে সে উদরের মাত্র এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত আহার করবে। অবশিষ্ট

অংশ পানি ও শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে[১৩৮]। কোন সন্দেহ নেই এ নীতিই কাফেলার সদস্যদের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল।

এ প্রশিক্ষণালয়ের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল সরল ও সাদাসিদা জীবন যাপন এবং যে কোন ধরনের পরিস্থিতি সহ্য করে নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করা। এ বিষয়টির একটি মনোগ্রাহী উদাহরণের জন্য নিম্নোক্ত ঘটনাটি লক্ষ্যণীয়ঃ

কাফেলা যখন রায়বেরেলী থেকে এলাহাবাদের দিকে যাচ্ছিল তখন পথিমধ্যে এক জায়গায় অবস্থান করতে হল। সেখানে আলোর কোন ব্যবস্থা করা গেল না। অনেক কষ্টে খিচুড়ী পাকানো হল। থালাবাটি কিছুই সঙ্গে নেই। ফলে একটি কুপের পাকা করা ঘের পানি দিয়ে ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করা হল। তারপর পাকানো খিচুড়ী তার ওপর ঢেলে দেয়া হল। আল্লাহর পথের দরবেশগণ সন্তুষ্টচিত্তে সেখান থেকেই খেয়ে ধেয়ে নিজ নিজ যিকির অযীফায় লিপ্ত হন[১৩৯]

এলাহাবাদ পৌঁছার পর শায়খ গোলাম আলী সাহেব সায়্যিদ সাহেবকে বেশকিছু মূল্যবান হাদিয়া প্রদান করেন। তন্মধ্যে উচ্চমূল্যের একটি কার্পেটিও ছিল। হাদিয়ার মালামাল জিহাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের কাজে লাগানো হল। আর কার্পেটটির ব্যাপারে শায়খ সাহেবের মনঃসন্তুষ্টির জন্য সায়্যিদ সাহেব একবারের জন্য তার ওপর উপবেশন করেন। অতঃপর সঙ্গীদের একজন জানালেন যে, তার কাছে ব্যবহারের জন্য কোন লেপ নেই। কাজেই সায়্যিদ সাহেব কার্পেটটি তুলে তাকে দিয়ে দিলেন[১৪০]।

বানারস যাওয়ার পর তৈমুরী শাহজাদা তাঁর হাতে মুরীদ হলে তিনি হযরতকে অতি মূল্যবান কিছু বস্ত্র হাদিয়া দেন। সায়্যিদ সাহেব নিজের খাজাঞ্চির ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবকে নির্দেশ দিলেন যে, এ বস্ত্র বিক্রি করে গাড় বর্ণের সস্তা কাপড়ের থান কিনে আন এবং সাথীদের সকলের মধ্যে বণ্টন করে দাওয়। তাহলে সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে জামা কাপড় তৈরী করে নিতে পারবে[১৪১]।

জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ

লক্ষ্ণৌ শহরে অবস্থানকালে একবার বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ হযরতের হাতে মুরীদ হল। মুরীদ হওয়ার পর তারা হযরতের কাছে তাবারুকের জন্য আবেদন করলে তিনি বরকতের জন্য তাদেরকে কিছু টাকা পয়সা দেন। তারপর উপদেশ

দিয়ে বললেন ঃ বাড়ি পৌঁছে সবাই নিজ নিজ বিবিদেরকে তাগিদ দিয়ে বলবে তারা যেন কোনরূপ শিরক কর্মে লিপ্ত না হয়। আর আল্লাহ্ পাক যখন তোমাদের জন্য রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করে দিবেন তখন তোমরা জিহাদ ফী সাবীলিল্লার জন্য খালিস মনে প্রস্তুত হয়ে যাবে। জান দ্বারা হোক কিংবা অর্থ-সম্পদদ্বারা। তবে নিয়্যত খালিস না রাখলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ্ হবে। কথাটি ভালভাবে বুঝে নাও।

তারা উত্তর দিল হযরত, আমরা খালিস মনে জিহাদের জন্য যদি নিয়্যত করে নেই এবং জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ি তা হলে এখানে আমাদের পরিবার-পরিজনের খোঁজখবর রাখবে কে ? কে তাদের আহার বিহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করবে ? আমরা মাল-সম্পদের দ্বারা জিহাদের নিয়্যত করতে পারি। কিন্তু আমাদের হাতে তো সম্পদ কিছুই নেই। তিনি বললেন, আল্লাহ্পাক যখন তোমাদেরকে ধন-সম্পদ দিবেন তখনই তোমাদের জন্য এ নির্দেশ। অন্যথায় এ নির্দেশ নয়। পরে সকলেই অঙ্গীকার ব্যক্ত করল যে, ইনশাআল্লাহ্ আমরা এমনই করবো[১৪২]।

লক্ষ্ণৌতে আমানুল্লাহ্ খান, সোবহান খান, মির্জা হুমায়ূন বেগ, গোলাম রসূল খান, গোলাম হায়দর খান, ও সদর খান প্রমুখের একটি সংঘবদ্ধ দল ছিল। চুরি-ডাকাতি ও লুণ্ঠন কাজে এরা সিদ্ধহস্ত ছিল। কাফেলার প্রসিদ্ধির কথা শুনে একদিন আমানুল্লাহ্ খান ও সোবহান খান কাফেলার লোকদেরকে দেখার জন্য এখানে এসেছিল। তারা সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গেল। তিনি তাদেরকে উপদেশমূলক কিছু কথাবার্তা বললেন। এই প্রথম সাক্ষাতের সামান্য কয়েকটি উপদেশই তাদের জীবনের মোড় অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়। তারা নিজেদের বিগত জীবনের যাবতীয় মন্দকর্ম থেকে তাওবা করে রীতিমত কাফেলার সঙ্গে শরীক হয়ে গেল।

তাদের আত্মশুদ্ধি অবলোকন করে দলের অন্যান্য সঙ্গীরাও প্রভাবিত হয়। ফলে তারাও সায়্যিদ সাহেবের খেদমতে সাক্ষাৎ করে নিজেদের মন্দকর্মগুলো থেকে তওবা করে। সায়্যিদ সাহেব লক্ষ্ণৌর অবস্থান সমাপ্ত করে চলে যাওয়ার সময় তারা হযরতের সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। সায়্যিদ

সাহেব বললেন, বর্তমানে তোমরা নিজ নিজ বাড়ি ঘরে থাকো। আমরা যখন হিযরত করবো তখন আমরা তোমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো[১৪৩]।

ফকীর মুহাম্মদ খান ছিলেন একজন রেসালদার। (বেসরকারী সেনাধ্যক্ষ) তার অধীনে প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা চাকুরী করত। তাদের সকলেই সায়্যিদ সাহেবের হাতে মুরীদ ছিল। তিনি তার মুরীদ গোলাম রাসূল খানসহ আরও অনেককে এ বাহিনীতে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন[১৪৪]। এ প্রক্রিয়ায় সায়্যিদ সাহেব মুরীদদের জন্য বৈধ উপায়ে রুজী রোজগারের ব্যবস্থাও করতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণদানের কাজও হয়ে যেত।

অনুরূপভাবে মহিলাদের মধ্যেও দীক্ষাদান ও মুরীদ করানোর ধারা অব্যাহত থাকে। তাদেরকেও তিনি আত্মশুদ্ধির বিশেষ বিশেষ সবক প্রদানের পর ফকীর মুহাম্মদ খানের বাহিনীতে ভর্তি করে দেন[১৪৫]। লক্ষ্ণৌ অবস্থানকালে স্বয়ং সায়্যিদ সাহেবের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ ঃ

অধিকাংশ সময় তিনি অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় তাকতেন। যেন সাথীদের মাঝে এ বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করতে পারে। তারা আন্তরিকভাবে যেন অস্ত্রসজ্জিত থাকার প্রতি মনোযোগী হন। জনৈক মুরীদের হাতে তিনি একবার একটি ছোট সাইজের বন্দুক তুলে দিয়ে বলেছিলেন, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর নিয়্যতে অস্ত্র ধারন কর। পেট পুরে আহার কর। তারপর অস্ত্র ব্যবহারের অনুশীলন চালিয়ে যাও। এ অপেক্ষা বড় কোন ফকীরী কিংবা দরবেশী আর অন্য কোনটি নয়।

ওয়াকায়িয়ে আহমাদী গ্রন্থের লেখক বলেন ঃ হযরতের অধিকরত মনোযোগ নিবন্ধিত ছিল জিহাদের ওপর সুঠাম ও শক্তিশালী কাউকে দেখলে তিনি বলতেন,এ লোকটি আমাদের কাজের জন্য উপযুক্ত হবে। মুরাইন এলাকা থেকে শমশের খান, আল্লাহ বখশ, শায়খ রমজান ও মেহেরবান খান হযরতের সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হল। এদের সকলেই ছিল সুঠামদেহী যুবক। তিনি তাদেরকে দেখে খুবই আনন্দিত হন। এবং বললেন, এ ধরনের যুবকরাই আমাদের বেশি কাজে লাগবে। পীরজাদা লোকদের দ্বারা আমাদের খুব বেশি কাজ হবে না। তারপর যুবকদের তিনি প্রশংসা করেন। তারা সায়্যিদ সাহেবের আচরণে মুগ্ধ হল এবং মুরীদ হয়ে তার হালকার অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল[১৪৬]।

এভাবে ক্রমে ক্রমে সায়্যিদ সাহেবের ক্যাম্প একটি সামরিক ট্রেনিং ক্যাম্পের আকার ধারন করল। সাথী সঙ্গীগণ এতদিন যে সময়টুকু তসবীহ-তাহলীল যিকির-মুরাকাবা ইত্যাকার রিয়াযতের মধ্যে ব্যয় করতেন এ সময়টি তারা এখন যুদ্ধের কলা-কৌশল শেখা ও প্যারেড করার কাজে ব্যয় করতে লাগলেন। আমলের ক্ষেত্রে এহেন পরিবর্তন কতিপয়ের মনে অতিশয় কর্ম বলে সন্দেহ হল। কাজেই তাদের একটি প্রতিনিধি দল হযরত সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়ে নিজেদের এ সন্দেহ রোধের কথা প্রকাশ করেন। সায়্যিদ সাহেব তাদেরকে বললেন, এ সকল সমর কলা-কৌশলের অনুশীলন করা বাহ্য দৃষ্টিতে জড় বিষয়ক কাজ বলে মনে হতে পারে। তবে এ সকল কিছু করার উদ্দেশ্য কোন জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধি কিংবা নেতৃত্ব অর্জন করা নয়। এতে আমাদের উদ্দেশ্য হল গণমানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধন, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের সাহায্যদান এবং মানবতার উন্নত ও মহান উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নিজেদেরকে উৎসর্গীত করা। কোন সন্দেহ নেই যে, তাসাউফ ও সুলকের অনুশীলন এবং দরবেশী জীবন যাপন করার চুড়ান্ত উদ্দেশ্যও হল এটি। যে তাসাউফ এ মহান উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত সেটি নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। অতএব এ জাতীয় কাজকর্মের অনুশীলনে জড়িত থাকা আধ্যাত্মিকতা থেকে সরে পড়া নয় বরং আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে দেখানোর জন্য সমকালের শীর্ষ স্থানীয় সুফী বুযুর্গ হযরত শাহ আবদুর রহীম বেলায়েতী সাহেবের উদ্ধৃতি দেন। তিনি (বেলায়েতী সাহেব) একজন খ্যাতিমান বুযুর্গ যার হাজার হাজার ভক্ত ও মুরীদ বিদ্যমান ছিল। সায়্যিদ সাহেব সাহারানপুর অবস্থানকালে তিনি তার কাফেলার সঙ্গে যোগ দেন। সায়্যিদ সাহেব সম্পর্কে তিনি মন্তব্য কনেন ঃ

সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি আমার সকল ভক্তবৃন্দ ও মুরীদদেরকে বলে দিয়েছি যে, বর্তমানকালে আধ্যাত্মিকতার অধ্যায়ে সফলতা অর্জন করার জন্য একমাত্র পদ্ধতি হল যেটি সায়্যিদ সাহেব অবলম্বন করেছেন, কাজেই তোমরাও এ পদ্ধতি অবলম্বন করে নাও এবং তাঁর কাছে মুরীদ হয়ে যায়। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে, আমি নিজে আমার আরাম আয়েশের খানকা ত্যাগ করে কাফেলায় শরীক হয়ে গেছি। খানকায় অবস্থানকালীনের আরাম আয়েশের নাম গন্ধও এখানে নেই। উপরন্তু এখানে আমাকে ইট ভাঙ্গা, দেওয়াল

নির্মাণ করা, কাঠ কাটা ইত্যাকার বিভিন্ন কষ্টসাধ্য কাজে লিপ্ত থাকতে হচ্ছে। খানকায় বসে থাকলে এ সবের কোন কষ্টই আমাকে করতে হত না। তবে এখানে এত সকল কষ্ট ও পরিশ্রমের পর যে পরিমাণ রূহানী উন্নতি ও সুখ ভোগ করছি খানকার জীবনে তার এক দশমাংশও চোখে দেখিনি[১৪৭]।

'ওয়াকায়িয়ে আহমদী' গ্রন্থের লেখক বলেন ঃ যেহেতু সায়্যিদ সাহেব সকলের দৃষ্টিতে একজন উচ্চমানের পীর এবং তাসাউফ শাস্ত্রের উন্নত উপলব্ধির অধিকারী একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন, তাই তার বক্তব্যে কারুর মনে আর কোন দ্বিধা অবশিষ্ট থাকেনি। সকলে বিষয়টি সন্তোষজনকভাবে বুঝে নিল এবং মনে প্রাণে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের কাজে লিপ্ত হয়ে গেল। রাত দিন সকলের এই একটি চেষ্টা সাধনা। তারা হাতসই করা, তীরান্দাযী, তরবারী চালানো ইত্যাদির সিপাহী সুলভ কাজকর্মের অনুশীলনে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে।

স্থানীয় প্রতিনিধি ও দায়িত্বশীল নিয়োগ

হযরত সায়্যিদ সাহেব এক এলাকার পর অন্য এলাকা সফর করতেন। সফরকৃত এলাকা থেকে বিদায়ের পূর্বেই তিনি সে এলাকার লোকদের জন্য এমন সুব্যবস্থা[১৪৮] দিয়ে যেতেন যেন তার সাময়িক সফরের দ্বারা অর্জিত সুফলটি স্থানীয় লোকজন পরবর্তীতেও ধরে রাখতে পারে। যেন তিনি যে বীজ তাদের অন্তরে বপন করেছেন সেটি ক্রমে অংকুরিত ও পল্লবিত হয়ে ফুলে ফলে ভরে উঠতে সক্ষম হয়। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সর্বত্র নিজের প্রতিনিধি ও খলীফা মনোনীত করে দিতেন। বক্ষমান আলোচনায় তাদেরকেই আমরা 'নকীব' নামে প্রকাশ করছি। নিম্নে উল্লেখিত তালিকায় হযরত সায়্যিদ সাহেবের খলীফাবৃন্দ এবং সে সকল ব্যক্তিবর্গের নাম দেওয়া হল যারা কাফেলাকে নিজেদের এলাকায় আহবান করে এনেছিল কিংবা কাফেলা তাদের এলাকায় পৌঁছে যাওয়ার পর তারা মনে প্রাণে কাফেলার সাহায্য সহযোগিতা করেছিল।

মোকাম	নাম
গাযীউদ্দীন নগর	হাফিয আবদুল্লাহ সাহেব (ইমামে মসজিদ), শায়খ আবদুর রহমান সাহেব, শায়খ রমজান সাহেব, আবদুশ শাকুর সাহেব, জমাদার ইমাম খান সাহেব।

মুরাদ নগর

থানাদার মৌলভী আবুল কাসিম সাহেব, উল্লেখ্য যে, ইনি ছিলেন এই কাফেলার সুপ্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী সদস্য জনাব মুফতী এলাহী বখশ সাহেবের পুত্র–নিজে সরকারি চাকুরী করতেন তবে আন্দোলনের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক ছিল।

মিরাঠ
মাত্র দশ দিনের অবস্থান

কাযী হায়াত বখশ, কাযী সাহেবের পুত্র মৌলভী আহমদ উল্লাহ সাহেব, দারোগা মুহাম্মদ রাহিম সাহেব, মুনশী মুহাম্মদ আনসারী বর্ধমানী, মৌলভী মুহাম্মদ বখশ সাহেব (তার সঙ্গে আরও পনর জন মুরীদ ছিল), মীরাঠের জমিদার মৌলভী খোদা বখশ সাহেব, কুদ্দুস খান, সদরুদ্দীন সাহেব, তদীয় ভ্রাতা রুটি বিক্রেতা করীম বখশ সাহেব, কসাই মুহাম্মদ তকী সাহেব (তিনি ইংরেজদের জন্য গোশত সরবরাহের ঠিকাদার ছিলেন), বদরুদ্দীন সাহেব ও খাজা মুহাম্মদ খানসামান।

মীরাঠ থেকে সারধুনা যাত্রাকালে মীরাঠ জেলার সারধুনায় নিযুক্ত প্রতিনিধি ঃ

মীরাঠ থেকে যাত্রাকালে সায়্যিদ সাহেব দানতিল, পাইলী ও কাহারবী নামক বিভিন্ন স্থানে সামান্য সময়ের জন্য অবস্থান করেন। যেখানে নামাযের ওয়াক্ত হত সেখানে নামায পড়তেন। এ সকল স্থানের নিযুক্ত প্রতিনিধিবৃন্দ ছিলেন মাওলানা বুলন্দ বখশ দেওবন্দী, মুনশী খাজা মুহাম্মদ সাহেব হাসানপুরী, পতাকাবাহী হাফিয আমানুল্লাহ, আবূ আলী বখশ, নসরুল্লাহ, নাথে খান, তদীয় পুত্র বাবর খান ও দারাব খান, রিসালদার সলু খান, মুরাদ খান, মুদলে খান ও আযীমুল্লাহ বেগ।

ওপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের কতিপয় এমনও রয়েছেন যারা সায়্যিদ সাহেবের নেতৃত্বাধীন জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন। এতদঞ্চলে সফরকালে স্থানীয় সিপাহীগণ সায়্যিদ সাহেবকে তাদের সাথে আহার গ্রহণের নিমন্ত্রণ কবুলের জন্য খুব পীড়াপিড়ী শুরু করেছিল। তিনি উত্তর দিলেন এক শর্তের ওপর দাওয়াত কবুল করা যেতে পারে। সেটি আমি যে ধরনের খানা পাকাতে বলব সে ধরনের খানা পাকাতে হবে। তারা শর্ত মেনে নিল। তিনি বললেন যবের রুটি ও মাশ কলাইয়ের ডাল পাকাতে হবে। কারণ এ পর্যায়ের আহারে আমীর গরীব সকলে একসঙ্গে শরীক থাকা সম্ভব হয়।

বড়হানা জেলা ঃ
মীরাঠ অবস্থানকাল
বারদিন

কাফেলার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সদস্য যিনি সায়্যিদ সাহেবের ডান হাতরূপে গণ্য ছিলেন অর্থাৎ মাওলানা আবদুল হাই সাহেব ছিলেন এই বড়হানা এলাকার বাসিন্দা। তার বাড়িতে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করে। এখান যিম্মাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন মিয়া নিযামুদ্দীন চিশতী সাহেব, শায়খ আলাউদ্দীন সাহেব, শায়খ মুহাম্মদ হাসান সাহেব, শায়খ আবু বকর সাহেব, বড়হানার এ সকল ব্যক্তিবর্গ সায়্যিদ সাহেবের আন্দোলনের বিশেষ সদস্যমন্ডলী হিসাবে পরিগণিত ছিলেন।

বড়হানা থেকে ফুলত
যাত্রাকালে ফুলত
এলাকা জেলা
মুযাফফর নগর
অবস্থানকাল সতরে
দিন

বড়হানা থেকে কাফেলা ফুলত যাত্রাকালে ইড়নী, চুলী, বহরসুর ইত্যাদি স্থানে সামান্য সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি করে। এ সকল স্থানের নকীববৃন্দ ছিলেন শায়খ অলী মুহাম্মদ, তার পিতা মুহাম্মদ ফুযাইল, শায়খ গোলাম মুহাম্মদ সাহেব, শায়খ মুহাম্মদ আরিফ সাহেব, হাফিজ গোলাম আলী সাহেব, হাফেজ মঈনুদ্দীন সাহেব, হাফেজ আহমদ উদ্দীন সাহেব, আবদুল আলী সাহেব, শায়খ মুহাম্মদ উসমান সাহেব, মিয়া ইসমত উল্লাহ সাহেব, তাঁর পিতা শায়খ সাব্বুর উল্লাহ, মিয়া সাদুদ্দীন সাহেব, হাফিজ মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব, হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ সাহেবের খালাত ভাই মিয়া জামাল সাহেব, হাফিজ মুহাম্মদ উসমান সাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কুতুবুদ্দীন সাহেব, হাকীম কমরুদ্দীন সাহেব, মিয়া সালাহউদ্দীন সাহেব, শায়খ আবদুর রউফ সাহেব, শায়খ আবদুল হাকীম সাহেব, মুহসিন খান সাহেব।

ফুলত থেকে মুযাফফর নগর যাত্রাকালে কাফেলা বিউপাড়ী নামক স্থানে নাশতা করেছিল।

মুযাফফর নগর ও
দেওবন্দ
অবস্থানকাল
দশদিন

এখানে ছিলেন সায়্যিদ মকবুল সাহেব, মৌলভী শামসুদ্দীন সাহেব, শায়খ হাফীজ সাহেব দেওবন্দী, শায়খ রজব আলী সাহেব, তদীয় পুত্র মুনাওয়ার আলী সাহেব, মৌলভী ফরীদুদ্দীন সাহেব ও মৌলভী বশীর উল্লাহ সাহেব।

কাফেলা দেওবন্দে অবস্থানকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য তিনি এমলিয়া তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানকার হাফিজ আবদুল্লাহ ও তার ভাই করীমুদ্দীন সাহেব এবং নেযামুদ্দীন সাহেব ও তার পিতা ইমাম বশখ সাহেব প্রমুখ ছিলেন সেখানকার মেজবান ও আমন্ত্রণকারী। তন্মধ্যে হাফিজ আবদুল্লাহ সাহেব সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে হজ্জযাত্রা ও জিহাদে শরীক হয়েছিলেন।

মুযাফফর নগর থেকে দেওবন্দ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানের জিম্মাদার হিসাবে যারা নিযুক্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আরও যারা ছিলেন তারা হলেন, জনাব কারামত হোসাইন সাহেব, মুহাম্মদ শাহ সাহেব, শায়খ চান্দ সাহেব, মৌলভী ফরীদুদ্দীন সাহেব, মৌলভী বশীরুল্লাহ সাহেব ও সায়্যিদ মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব।

দেওবন্দ থেকে সাহারানপুর যাত্রা ঃ

দেওবন্দ থেকে সাহারানপুর যাত্রাকালে প্রথমে শায়খপুরা গ্রামে তারপর সবীরী গমন করেন। এখানে উপস্থিত যা প্রস্তুত ছিল তা আহার করেন এবং কয়েক ঘণ্টাকাল অবস্থান করেন। রাতে লাখনুর নামক স্থানে অবস্থান করার পর গাঙ্গুহ চলে যান। সেখান থেকে নানূতা এসে স্থানীয় জামে মসজিদে অবস্থান করেন। জনৈক মুরীদের বক্তব্য ঃ আমার চোখে এখনও সেই দৃশ্য ফুটে আছে যে, সায়্যিদ সাহেব জামে মসজিদের মধ্যবর্তী দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তার পাগড়ী এক মাথা নিজের হাতে আর অবশিষ্ট অংশের সবটুকু জুড়ে বহু সংখ্যক দীক্ষাপ্রার্থী দু'দিক থেকে ধরে রয়েছে। এ সময় আম্বেঠার শাহ আবুল মায়ালী খানকার গদীনশীন মিয়া সাবির বখশের বাড়িতে তাকে দাওয়াত করা হয়েছিল[১৪৯]

সাহারানপুর আবু নবী মসজিদে অবস্থান

এখানকার নকীবগণ ছিলেন সাহারানপুরের জমিদার আলী মুহাম্মদ সাহেব, মুফতী শরফুদ্দীন সাহেব, এলাহী বখশ সাহেব, ইমামুদ্দীন সাহেব, করীমুদ্দীন সাহেব, মুহসিন খান, মুহাম্মদ হোসাইন, রুড়কীর বাসিন্দা মৌলভী শাহ রমজান সাহেব, ইনি পরবর্তীকালে মুজাহিদদের একটি দলকে সঙ্গে করে সীমান্তে গিয়ে যোগ দেন। এখানে মুরীদ হওয়ার পর সায়্যিদ সাহেব তাকে খিলাফতও দিয়েছিলেন।

স্থানীয় কসাইদের অনেকে দীক্ষা গ্রহণে অংশ নেয়। এ গোত্রের লোকের কাফেলার নানাবিধ সেবাযত্নের কাজেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। সায়্যিদ

সাহেব এ গোত্র থেকে চারজনকে মনোনীত করেন এবং তাদেরকে খেলাফত প্রদানে ভূষিত করেন। তাদের নাম মুহাম্মদ ইয়ার, এলাহী বখশ, ইমামুদ্দীন ও কারীমুদ্দীন।

সাহারানপুর অবস্থানের সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল সায়্যিদ সাহেবের হাতে হাজী আবদুর রহীম বেলায়েতী সাহেবের মুরীদ হওয়া। হাজী আবদুর রহীম বেলায়েতী নিজে একজন উচ্চমানের বুযুর্গ ও পীর ছিলেন। তার হাজার হাজার মুরীদও ছিল। অথচ তিনি তখন নিজেই সায়্যিদ সাহেবের হাতে মুরীদ হন এবং নিজের সকল মুরীদকেও সায়্যিদ সাহেবের হাতে মুরীদ হওয়ার উপদেশ দেন। ফলতঃ হাজী সাহেবের কয়েক বছরের শ্রম সাধনায় যে কয়েক হাজার মানুষ সংগৃহীত হয়েছিল তাদের সকলে একসঙ্গে সায়্যিদ সাহেবের হালকায় এসে জমায়েত হয়ে গেল। কথিত আছে হযরত হাজী আবদুর রহীম বেলায়েতী সাহেব বলতেন ঃ

> আমরা না নামাজ পড়তে জানতাম আর না রোযা রাখতে জানতাম। তবে সায়্যিদ সাহেবের বরকতে এখন উভয়টিই শিখে নিয়েছি।

হযরত সায়্যিদ সাহেবের সেই ফয়েজ ও বরকতের প্রতিক্রিয়া এমন দাঁড়াল যে, বর্তমানে প্রায় শোয়াশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর আজও এতদঞ্চলে ধার্মিকতা ও রাজনৈতিক দিক থেকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে যার তুলনায় অন্য কোথাও পাওয়া যায় না[১৫০]।

দারুল উলূম দেওবন্দ ও মোজাহিরে উলূম সাহারানপুর-এর মত ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এতদঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। ধর্মীয় কাজকর্মে দৃঢ়তা ও নিরবচ্ছিন্নতার পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজেও এখানকার মুসলমানগণ সর্বদা অগ্রবর্তী।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ)-এর পিতা মাওলানা যুলফিকার আলী সাহেব অনেক সময় বলতেন, হযরত সায়্যিদ সাহেব যে সকল জনপদ হয়ে যাত্রা করেছিলেন সে সকল স্থানে আজ পর্যন্ত খায়র ও বরকত বিদ্যমান। তাঁর উপমা হল একটি উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। এটি যে দিকে গমন করে গেছে সে দিকটিই আলোকিত হয়ে গিয়েছে। অপর এক বুযুর্গ মাওলানা মুহাম্মদ

হোসাইন সাহেব বলেন, যেখানে হযরতের মুবারক কদম অর্পিত হয়েছিল সে সব জায়গাসমূহে বর্তমানেও খায়র ও বরকতের নিদর্শন পাওয়া যায়[১৫১]।

সাহারানপুর থেকে দিল্লী তারপর দিল্লী থেকে রায়বেরেলী

সায়্যিদ সাহেব সাহারানপুর থেকে চলে গেলেন দিল্লী। সেখানে তার পীর অভিভাবক ও রাজনৈতিক পথনির্দেশক হযরত শাহ আবদুল আযীয সাহেব পূর্ব থেকেই তার আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। দিল্লীতে শায়খের সান্নিধ্যে কয়েকদিন পর্যন্ত অবস্থানের পর হিজরী ১২৩৪ সালের শাবান মাসে (মে-জুন ১৮১৯ ইং)[১৫২] রায়বেরেলীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এটিই ছিল আপন পীর হযরত শাহ্ আবদুল আযীযের সঙ্গে তার সর্বশেষ সাক্ষাৎ।

সায়্যিদ সাহেব কাফেলাসহ দিল্লী থেকে যাত্রা করেন। তখন যদিও মে মাস ছিল কিন্তু যমুনা অতিক্রম করার পরপরই শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া। শুরু হল প্রবল বৃষ্টিবর্ষণ। ফলে 'হিন্দন' নদী প্লাবিত হয়ে গেল। সেই রাত নদী তীরেই তাকে অবস্থান করতে হল। সকালে তারা নদী পাড়ি দিয়ে গাযিয়াবাদ এসে পৌঁছেন। এখানে মসজিদের ইমাম এবং তাঁর মুরীদ জনাব আবদুল্লাহ সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করেন। এখানে অবস্থানকালেই জনৈক বার্তা বাহক তার হাতে একটি চিঠি তুলে দিয়েছিল যেখানে সায়্যিদ সাহেবের সম্মানিত ভ্রাতা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের মৃত্যু সংবাদ উল্লেখ ছিল।

একজন সুবিজ্ঞ আলিম সহোদর যিনি হযরতের পারিবারিক জীবনে অভিভাবক ছিলেন। যার ওপর নির্ভর করেই তিনি পারিবারিক সকল ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন, যার শক্তিশালী তত্ত্বাবধানের ফলে তিনি বছরের পর বছর বাইরে কাটানোর পরও পারিবারিক কাজকর্মে কোন তফাৎ আসতে পারেনি—এমন সহোদরের বিয়োগ ব্যাথা কিভাবে সহ্য করা যায় ? সায়্যিদ সাহেবের জীবনে এই মৃত্যু সংবাদ এমন এক অসহনীয় বেদনার সৃষ্টি করেছিল যা যে কোন উর্ধ্বগামীর যাত্রা রহিত করে দেয় এবং দৃঢ়চেতা পুরুষকেও হীনবলে পরিণত করে। মানবিক যাতনাবোধ ও অস্থিরতা তার চোখ থেকে কয়েক ফোটা অশ্রু নিঃসৃত করে। বেদনা ক্লিষ্টতা তার রাতের আহারকেও তিক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু কাফেলা সঙ্গীদের অভূক্ততার কথা চিন্তা করে মনের সেই যাতনাবোধকেও বিস্মৃত করতে হল। অর্ধরাত অতিক্রমের পর কয়েক লোকমা

আহার করলেন। তারপর খুব ভোরে উঠেই সফরের প্রস্তুতি নেন। তবে এতদসত্ত্বেও দেশ ও জাতির দরদ ও কল্যাণ চিন্তা যা তার প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়েছিল, সেটি সাময়িক বিয়োগ ব্যাথা থেকেও সহস্রগুণ বর্ধিত ছিল। অবস্থার প্রেক্ষিতে অতি দ্রুত বাড়ি পৌঁছার প্রয়োজনবোধ করেন। তারপরও তাকে পথিমধ্যে কয়েক স্থানে অবস্থান করতে হয়। তিনি এ সকল অবস্থানেও নিজের দওয়াতী ও ইসলামী কর্মসূচি যথারীতি অব্যাহত রাখেন।

অবস্থান করার স্থানসমূহ

গাযিয়াবাদ থেকে রওয়ানা হওয়ার পর প্রথম অবতরণ করেন হাপুরে। তারপর গুডমুক্তিশ্বর গিয়ে মসজিদে অবস্থান করেন। এভাবে আমরূহা ও মুরাদাবাদের কসাইখানায় অবস্থান করে রামপুর চলে যান। সেখানে হাজী যায়নুল আবেদীন সাহেবের বাড়িতে কয়েকদিন থাকেন। রামপুরের যারা তার কাছে মুরীদ হয়েছিল তন্মধ্যে রামপুরের সুবাদার নবাব আহমদ আলী খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

বেরেলী (বাঁস বেরেলী)

রামপুর থেকে বাসবেরেলী পৌঁছারকালে পথিমধ্যে এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করেন। কিন্তু জায়গাটির নাম জানা যায় নি। বেরেলীর নবাব সাহেব সায়্যিদ সাহেবের আগমন করার সংবাদ পেয়ে অনেক পীড়াপীড়িপূর্বক কাফেলা নিজ বাসভবনে আমন্ত্রণ করে আনেন এবং নিজের সকল কর্মচারী ও বন্ধুবান্ধবসহ তার কাছে মুরীদ হন। বেরেলীতে যারা মুরীদ হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন হোসাইনী শীয়াও ছিল। সে নপুংসক ছিল। সায়্যিদ সাহেব তার নাম পরিবর্তন করে হিদায়েতুল্লাহ রাখেন। এ লোকটি জিহাদেও হযরতের সঙ্গে থাকে এবং আকুজীর যুদ্ধে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা পালন করে।

বাস বেরেলী থেকে রায়বেরেলী পর্যন্ত অবশিষ্ট অবস্থান স্থানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় নি। কেবল এতটুকু জানা গেছে যে, যেদিন সন্ধ্যায় তিনি দীর্ঘ দশ বছর পর আপন মাতৃভূমিতে প্রবেশ করলেন সেদিন আকাশে রামযানের নতুন চাঁদ উদিত হয়েছিল। অর্থাৎ ২৯শে শাবান ১২৩৪ হিঃ মোতাবেক ২৩শে জুন ১৮১৯ সাল।

রায়বেরেলীতে অবস্থান করার মেয়াদ ছিল প্রায় চার মাস। দিল্লী থেকে যারা কাফেলার সাথী হয়েছিল তাদের ছাড়াও বিগত সফর সমূহের দ্বারা প্রভাবিত বিক্ষিপ্ত লোকেরাও তখন এখানে পৌঁছে কাফেলার সঙ্গে যোগ দেয়। ফলে কাফেলার সদস্য সংখ্যা তখন ৫০/৬০ থেকে পৌনে দু'শতের কোটায় গিয়ে পৌঁছে।

এখানকার অবস্থানকালে রূহানী দীক্ষাদান ও অনুশীলনসহ সামরিকভাবে প্রশিক্ষণদানের কাজকর্মও পূর্ণদ্যমে অব্যাহত থাকে। হযরতের এই ব্যতিক্রমধর্মী কাফেলার চর্চা আশপাশের জেলা সমূহের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থান থেকে তার কাছে তখন আমন্ত্রণ পত্র বরং কাফেলা নিজ এলাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিনিধি দল সমূহেরও আগমন শুরু হয়।

অবশেষে তিনি রায় বেরেলী থেকে এলাহাবাদ গমনের ইচ্ছা করেন। দূরত্ব ছিল চার দিনের। অথচ তাকে এ পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল এক মাসে। কারণ দীক্ষাপ্রার্থীদের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি যে পথে যাত্রা করতেন সে পথেই আশপাশ থেকে গ্রাম-গঞ্জের লোকের দলে দলে এসে রাস্তায় জমায়েত হত। প্রত্যেকে কাফেলা নিজ এলাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য যথাসাধ্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দিত। এভাবে সায়্যিদ সাহেবকে নিজের ওজর আপত্তি ও অপরাগতা ব্যাখ্যা করার কাজেও প্রচুর সময় ব্যয় করতে হত। তারপরেও কোথাও শুধু গিয়ে দু'আ করা হবে কিংবা কেবল একবেলা আহার করা হবে ইত্যাদির ওপর সন্তুষ্ট রাখতে হত। কোথাও এমনও পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটত যে, সেখানে এক দু'দিন অবস্থান করা ব্যতিরেকে কিছুতেই তাদের মনঃপীড়া দূর করা সম্ভব নয়। তখন দীক্ষা প্রার্থীদের মন রক্ষার্থে তাও করতে হত।

মোট কথা রায়বেরেলী থেকে এলাহাবাদ পৌঁছা পর্যন্ত অনেক স্থানেই তাকে অবস্থান করতে হল। তবে পরবর্তীকালীন একজন ঐতিহাসিক হিসাবে তন্মধ্যে যে কয়টি স্থানের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয় সেগুলো নিম্নরূপ ঃ সালুন তারপর আহলাগঞ্জ, মাঙ্গপুর ও কাটরা। আহলাগঞ্জে মির্জা কাযিম বেগ স্থানীয় গভর্নর ছিলেন। তিনি নিজে তাঁর হাতে মুরীদ হন এবং অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করে নিজের সঙ্গে মুরীদ করিয়ে দেন।

এলাহাবাদ

এলাহাবাদে সায়্যিদ সাহেব কোথায় অবস্থান করেছিলেন সে সম্পর্কে একাধিক বর্ননা পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনামতে বুঝা যায় তিনি হযরত শাহ আজমল সাহেবের[১৫৩] খানকায় অবস্থান করেছেন। এ খানকাহ সম্পর্কে কবি নাসিখ বলেন ঃ

ہر پہر کے دائرے ہی میں رکھتاہوں میں قدم
آئی کہاں سے گردش ہپر کار پاؤں میں

অন্য বর্ননামতে বুঝা যায় হযরতের অবস্থান অন্য জায়গায় হয়েছিল। তবে শাহ আজমল সাহেবের সঙ্গে তিনি গিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তার বাড়িতে দাওয়াতও গ্রহণ করেছিলেন। এলাহাবাদের এখানে অগণিত মানুষ মুরীদ হয়। কিন্তু শায়খ গোলাম আলী সাহেবের অতুলনীয় আন্তরিকতা ও ত্যাগ তখন তাকে এতখানি আলোকিত করে দিয়েছিল যে, জীবনীকারদের দৃষ্টি এখানেই নিবন্ধিত হয়ে পড়ে। তারা অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাতের অবসরই করতে পারেন নি। এমনকি অবস্থান স্থলটি কোথায় ছিল তাও বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। বাস্তবিকভাবেও শায়খ গোলাম আলী কাজকর্মও এমন পর্যায়ের করেছিলেন যে, এর কোন তুলনা কোথাও পাওয়া যাবে না।

শায়খ গোলাম আলী সাহেব একজন উল্লেখযোগ্য আমীর বলে গণ্য ছিলেন। তিনি বানারসের মহারাজা উদ্ধত নারায়ণের অধীনস্থ প্রশাসক ছিলেন। তার জন্ম স্থান মেহরুন্ডা। তৎকালের আমীর উমরাগণ যে সকল নৈতিক দোষক্রটির শিকার ছিল সেগুলো শায়খ গোলাম আলীর মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তিনি হযরত সায়্যিদ সাহেবের হাতে মুরীদ হয়ে সকল অন্যায় অপকর্ম থেকে খালেস মনে তাওবা করেন। ভোগ বিলাসের যে সকল জিনিসপত্র ছিল সেগুলো ভেঙ্গেচুরে সম্পূর্ণ নদীতে ফেলে দেন। সায়্যিদ সাহেবের খেদমতেও অনেক মূল্যবান হাদিয়া পেশ করা হয়েছিল। (বিস্তারিত বিবরণ পরে আলোচিত হবে)।

বানারস

তিনি এলাহাবাদ থেকে যাত্রা করে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানপূর্বক বানারস গিয়ে পৌঁছেন। সেখানকার মৌলভী আবদুল কাদির সাহেব যিনি স্থানীয় আমীরদের

একজন এবং সায়্যিদ সাহেবের একজন বন্ধু হিসাবে গণ্য ছিলেন। তাই সাথীদের ধারণা ছিল তিনি সেখানেই অবস্থান করবেন। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব পরিষ্কার বলে দিলেন না তিনি আমাদের চিন্তাধারার লোক নন। কাজেই তার বাড়িতে অবস্থান করা উচিত হবে না। ফলে কাফেলা সাহীসরের মসজিদে অবস্থান করে। আর সায়্যিদ সাহেব নিজে কয়েকজন সঙ্গীসহ অপর একটি পুরাতন শাহী মসজিদে অবস্থান করেন যেটি দীর্ঘকাল থেকে অনাবাদ পড়ে রয়েছিল। কাফেলা প্রায় একমাস যাবৎ অবস্থান করে। প্রায় পনের সহস্র নারী-পুরুষ এখানে মুরীদ হয়। স্থানীয় অবৈধ রুসুম-রেওয়াজের মধ্যে সেখানে দেখা গেল যে, তাদের একজন পীর সাহেব আছেন। তিনি প্রতি ছয়মাস অন্তর অন্তর এখানে আসেন। সব ঘর থেকে নির্দিষ্ট অংকের হাদিয়া নিয়ে লোকেরা উপস্থিত হত এবং নামায রোজা ইত্যাদি করার প্রয়োজন হবে না এ মর্মে ফরমান লিখে নিত। হযরত মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের ধারাবাহিক ওয়াজ নসীহত ও আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত এ সকল কুসংস্কারের বিলুপ্তি ঘটে। মানুষের মাঝে পুনরায় বিশুদ্ধ দীনদারীর প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগ্রত হয়। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে যারা মুরীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে শাহ আবদুল্লাহ সাহেব শংরনী ও রঈস মির্জা করীমুল্লাহ বেগের নাম অন্তর্ভূক্ত আছে।

কথিত আছে যে, সেখানে তৈমুরী শাহজাদাদের যারা ছিলেন তারাও তখন মুরীদ হন। তারা অনেক মূল্যবান উপঢৌকন ও হাদিয়া করেছিলেন। কিন্তু এ শাহজাদাদের নাম জানা যায় নি।

সুলতানপুর

বানারস থেকে যাত্রা করে কয়েক স্থান অতিক্রমের পর তিনি সুলতানপুর গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে গোলাম হোসাইন লক্ষ্ণৌ সরকারের নিযুক্ত শাসনকর্তা ছিলেন। তার সৈন্যবাহিনীর বহু সদস্য পূর্ব থেকেই সায়্যিদ সাহেবের হাতে মুরীদ ছিল। তিনি প্রায় দু'সপ্তাহ যাবৎ সুলতানপুর থাকেন। এ সময় আরও বহু মানুষ মুরীদ হয়েছিল।

সুলতানপুর থেকে বেরেলী চলে যান। সেখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর লক্ষ্ণৌ চলে আসেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, লক্ষ্ণৌর এই সফর নায়েবে সুলতান আগা মীরের আমন্ত্রণে করা হয়েছিল। 'মাখযানে আহমদী' গ্রন্থে আমন্ত্রণ পত্রের বক্তব্যও উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

آوازه وعظ وتذکیر آں روشن ضمیر عالمگیر گردیده اگر بقدوم میمنت زوم خود، اہالی لکھنؤ را عموماً وایں مشتاق مستمند را خصوصاً بنو ازند بعید از مروت واخوت وفتوت نخواهد بود

আগাসীর নায়েবুস সালতানাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল হযরত সায়্যিদ সাহেবের জনপ্রিয়তাকে নিজের পক্ষে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করা। বাদশার সঙ্গে তার যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তার নিরসন করা আর এতদুদ্দেশ্যেই সায়্যিদ সাহেবের প্রতি তার ভক্তি-শ্রদ্ধা গদগদ করছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন দেখা গেল যে, সায়্যিদ সাহেব তাদের ঐ সকল দুনিয়াবী তুচ্ছ ব্যাপার-স্যাপারের অনেক উর্ধ্বে বিবরণ করেন, জাগতিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভের প্রতি তার কোনই দৃষ্টি নেই তখন আপনা থেকেই আগাসীরের সকল ভক্তিশ্রদ্ধার লৌকিকতা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, (বিস্তারিত বিবরণ পরে আসবে)।

টীকা ঃ

১৩০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন 'সিযাসী তারীখে হিন্দ' সপ্তম অধ্যায়, স্যার জন মিক্রম।

১৩১. বিদায়কালে হযরত শাহ আবদুল আযীয নিজের পরিহিত একটি কাল পাগড়ী আর একটি সাদা লুঙ্গী নিজ হাতে তাকে পরিয়ে দিয়ে বিদায় দেন। সাওয়ানিহে আহমদী পৃঃ ২৫।

১৩২. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ৯২।

১৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯-১১০।

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭।

১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯-১২০।

১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩-১১৪।

১৩৭. একটি হাদীসে প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেন, মুমিন ব্যক্তি এক ভূড়ি আহার করে আর কাফের আহার করে সাত ভূড়ি। অর্থ হল যে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও রূহানী শক্তি অর্জন করতে চেষ্টা করে সে ব্যক্তির জন্য একজনের আহারের এক সপ্তমাংশ ভোজ করাই যথেষ্ট বিবেচিত হয়। কারণ এমন ব্যক্তি আহারকে কেবল এজন্যই গ্রহণ করে থাকে যেন কোনমতে জীবন বায়ূ বেঁচে থাকতে পারে। এর অতিরিক্ত কিছু সে আশা করে না। পক্ষান্তরে যে মানুষ এই আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে অজ্ঞ, যে ভোগ বিলাসে মত্ত থাকতে ভালবাসে তার লোভী মন একজনের পূর্ণ আহার গ্রাস করার পরও তৃপ্ত হতে পারে না। সে উদরের সকল ফাঁক আহার দিয়ে ভর্তি করেও আহারের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাতে চায় না।

১৩৮. তিরমিযি শরীফ।

১৩৯. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ১৫৬।

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৭।

১৪১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮।

১৪২. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ১৪৪।

১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০।

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১।

১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২।

১৪৬. ওয়াশিয়ে আহমদী, সীরাতে সায়্যিদ আহমদ–অনুসরণে, পৃঃ ১৬৭।

১৪৭. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ১৬৮-১৭০।

১৪৮. কোন বিপ্লবী আন্দোলনের যদি অফিসিয়াল কোন নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা থাকে তা হলে এ ব্যবস্থাপনা গোপনীয় থাকা আবশ্যক। সর্বসাধারণকে তা কিছুতেই জানতে দেয়া হয় না। এদিকে প্রচলিত সংগঠনসমূহের মধ্যে সদস্য বানানো ও নির্বাচনের যে পদ্ধতি চালু আছে এটি বিপ্লবী কোন দল নিজেদের কাজে ব্যবহার করার প্রশ্নই উঠে না। কারণ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এ সকলের কোন সামঞ্জস্যতা নেই। সায়্যিদ সাহেবের বিপ্লবী আন্দোলনে অফিসিয়াল কোন ব্যবস্থাপনা ছিল না। নিয়মিতভাবে কাউকে সভাপতি কিংবা সেক্রেটারি

বানানো হয়েছিল বলেও জানা যায় না। বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত নবীব ও খলীফাগণ স্ব-স্ব স্থানের দায়িত্বশীল হিসাবে বিবেচিত ছিলেন। তাদের দ্বারাই এ আন্দোলন প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল।

১৪৯. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ১২৭।

১৫০. এমনকি চরম পরিবর্তনশীলতার এ যুগেও যখন বৃটিশ কূটনীতি মুসলিম গণমানসবে কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষী ও মুসলিম লীগের প্রতি অনুরাগী বানিয়ে দিয়েছিল তখনও এতদাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কংগ্রেস ও স্বাধীনতাপ্রিয় দলগুলোর সমর্থনে ধৃঢ় থাকে। এটিই একমাত্র অঞ্চল যেখানে নির্বাচনে মুসলমানগণ ভারতীয় জায়তাবাদী দলগুলোকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছিল।

১৫১. আরমাগানে আহবাব, মাওলানা আবদুল হাই সাহেব, সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ গ্রন্থের অনুসরণে।

১৫২. হিজরী ও ইংরেজী তারিখ মিলিয়ে হিসাব করলে দেখা যায় যে, সে বছর ২৬শে মে তারিখে শাবান মাসের শুরু হয়েছিল।

১৫৩. নাম মুহাম্মদ আজমল, উপনাম আবুল ফযল, উপাধি নাসিরুদ্দীন। তিনি সমকালের একজন উচ্চমানের আলিম ও বুযর্গ ছিলেন। ১১৬১/১৭৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৩৬/১৮২১ সালে ইন্তেকাল করেন। কথিত আছে যে, হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ ও মাওলানা আবদুল হাই সাহেব তার সাক্ষাতের জন্য যাওয়ার পথে মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, যদি আমাদের একজনকে গুড়ের শরবত আর অপরজনকে চিনির শরবত পান করতে দেন তা হলে আমরা বুঝে নিতে পারবো যে, তিনি একজন কাশফ সম্পন্ন বুযর্গ। সেমতে সাক্ষাতের মূহুর্তে শাহ সাহেব তাদের দুজনকে বুকের সঙ্গে মিলিয়ে নেন। তারপর জনৈক কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন দু গ্লাস শরবত আন। একটি গুড়ের আর অপরটি চিনির। কি করবো তাদের মনের ইচ্ছাই এটি। সীরাতে সায়্যিদ আহমদ, পৃঃ ১৫৬।

রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ)-এর সেখানে অবস্থান

সায়্যিদ সাহেবের এ কাফেলা আনুমানিক ১২৩৬/১৮১৯ সালে রায়বেরেলী থেকে লক্ষ্ণৌ শহরে গিয়ে উপস্থিত হল। লক্ষ্ণৌ ছিল অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী। তা ছাড়া সে আমলে এ শহরটি ইংলো-ইন্ডিয়ান রাজনীতির বৃত্তের কেন্দ্র হিসাবেও পরিচিত ছিল।

গাযীউদ্দীন হায়দার [১৫৪] ছিলেন সেখানকার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী। আর মুতামাদুদ্দৌলা ছিলেন প্রধান আমীর তথা নায়েবুস সালতনাত ও উজীরে আজম (প্রধানমন্ত্রী)।

মন্ত্রীত্ব থেকে রাজত্ব

গাযীউদ্দীন পূর্ব থেকেই 'রফীউদ্দৌলা, রফীউল মুলক, মাহামতে জঙ্গ ইত্যাদি উপাধি ও পদমর্যাদায় বরিত ছিলেন। কিন্তু তার প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষ তাকে এতটুকুর মধ্যে পরিতৃপ্ত থাকতে দেয় নি। তিনি মানসিকভাবে অবশিষ্ট চূড়ান্ত পদটিও অধিকারের ইচ্ছুক হলেন। দিল্লী রাজ দরবার থেকে ন্যাস্তকৃত উজীরুল মামালিক তথা প্রধান মন্ত্রীত্বের যে পদ তিনি পৈতৃক সূত্রে লাভ করেছিলেন এবং যে পদমর্যাদাকে তার খান্দান সম্রাট মুহাম্মদ শাহের আমল থেকে ভোগ করে এসেছিল তিনি তাতে তুষ্ঠ থাকলেন না। উপরন্তু কোম্পানী বাহাদূরের ইশারা[১৫৮] পেয়ে কিংবা তাদেরই নির্দেশে 'স্বাধীন সম্রাট' পদের আকাংখী হন। সেমতে ১৮১৮ সালের ১৯শে অক্টোবর মোতাবেক ১২৩৫ হিজরীর ১৮ই যিলহাজ্জ[১৫৯] রাজকীয় জাঁকজমক প্রদর্শনপূর্বক তিনি 'শাহে যামান' উপাধি ধারন করেন। ফলতঃ পূর্বে অর্জিত সকল উপাধি সহ বর্তমানে তার পূর্ণ নাম দাড়াল 'রফীউদ্দৌলা রফীউল মুলক শাহামতে জঙ্গ আবুল মুযাফফর মুইজ্জুদ্দীন শাহ

যামান গাযীউদ্দীন হায়দার বাদশাহ গাযী। আত্মতুষ্ট ও সংযমী পিতা নবাব সাদাত আলী খান (শুজাউদ্দৌলার পুত্র)-এর সঞ্চিত কোষাগার থেকে দুই কোটি টাকা ঃনষ্ট করা হল শুধু রাজ সিংহাসন ও রাজকীয় আসবাবপত্র তৈরীর কাজে।

মুদ্রা

রাজ্যের সীমানার রাজকীয় অধিকারের ওপর তখন যদিও ইংরেজদে প্রাধান্য ও কর্তৃত্বের দাগ লেগে গিয়েছিল এবং তার কোন নির্দেশ কিংবা তার সৈন্যদের কোন অভিযান স্বাধীনভাবে করা রহিত হয়ে গিয়েছিল তবুও রাজকীয় টাকশাল ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বাধামুক্ত। হাটে বাজারে তারই অনুমোদিত মুদ্রা চালু ছিল। আর এ মুদ্রার[১৬০] অবাধ প্রচলন করানোর দ্বারাই তিনি নিজ রাজকীয় প্রতাপের প্রকাশ করে যান।

ইংরেজদের কর্তৃত্ব

বলা বাহুল্য ১৭৬৫ সালে কোড়া জাহানাবাদের চুক্তি সম্পাদন বস্তুতঃ ইংরেজদেরকে ভারতবর্ষে রাজত্ব ও কর্তৃত্ব চালানোর বৈধতা দান করে। তারপর থেকে এ বৈদেশিক শক্তি নিজেদের কর্তৃত্ব ও অধিকারের সীমানা বৃদ্ধি করতে থাকে। গাযীউদ্দীনের শাসনামলে পৌঁছে এ প্রবৃদ্ধি এতখানি উন্নীত হয়ে গিয়েছিল যে, রাজ সিংহাসনে আরোহণ কিংবা চ্যুতির ব্যাপারটি পর্যন্ত ইংরেজদের এখতিয়ারভূক্ত হয়ে গিয়েছিল।

সামাজিক পরিস্থিতি

গাযীউদ্দীন হায়দারের অসত্য বিশ্বাস প্রবণতা[১৬১] ও গোড়ামী সর্বজন বিধিত ছিল। তার এ সকল ক্রটির দরুন দেশে মদখুরী ও শরাবখুরীর আধিক্য, নাচ-গানের প্রবল প্রতাপ এবং পেশাধারী বেশ্যা মহিলাদের অবাধ বিচরণ এমন আকারে পৌঁছেছিল যে, এগুলোর বাইরে অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দানের কোন সুযোগ হয়ে উঠত না।

সম্রাট নিজে, মন্ত্রীবর্গ ও অভিজাত শ্রেণীর এহেন কর্মধারা গোটা লক্ষ্ণৌ শহরকে বিলাস মত্ততার মধ্যে নিমজ্জিত করে দেয়। চারদিকে পতিতা ও যৌনাচারীদের ভীড় লেগে থাকে। এভাবে চরম হীন প্রবৃত্তি সমাজের মন-মানসিকতার মধ্যে মধ্যে ঢুকে পড়ে[১৬২]।

বিপ্লব তথা আমুল পরিবর্তনের উপযুক্ততা

উল্লেখিত অনিষ্টতা ও অসাধুতা সত্ত্বেও লক্ষ্ণৌ শহরের ব্যতিক্রমধর্মী একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্য কোন শহরের জন্য ছিল না। লক্ষ্ণৌর সামাজিক অবস্থা

যেমনই হোক না কেন এটি ছিল অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী। এ কারণে সুস্থ বিবেক ও সুষ্ঠু চিন্তা-চেতনার অধিকারী আলিম উলামা ও বিজ্ঞ শ্রেণীর লোকেরাও এখানে জড়ো হতে থাকেন। তারাও কেন্দ্রীয় এই নগরীকে নিজেদের কাজকর্মের কেন্দ্রস্থলরূপে বানানোর চেষ্টা চালান। তাই তালাশ করা হলে অবক্ষয়গ্রস্থ এই মরু-প্রান্তরের মধ্যেও রত্নযোগ্য বহু উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের তকিপয়ের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

উলামায়ে কেরাম

ফিরিঙ্গী মহলের আলিমগণ এ শহরে বিশেষ প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। এ খান্দানেরই জনৈক বুযুর্গ মনীষী ছিলেন হযরত মাওলানা আবদুল আলী সাহেব[১৬৩]। যাকে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ) বাহরুল উলূম তথা জ্ঞানের সমুদ্র বলে উপাধি দিয়েছিলেন[১৬৪]। শাহ সাহেবের দেয়া এ উপাধিটি এতখানি প্রসিদ্ধি অর্জন করে যে, প্রকৃত নামের তুলনায় তিনি সেই উপাধিতেই মানুষের কাছে অধিক পরিচিত থাকেন। অবশ্য গাযীউদ্দীনের আমলে তিনি জীবিত ছিলেন না। তবে তারই পুত্র মাওলানা আবদুর রব সাহেব জীবিত ছিলেন[১৬৫]। শহরে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিও বিদ্যমান ছিল। তৎকালে সেখানে অপর এক সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও বুযুর্গ ছিলেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মির্জা হাসান আলী সাহেব[১৬৬]। তিনি ছিলেন হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর শাগরিদ। তার শিক্ষাদানের আসরটিও ছিল সুপ্রশস্থ। হাজার হাজার শিক্ষার্থী তাঁর কাছে অধ্যয়ন লাভ করত। তাছাড়া শহরের প্রভাবশালী ও সুপ্রসিদ্ধ আলিমদের মধ্যে আরও ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব[১৬৭]। মাওলানা আবুল হাসান সাহেব নাসীরাবাদী, মাওলানা মাখদূম সাহেব, মাওলানা শাহ ইয়াকীমুল্লাহ সাহেব ও তদীয় পুত্রগণ, মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব সাহেব প্রমুখ।

সামাজিক নেতৃবর্গ

সামাজিক নেতৃবর্গের মধ্যে আল্লামা সুবহান আলী খানের[১৬৯] নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সরকারীভাবে তিনি ছিলেন নায়েবে উজীরে আজম (উপ-প্রধানমন্ত্রী)। এ ছাড়াও একজন বিজ্ঞ আলিম, সাহিত্যিক, গদ্য ও পদ্য রচনায় পারদর্শী, বহু বইপত্রের রচয়িতা[১৭০] হিসাবে তার সুখ্যাতির অভাব ছিল না। সম্রাট ও উজীরদের সকলেই তার মতামত ও পরামর্শের ওপর আস্থাশীল ছিলেন। এই লক্ষ্ণৌতে তাজুদ্দীন হোসাইন খান[১৭১] নিজের উন্নত যোগ্যতার কারণেই নবাব শুজাউদ্দৌলার সুদৃষ্টি অর্জন করেছিলেন।

সমর ও প্রতিরক্ষা কর্মী

অযোধ্যা সরকারের সেনাবাহিনী সংখ্যা যদিও অনেক কমিয়ে[১৭২] দেওয়া হয়েছিল তবুও যে পরিমাণের সৈন্য অবশিষ্ট ছিল তাও কোন প্রতিরক্ষার তাগিদে নয় বরং প্রদর্শনীর জন্য ধরে রাখা হয়। এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্যে কয়েকটি দল এমন ছিল যাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার কথা অঙ্গীকার করা যায় না। যেমন কান্দাহারী সেনা ছাউনী[১৭৩] (যাদের অধিক সংখ্যক ছিল পাঠান সিপাহী) নিজেদের কৃতিত্বের জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিল। তাদের নায়েবে জেনারেল ছিলেন ফকীর মুহাম্মদ খান বাহাদূর[১৭৪]। তিনি ব্যক্তিগতভাবেও হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের প্রতি ভক্তি ও আন্তরিকতা পোষণ করতেন। তাছাড়া এককালে তিনি সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে নবাব আমীর আলী খানের অধীনে চাকুরীও করেছিলেন। মোট কথা সামরিক বিভাগেও একটি দল ছিল যারা সায়্যিদ সাহেবের আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখত–এই লক্ষ্মৌ শহরেই সায়্যিদ সাহেব তার কাফেলাসহ ১২৩৪/১৮১৮ সালে গিয়ে উপস্থিত হন।

অবস্থান[১৭৫]

কাফেলা প্রথমতঃ আকবরী তোরণের নিকটবর্তী 'মীর মিসকীন'-এর হাবেলীতে অবস্থান করে। এ বাড়িটি আয়তনে ছোট ও শহরের সংকীর্ণ এলাকায় অবস্থিত হওয়ার দরুন একশত সত্তর সদস্য বিশিষ্ট কাফেলার জন্য অবস্থান কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই সেখান থেকে অন্যত্র গমনের চিন্তা করা হয়। সেমতে গোমতী নদীর অপর তীরে চিলার মসজিদ সন্নিকটে সওদাগর শায়খ ইমাম বখশ সাহেবের বাড়ি যা সমকালেই নির্মিত হয়েছিল সেখানে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। সায়্যিদ সাহেব কাফেলাসহ সে বাড়িতে চলে যান এবং লক্ষ্মৌ অবস্থানের শেষ সময় পর্যন্ত এ বাড়িতেই অবস্থান করেন।

কাফেলার জনপ্রিয়তা ও মানুষের ওপর তার প্রতিক্রিয়া

সেই কয়টি যোগ্য ও উপযুক্ত উপাদান যাদের দিকে ইতিপূর্বের আলোচনায় সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে তারা কাফেলার প্রতি অনুপ্রাণিত হন। কাফেলার প্রতি তাদের মনোযোগ ও আকর্ষণ এত পরিমাণে দেখা গেল যে, মনে হত তারা যেন পূর্ব থেকেই এমন কাফেলার জন্য অপেক্ষায় অধীর হয়েছিল।

সর্বপ্রথমে উলামা সম্রাট হযরত মাওলানা আবদুর রব সাহেব নিজ বাড়িতে গোটা কাফেলার জাঁকজমকপুর্ণ এক আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। তারপর

শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ মুহাদ্দিস হযরত মির্জা হাসান আলী সাহেব কাফেলার আগমন উপলক্ষ্যে গণ্যমান্যদের বিশাল সমাবেশের আয়োজন করেন। এ সমাবেশে সামাজিক নেতৃবর্গ ও প্রভাবশালী লোকদের ৫০০শত মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তিনি কাফেলার অধিনায়ক হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের খেদমতে রাজকীয় হাদিয়া[১৭৬] পেশ করেছিলেন। বণিক ও ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে সওদাগর শায়খ ইমাম বখশ সাহেব নিজের সুন্দর ও সুবিশাল বাড়ি যা সমকালেই তিনি নির্মাণ করেছিলেন সেটি কাফেলার দীর্ঘ অবস্থানের জন্য খালি করে দেন। শহর নেতৃবৃন্দের মধ্যে মির্জা হাসান বেগ সাহেব নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করে সায়্যিদ সাহেবকে পরিচয় করিয়ে দেন। অপর নেতা মির্জা আসাদ আলী বেগ প্রথম দিন থেকেই কাফেলার সেবাযত্নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারই নির্দেশে সওদাগর ইমাম বখশ সাহেব তার নিজের বাড়ি কাফেলার অবস্থানের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন[১৭৭]। তাজুদ্দীন হোসাইন খান ছিলেন সম্রাটের অন্যতম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ শীয়া আমীর। তিনি সাক্ষাতের জন্য সায়্যিদ সাহেবের দরবারে আগমন করেন এবং কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত একান্তে বসে আলাপ-আলোচনা করেন।

উজীরে আজম (মুতামাদুদ্দৌলা)-এর নাযির আল্লামা সোবহান আলী খান অতিশয় বিনয় ও নম্রতা নিয়ে সায়্যিদ সাহেবের দরবারে উপস্থিত হন এবং কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত কথাবার্তা বলেন। এ সকল সাক্ষাৎকার ও আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের পাশাপাশি যাদুকরী বক্তৃতার অধিকারী কাফেলা সদস্য আলিমদের ওয়াজ-নসীহত বক্তৃতা ইত্যাদি শহরের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। শুক্রবারে যেখানে তারা জুমুআর নামায আদায় করতেন সেখানে মসজিদে মুসল্লীদের সংকুলান হত না। মসজিদের বাইরে দূর দূর পর্যন্ত তাদের জন্য বিছানা ও জায়নামাজ বিছানোর প্রয়োজন হতে যেত।

কয়েক দিনের পরিচিতি পর্ব শেষ হওয়ার পর শুরু হল ভক্তি প্রকাশ ও মুরীদ হওয়ার পালা। নগরের প্রায় সকল আলিম ও পীরগণ[১৭৮] তার কাছে মুরীদ হলেন। সাধারণ ধার্মিক শ্রেণী রীতিমত তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে শুরু করে।

প্রত্যেক অলি গলিতে এ কাফেলা সম্পর্কীয় কথার চর্চা শুরু হলে ধীরে ধীরে ঐসব লোকজনও এদিকে মনোনিবেশ শুরু করল যাদের জীবন যাত্রা উদাসীনতা ও বখাটেপনার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।

এ প্রভাব নগর অতিক্রম করে নগর রক্ষী সেনা ছাউনী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। সেমতে রিসালদার মেস্তুখান ও তারই ভ্রাতা আবদুল্লাহ খান পরিণাম কি দাঁড়াতে পারে তা তোয়াক্কা না করেই হযরত সায়্যিদ সাহেবকে নিজ শিবিরে তাশরীফ আনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তারা তাঁর উপদেশে ধন্য[১৭৯] হন, তাঁর নিকট থেকে দু'আ লাভ করেন[১৮০] এবং তারই হাতে মুরীদ হয়ে যান[১৮১]।

সরকারী মহল থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা

হযরত সায়্যিদ সাহেবের এহেন প্রভাব প্রতিপত্তি সরকার প্রধান তথা ইংরেজ প্রতিনিধির কাছে কখনও ভাল বিবেচিত হতে পারে না। তাই এ প্রভাব প্রতিপত্তির ধারা স্থগিত রাখার জন্য প্রথমতঃ শীয়া-সুন্নী মতনৈক্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ফুঁকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। কারণ লক্ষ্মৌ নগরে এ বিরোধ লড়াই পূর্ব থেকেই চলে আসছিল। কিন্তু হযরত সায়্যিদ সহেবের সুন্দর ব্যবস্থাপনা এবং বক্তব্য দানকারীদের সচেতনতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত বক্তব্য দানের ফলে তাদের ষড়যন্ত্র কোন সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হল না। বাধ্য হয়ে সরকারী মহল তখন জোর জবরদস্তি প্রয়োজনের পথ অবলম্বন করে। বিশেষ কয়েক জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে[১৮২] পাঠিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল যে, যদি স্বল্প সময়ের ভিতর কাফেলা লক্ষ্মৌ নগর ত্যাগ না করে তা হলে গোলা-বারুদের আঘাতে কাফেলার পূর্ণ অবস্থানস্থল গুড়িয়ে দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য সায়্যিদ সাহেব যেহেতু এ কালে কোন প্রতিবাদ জানানো কিংবা লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল না তাই তিনি কোন উত্তর না করে সোজা বিদায়ের প্রোগ্রাম গ্রহণ করেন[১৮৩]।

লক্ষ্মৌর বাদশা ও উজীর উভয়ে একদিকে যেমন শীয়া ছিলেন তেমনি অন্যদিকে ইংরেজ মিত্রও বটে। কিন্তু তারা এ কথাও পছন্দ করে নি যে, ফৌজের সুন্নী সৈনিকবৃন্দ ও সুন্নী সংখ্যা গরিষ্ঠ এলাকার লোকজন তাদের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করতে পারে। কাজেই খুব বুদ্ধিমত্বা ও কৌশলে কাজ করা হল। অর্থাৎ একদিকে এপাশ ওপাশ থেকে নানা রকমের ধমকী শুনিয়ে সায়্যিদ সাহেবকে নগর থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা করা হল। আর অন্যদিকে বাহ্যিকভাবে সায়্যিদ সাহেব ও তার সঙ্গীদের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করা হল। এভাবে সায়্যিদ সাহেবের বিদায় গ্রহণের সিদ্ধান্ত স্থির হলে নওয়াব মুতামাদুদ্দৌলা ও উজীরে আযম গোটা কাফেলার সকলের জন্য এক ভোজানুষ্ঠানের দাওয়াত করে। তিনি মাওলানা আবদুল হাই সাহেবকে নিজ বাড়িতে নিয়ে ওয়াজও করান। প্রায় পাঁচ হাজার টাকার হাদিয়াও দেন। তারপর হযরত সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে

একান্তে মিলিত হওয়ার আবেদন জানান। সেমতে বিদায়ের দিন প্রায় দু'ঘণ্টা যাবৎ উভয়ের মধ্যে একান্তে বৈঠক ও আলাপ-আলোচনা হয়। সায়্যিদ সাহেব নওয়াবকে বেশ কিছু উপদেশ দেন। প্রজাবৃন্দের ওপর অন্যায় অবিচারমূলক আচরণের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। এ সময় নওয়াব সাহেব হযরত সায়্যিদত সাহেবের হাতে তওবাও করেছিলেন। সায়্যিদ সাহেব নওয়াব সাহেবকে একটি উচ্চমানের দামী ঘোড়া হাদিয়া হিসাবে পেশ করলে তিনি প্রথমতঃ কিছু আপত্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা করে পরে হাদিয়া কবুল করেন।

কাফেলা যাত্রা শুরু করার মূহুর্তে বাদশার পক্ষ থেকেও পয়গাম এসে পৌঁছল যে, তিনি মোলাকাত করতে ইচ্ছুক। এ কথা শুনে সায়্যিদ সাহেব নিজে পুনর্বার যাওয়ার চিন্তা করেন নি তবে মাওলানা আবদুল হাই ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবকে পাঠিয়ে দেন। তারা পরে দু' সপ্তাহ পর্যন্ত লক্ষ্ণৌতে অবস্থানরত থাকেন। কিন্তু দরবারী সদস্যরা এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিল যেন এ দীর্ঘ সময়ের ভিতর বাদশাহ্ সালামত সামান্য সময়ের জন্যও চেতনা ফিরে পাননি। ফলে দু' সপ্তাহ পর তারা লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে চলে আসেন।

টীকা ঃ

১৫৪. গাযী উদ্দীন হায়দার হিজরী ১২১৯ মোতাবেক ১৮১৪ সালে উজীর পদে অধিষ্ঠিত হন কয়েক বছর পর ১২৩৫/১৮১৮ সালে মন্ত্রীত্বের পরিবর্তে তিনি নিজের রাজত্বের ঘোষণা দেন। (সাওয়ানিহে সালাতীনে উধ, কায়সারুত তাওয়ারীখ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) ১২৩৪/১৮১৭ সালে তার ইন্তেকাল হয়।

১৫৫. এখানে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উল্লেখ করা আবশ্যক। কথা হল দিল্লীর রাজ দরবার যদিও দীর্ঘদিন থেকে কোম্পানী বাহাদূরের কাছ থেকে ভাতা ভোগ করে আসছিল কিন্তু তথাপিও তাদের মন মস্তিষ্ক থেকে পূর্ব পুরুষের শৌর্য-বীর্জ্য ও রাজত্বের গন্ধ নির্মূল হয় নি। এ চেতনা প্রথম বারের মত প্রকাশিত হয়েছিল নওয়াব সাদাত আলী খানকে মন্ত্রীত্ব প্রদানের মূহুর্তে। কারণ গাযীউদ্দীন খানের পিতা নওয়াব সাদাত আলী খানকে দিল্লীর দরবার প্রথমতঃ মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব প্রদানে সম্মত ছিল না। এর কারণ ছিল যে, তিনি ইংরেজদের লালিত ও ইংরেজ সমর্থক ছিলেন। উত্তরাধিকার নীতি অনুসারে শুজাউদ্দৌলার পুত্র আসিফুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র উজীর আলী খান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা। সেমতে আসিফুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তিনি মসনদে আরোহণও করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চার মাস পর তাকে গ্রেফতার করে কলিকাতা পাঠিয়ে দেয় এবং তদস্থলে তার পৃতৃব্য অর্থাৎ শুজাউদ্দৌলার অপর পুত্র নওয়াব সাদাত আলী খানকে মসনদে উপবিষ্ট করে। এ সময় সাদাত আলী খান চেষ্টা করছিলেন যেন দিল্লীর রাজ দরবার থেকে তার ওপর মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু দিল্লীর দরবার তার সে আকাংখা পূর্ণ করে নি। বলা বাহুল্য দিল্লী দরবারের এটি ছিল কোম্পানী বাহাদূরের আকাংখা বিরোধী সর্ব প্রথম দুঃসাহসিক আচরণ। দিল্লী দরবারের দ্বিতীয়বারের দুঃসাহসিক আচরণ প্রকাশ পেয়েছিল সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের (মসনদে আরোহণ ১২১১/১৮০৬ সালে, মৃত্যু ১২৫৩/১৮৩৭ সালে) শাসনামলে। এ সময় একবার ইংরেজ গভর্নর জেনারেল দিল্লী পৌঁছার উদ্দেশ্যে ফররুখাবাদ পর্যন্ত এসে ম্রাটের কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। সাথে সাথে তিনি এও চেষ্টা করেছিলেন যে, দিল্লীর দরবারে তার আসন গ্রহণের জন্য যেন একটি সীট বরাদ্দ করা থাকে। সম্রাট এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ফলে গভর্নর জেনারেল মনঃক্ষুন্ন হয়ে ফররুখাবাদ থেকে কলিকাতা ফিরে যান। তবে এ দুঃসাহসিক আচরণের ফল দাঁড়িয়েছিল যে, কোম্পানী কর্তৃপক্ষ এ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সম্রাটের মস্তক অবনত করার জন্য তার বদলে অন্য কাউকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (কাইসারুত্ তাওযারীখ)।

১৫৬. এটি দ্বাদশ ইমাম পন্থী সম্প্রদায়ের পালিত ঈদ দিবস (কাযসারুত তাওয়ারীখ, খঃ ১, পৃঃ ২৪৪)।

১৫৭. অযোধ্যার মুদ্রার গায়ে মাছের চিত্র অংকন অযোধ্যা সরকারের প্রতিষ্ঠাতা বুরহানুল মুলক-এর সময়কাল থেকেই চলে আসছে। এ চিত্র অংকনের কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, বুরহানুল মুলক সম্রাটের দরবার থেকে সুবার সনদপত্র লাভ করে যখন তিনি সুবা

হস্তগত করার জন্য যাচ্ছিলেন তখন গঙ্গা পাড়ি দেওয়ার মূহুর্তে একটি মাছ হঠাৎ লাফিয়ে নৌকার ওপর উঠে এবং ঠিক বুরহানুল মুলকের আচলে এসে পড়ে। বুরহানুল মুলক মাছের এ আচরণ থেকে শুভ লক্ষণ গ্রহণ করেন এবং এটিকে তার মুদ্রায় স্থান দেন। এই মাছটির হাড্ডিগুলো ওয়াজিদ আলী শাহের শাসনামল পর্যন্ত রাজকীয় কোষাগারে সংরক্ষিত ছিল (কায়সারুত তাওয়ারীখ, খঃ ১, পৃঃ ২৭ ; ইমাদুস সাদাস ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) তখন মুদ্রার অপর পিঠে দিল্লী সম্রাটের নাম ও মসনদে আরোহণের তারিখ ইত্যাদি থাকত। কিন্তু গাযী উদ্দীন হায়দার মুদ্রার এ চিত্রের কিছু পরিবর্তন করেন। তিনি মুদ্রার এক পিঠে মাছের চিত্র এবং চিত্র সংলগ্ন কোম্পানী বাহাদূরের মনোরঞ্জন করার লক্ষ্যে দুটি বাঘের চিত্র সংযোজন করেন। আর অপর পিঠে দিল্লী সম্রাটের নামের পরিবর্তে নিম্নোক্ত ফার্সী কবিতা লিখে দেন। কবিতাটি ছিল ঃ

سکه زر برسیم وزر از فشل رب ذو المن، غازی الدین حیدر عالی
نسب شاه زمن

কবিতাটি তদানিন্তন নায়িবে উজীরে আজম হাসান আলী খান রচনা করেছিলেন। এর পুরস্কার হিসাবে তাকে তৎকালীন পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছিল (কায়সারুত তাওয়ারীখ, খঃ ১, পৃঃ ২৪৫)।

১৫৮. গাযীউদ্দীন হায়দারের মধ্যে একান্ত অবাস্তব বিষয়কেও বিশ্বাস করে নেওয়ার প্রবণতা অতিশয় শক্তিশালী ছিল। এ প্রবণতার দরুন তিনি নিজের জীবিত বন্ধুদেরকেও মৃত বলে ধারণা করে নিতে কোন দ্বিধা করতেন না। তার উজীরে আজম ছিলেন মুতামাদুদ্দৌলা আগাসীর। যিনি বাদশার এ অলীক বিশ্বাস প্রবণতাকে আরো বৃদ্ধি করার কাজেই নিজের সকল মেধা ও চিন্তা নিয়োজিত রাখতেন। এটি গাযীউদ্দীন হায়দারেরই কৃতিত্ব যে, তিনি নিজের আন্দাজে আইম্মায়ে কিরাম (শীয়াগণ যাদেরকে নিজেদের ইমাম বলে দাবী করে)-কেও কুমারী প্রেমের আসক্ত বলে জ্ঞান করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি 'অস্পর্শ' নামে একটি নতুন প্রথাও জারী করেন। অর্থাৎ কোন কুমারী কন্যাকে ইমামদের কোন একজন যিনি সহস্র বছর পূর্বে ইন্তেকাল করে গেছেন তার সহিত বিবাহ দিয়ে ঐ কুমারীকে 'অস্পর্শ' ঘোষণা করতেন। অস্পর্শ কুমারীর জন্য আইন ছিল সে পরে অন্য কারুর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, তার জন্য রাজকীয়ভাবে মহলের ব্যবস্থা করা থাকবে। সেখানে সে মনের আনন্দে নাচগান ইত্যাদি করে যাবে। তার সেবাযত্নের জন্যও লোকজন নিযুক্ত থাকত। শাহী দরবার থেকে সেবকদের জন্য রীতিমত অযীফা বরাদ্দ হত। এদিকে নগরের সব মহল্লায় ইচ্ছুক লোকজনের জন্য উক্ত অনুমতি থাকত যে, তারা যে কোন মূহুর্তে কুমারী অস্পর্শদের সঙ্গ ও বরকত লাভ করতে পারবে। অলীক কল্পনাপুজা ও নির্বুদ্ধিতার দ্বিতীয় কোন উদাহরণ ইতিহাসে হযত পাওয়া দুর্লব। কথিত আছে একবার গাযীউদ্দীন হায়দার কোন ব্যক্তিকে তলব করেছিলেন। কিন্তু উজীর আজম মতামাদুদ্দৌলা সেই ব্যক্তির উপস্থিতি শুভঙ্কর মনে করেন নি। কাজেই তিনি বুদ্ধি করে বাদশাহকে শুনিয়ে দিলেন যে, লোকটি তো জীবিত নেই, তার মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। এর

কয়েকদিন পরই হঠাৎ কোথাও থেকে লোকটিকে বাদশা নিজেই সামনে দেখতে পেলেন। বাদশা আদেশ দিলেন লোকটিকে উপস্থিত কর। বলা বাহুল্য এ মূহুর্তটি মহামাদুদ্দৌলার জন্য অতি ভয়ানক মূহুর্ত ছিল। নিজের মিথ্যাচারিতা স্পষ্ট ধরা পড়ছে। কিন্তু তড়িৎ বুদ্ধি তাকে বাঁচিয়ে দেয়। অর্থাৎ উজীর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল 'অধম তাকে মানবীয় চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে না। এটি আমাদের পীর ও মুরশিদ বাদশারই কৃতিত্ব যে, তিনি রূহ জগতে অবস্থিত মানুষকেও ইহজগতের ন্যায় দেখার যোগ্যতা রাখেন'। উপস্থিত অন্য দরবারী লোকেরাও উজীরে আজমের সুরে সুর মিলিয়ে আওয়াজ দিল। মোট কথা তখন বাদশার মুখে হল সে তো ঐ, সে তো ঐ। আর অন্য সকলের মুখে হল কোথাও দেখছি না তো, কোথাও দেখছি না তো। অবশেষে বাদশাহ সালামতও আস্থা করে নিলেন যে, লোকটির বাস্তব দুনিয়ার দেহ দেখা হয় নি বরং কবর জগতের দেহই আমি প্রত্যক্ষ করেছি (তারীখে উধ, পৃঃ ১৩৫, ১৫৯ খঃ ৪)।

১৫৯. তৎকালের সাহিত্য চর্চার ইতিহাস দ্রষ্টব্য। হাকীম মুহাম্মদ নাজমুল গণী তার 'তারীখে উধ, গ্রন্থে এ ব্যাপারে মোটামুটি আলোচনা করেছেন (প্রাগুক্ত খঃ ৪, পৃঃ ১০২, ১০৪)।

১৬০. তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতকের একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম ও পন্ডিত ব্যক্তি। তার রচিত গ্রন্থাবলি অদ্যাবদি সুক্ষদর্শী আলেমদের দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে আছে। তিনি ফিরিঙ্গী মহলকেন্দ্রিক আলেমদের প্রধান পূর্বসূরী মাওলানা কতবুদ্দীন শহীদের পৌত্র ও বিখ্যাত আলিম মোল্লা নেযামুদ্দীনের পুত্র ছিলেন। এই মোল্লা নেযামুদ্দীন ছিলেন ঐ ব্যক্তি যিনি দরসে নেযামীর শিক্ষা পদ্ধতি চালু করে গিয়েছেন যা অদ্যাবদি মুসলিম সমাজে অব্যাহত রয়েছে। মাওলানা আবদুল আলী সাহেব ইলমে জাহিরী ও ইলমে বাতেনী উভয় বিভাগেই উচ্চতর দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তবে লক্ষ্ণৌ শহরে তিনি স্বল্পকালই অবস্থান করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি হাফেজুল মুলক হাফেয রহমত খানের কাছে ছিলেন। তার শাহাদাতের পর রামপুর সরকারের প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব ফয়জুল্লাহ খানের দরবারে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। অতঃপর মুনশী সদরুদ্দীন বিহারী সাহেব তাকে খুবই সম্মান ও ইজ্জতের সঙ্গে বিহার নিয়ে আসেন। এখানে তার শিক্ষাদানের আসর অতি জমজমাট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছুকাল পর থেকে মুনশী সাদরুদ্দীনের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কর্ণাটকের রঈস নওয়াবওয়ালা জাহ মুহাম্মদ আলী খান তাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন। মুনশী সদরুদ্দীনের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি সংবাদ জেনে তিনি মাওলানা আবদুল আলী সাহেবের নামে চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানান। বাহরুল উলূম মাওলানা আবদুল আলী আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ও মাদ্রাজ যাত্রা করেন। এদিকে নওয়াব সাহেব দরবারের গণ্যমান্য সদস্য ও স্থানীয় আমীরদের সঙ্গে নিয়ে জাকজমকপূর্ণ ভাবে তাকে এস্তেকবালের জন্য অগ্রসর হন। নিজ খাস মহলে তার আতিথ্যের আয়োজন করেন। নওয়াব সাহেব তাকে 'মালিকুল ইলামা' (উলামা সম্রাট) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তার শিক্ষাদান কার্য-পরিচালনার জন্য বিশাল আয়তনের একটি শিক্ষাগার নির্মাণ করে দেন। নওয়াব ওয়ালা জাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র উমদাতুল উমারা ও তার পরে

নওয়াব আযীমুদ্দৌলা-এর সকলে বাহরুল উলূমের প্রতি শ্রদ্ধাদৃষ্টি অব্যাহত রাখেন। হিজরী ১২২৫ সালে তার ইন্তেকাল হয়। তিনি ৮৩ বছর বেঁচে ছিলেন। মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ ওয়ালা জাহ জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে তার মাজার অবস্থিত (তায়কিরায়ে উলামায়ে হিন্দ)।

১৬১. আহওয়ালে উলামায়ে ফিরিঙ্গী মহল, পৃঃ ২৫

১৬২. মাওলানা আবদুর রব সাহেব, ইনি নিজ পিতা (বাহরুল ইলূম মাওলানা আবদুল আলী সাহেব)-এর কাছে পাঠ্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন অধ্যয়ন শেষে পিতার সঙ্গে শাহজাহানপুর, রামপুর, বিহার ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করেন অবশেষে লক্ষ্ণৌ এসে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অধ্যাপনার ধারা অব্যাহত রাখেন। পরে পুনর্বার মাদ্রাজে চলে গেলে নওয়াব আযীমুদ্দৌলা তাকে 'সুলতানুল উলামা' উপাধিতে ভূষিত করেন। পিতার পরিচালিত মাদরাসা তার ওপর অর্পিত হয়। কিন্তু মাওলানা আবদুর রব মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্ব তার ভাতষ্পুত মাওলানা আবদুল ওয়াজিদের হাতে সোপর্দ করে তিনি লক্ষ্ণৌ প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে দিল্লীতে হযরত শাহ আবদুল আযীযের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে শাহ সাহেব তাকে আন্তরিক অতিথ্যে বরণ করেছিলেন। হিজরী ১২৫৩ সালে তাব ওয়াত হয় (নুযহাতুল খাওযাতির, সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ ও তাযকিরায়ে উলামায়ে হিন্দু) হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ) যে কালে লক্ষ্ণৌ অবস্থান করছিলেন সেকালে বাহরুল উলূম মাওলানা আবদুল আলী সাহেব মাদ্রাজে অধ্যাপনারত ছিলেন।

১৬৩. মির্জা হাসান আলী সাগীর মুহাদ্দিস লক্ষ্ণৌবীর বাড়ি ছিল ইযাইয়াগঞ্জ। তিনি মীরক জামালুদ্দীন উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তার ওরফী নাম মির্জা। হাদীসের সনদ হযরত শাহ আবদুল আযীয থেকে গ্রহণ করেন। হাজার হাজার আলিম তার ইলমী যোগ্যতা থেকে উপকৃত হয়। নাসীরুদ্দীন হায়দারের রাজত্বকালের শেষ দিকে তিনি কলেরা রোগে মারা যান। তিনি শাফেয়ী ফিকহের অনুসারী ছিলেন (তাযকিরায়ে উলামায়ে হিন্দ) ফিরিঙ্গী মহলের আলিমগণও তার কাছ থেকে ইলমী উপকার লাভ করে (তারাজিমে উলামায়ে হাদীস, হিন্দ)।

১৬৪. মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব ছিলেন লক্ষ্ণৌ শহরের অন্যতম শিক্ষাবিদ। তার পিতার নাম নিয়ামত উল্লাহ। বংশগতভাবে ছিলেন সিদ্দীকী খান্দানের। পূর্ব পুরুষের মূল বাড়ি কাশ্মীরে ছিল। কিন্তু পরে দীর্ঘকাল থেকে এ খান্দান লক্ষ্ণৌ অবস্থান করে আসে। তিনি পাঠ্য কিতাবাদির কতিপয় মাওলানা মাখদূম হোসাইনী লক্ষ্ণৌবীর নিকট অধ্যয়ন করেন। তবে অধিকাংশ কিতাব অধ্যয়ন করেছিলেন আল্লামা নূরুল হক ফিরিঙ্গী মহলের নিকট। তারপর হাদীসের অধ্যাপনা অব্যাহত রাখেন। তিনি বেশ অনেকগুলো গ্রন্থও রচনা করে যান। হিজরী ১২৪৪ সালের ১৭ই সফর তার ইন্তেকাল হয় (নুযহাতুল খাওযাতির, সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ পৃঃ ১৩৮ সূত্রে)।

১৬৫. মাওলানা আবুল হাসান নাসীরাবাদী ছিলেন হযরত মাওলানা নিয়ামুল্লাহ বাহরাইচীর যোগ্য খলীফা। তার সম্পর্কে তাযকিরায়ে উলামায়ে হিন্দ গ্রন্থে বলা হয় ঃ

عالمے را از ظلمات شرک وبدعت نجات بخشید وباتباع سنت سندی
کشید، دوم شعبان سنه دو ازده وصد وہفتاد هجری رحلت فرمود

অর্থাৎ তিনি বিশাল এক ভূখন্ডকে শিরক ও বিদআতের অন্ধকার থেকে মুক্তি দেন এবং সুন্নত অনুসরণের পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করেন। হিজরী ১২৭০ সালের ২রা শাবান তার ইন্তেকাল হয় (তাযকিরায়ে উলামায়ে হিন্দ, পৃঃ ৩)।

১৬৬. সুবহান আলী খান লক্ষ্ণৌবী প্রথম জীবনে ইংরেজ অফিসে তহসীলদারের চাকুরী করতেন। তার যোগ্যতা ও দক্ষতা লক্ষ্য করে নওয়াব সাদাত আলী খান তাকে নিজের কাছে ডেকে নেন এবং সম্মানিত পদে নিযুক্ত করেন। এমন কি গাযীউদ্দীন হায়দারের শাসনামলে তার এক পুত্র নায়েবে উজীরে আজমদ পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ)।

১৬৭. আল বাকিয়াতুস সালিহাত ও আশ শামছুযযোহা ইত্যাদি তারই রচিত গ্রন্থাবলী (ঐ)।

১৬৮. তিনিও ইংরেজ অফিসের তহসীলদার ছিলেন। নওয়াব সাদাত আলী খানের রত্ন-সন্ধানী দৃষ্টি তাকে লক্ষ্ণৌ ডেকে আনে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তিনি যুগের এরিস্টটল বলে পরিচিত ছিলেন। চব্বিশ লক্ষ টাকা বাৎসরিক আমদানীর এলাকা সুলতানপুর তাকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করা হয়েছিল (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ)।

১৬৯. কারণ ১৮০১ সালে গাযীউদ্দীন হায়দারের পিতা নওয়াব সাদাত আলী খানের সঙ্গে যে চুক্তিপত্র সাক্ষরিত হয় তাতে বলা হয়েছে যে, নওয়াব সাদাত আলী খান কেবল ৪টি তেলঙ্গী সৈনিকের পল্টন, ১টি মেওয়াতী ও পদাতিকদের পল্টন, ২ হাজার অশ্বারোহী ও ৩ শত গোলন্দাজ নিজের কাছে রাখবেন। আর অবশিষ্ট সৈনিকদেরকে বিদায় করে দিবেন। তার অধিকৃত অঞ্চল সমূহের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব ইংরেজ সরকারের ওপর ন্যাস্ত থাকবে। এতদুপলক্ষ্যে ইংরেজ সরকার প্রয়োজন পরিমাণে সৈনিক নিয়োজিত রাখবে (কায়সারুত তাওয়ারীখ, খঃ ১, পৃঃ ১৬৬)।

১৭০. কান্দাহারী ছাউনীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইউসুফ খান কান্দাহারী। তিনি পূর্বে হাফিয রহমত খানের সৈন্য রিসালদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর হাফিয রহমত খানের বাহিনী থেকে চাকুরী ত্যাগ করে শুজাউদ্দৌলার বাহিনীতে গিয়ে যোগ দেয়। দক্ষতা ও যোগ্যতার দ্বারা তিনি শুজাউদ্দৌলার সুনজর অর্জনে সক্ষম হন। শুজাউদ্দৌলা তাকে তৎকালের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মকর্তা রিসালদার পদে উন্নীত দেন। তার ওপর সিপাহী ভর্তি করা, অপসারিত করা ইত্যাকার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত থাকে। রণদামামা, পতাকা, সামরিক বেজ ইত্যাদিও তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইউসুফ খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুর রহমান খান রিসালদার হন। প্রথম দিকে তার নিয়ন্ত্রণে ৫ শত অশ্বারোহীর দায়িত্ব ন্যাস্ত ছিল। ইংরেজ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাকে মারাঠাদের মোকাবেলা করার জন্য দক্ষিণ ভারতে পাঠানো হয়েছিল। তাতে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন দ্বারা প্রশংসিত হন এবং পদোন্নতি লাভ করেন। ১৭ শত সিপাহীর নিয়ন্ত্রণ তার দায়িত্বে অর্পন করা হয়। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ)-এর কালে আবদুর রহমান খানের পুত্র আবদুল হাদী খান তার পৌত্র (অর্থাৎ হাবীবুল্লাহ খানের পুত্র) খলীলুল্লাহ খান জীবিত ছিলেন।

১৭১. ফকীর মুহাম্মদ খান ছিলেন ফররুখাবাদের ওয়ালী বখশী মাহমুদ খানের অধঃস্তন সন্তান। প্রথম দিকে তিনি নওয়াব আলী খানের বাহিনীতে চাকুরী করেন। কিন্তু আলী খানের শক্তি বিধ্বস্থ হয়ে গেলে তিনি লক্ষ্ণৌ চলে আসেন। স্বল্পকালের মধ্যেই উন্নতি করে নায়িবে জেনারেল পদ পর্যন্ত পৌঁছে যান। সায়্যিদ সাহেব লক্ষ্ণৌ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে ফকীর

মুহাম্মদ খানের জন্য উজীরে আজমের পক্ষ থেকে রাজকীয় এনাম প্রেরণ করা হয়। নগদ দশ হাজার টাকাসহ হাতী, পালকী, পাগড়ী, রুমাল, তলোয়ার ও আরো অনেক আসবাবপত্র এ এনামের মধ্যে ছিল। তার মাসিক বেতন এক হাজার টাকা নির্ধারিত হল। তাছাড়া নিজের নিয়ন্ত্রণে ১৫ শত অশ্বারোহী ও ২ হাজার পদাতিক সৈন্য রাখার অনুমতি দেওয়া হল। ফকীর মুহাম্মদ খান একজন নির্ভীক ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। কবিতা ও পদ্য রচনার রুচিও ছিল। তার ছদ্মনাম ছিল 'গুয়া'। রচিত কবিতাগুলোর একটি কাব্যগ্রন্থও আছে (সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ গ্রন্থের টীকা, পৃঃ ১২৫)।

১৭২. হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ যদিও আগামীর নায়িবুস সালতানাতের আমন্ত্রণ পেয়ে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছেন তবুও তিনি নিজের জন্য কোন এস্তেগবাল কিংবা সমারোহের আয়োজন করা হোক তা পছন্দ করেন নি। এ কারণে যাত্রার প্রাক্কালে তাদেরকে সংবাদ পাঠিয়ে অবগতিও করেন নি। কেবল এতটুকু যে, তার নিজের এক ভাতষ্পুত্র সায়্যিদ আবদুর রহমান যিনি লক্ষ্ণৌতে সামরিক অফিসার পদে চাকুরী করতেন এবং কান্দাহারী সেনা ছাউনীতে অবস্থান করতেন–তাকে রায়বেরেলী থেকে নিজের সঙ্গে করে আনেন। তারপর প্রথম যাত্রা বিরতি লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী একটি স্থানে করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যুষে খুব ভোর বেলায় যেন নগরে পৌঁছা যায়। সায়্যিদ সাহেব রাতেই ইশার নামাযের পর সায়্যিদ আবদুর রহমানকে বললেন ঃ

রাতের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতেই তুমি সুম্মখে অগ্রসর হয়ে কান্দাহারীদের ছাউনীতে একটি জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে বিছানা বিছিয়ে রাখবে। আর কিছু পরিমাণ ভূনা চনাবুট, লবণ, মরিচ, সামান্য গুড় যোগাড় করে রাখবে (ওয়াকায়িয়ে আহমদী)।

কথামতে সায়্যিদ সাহেব কান্দাহারীদের ছাউনীতে প্রত্যুষে এসে পৌঁছলেন। প্রয়োজনীয় কাজকর্ম থেকে অবসর হওয়ার পর তিনি ও তার সাথীগণ চনাবুট ও গুড়ের নাস্তা করেন। তারপর পানি পান করে সকলে আরাম করলেন। যোহর নামাজের সময় পর্যন্ত তার আগমন সংবাদ চতুর্দিকে জানাজানি হল। সাক্ষাতের জন্য লোকজন আসতে শুরু কররল। আমীর উমরাদের অনেকেই তার খেদমতে হাজির হয়ে হাদিয়া, তোহফা পেশ করতে শুরু করল। তখন অনতিবিলম্বেই অবস্থান স্থলের বিষয়টিও পরিস্কার হয়ে যায়। হাদিয়া পেশকারী আমীরদের হাদিয়া নিম্নরূপ ছিল ঃ

মুহাম্মদ হাসান খান ৫টি স্বর্ণমুদ্রা, খলীলুল্লাহ খান ৪টি স্বর্ণমুদ্রা, মুস্তফা খান ইবনে হাসান খান ৩টি স্বর্ণমুদ্রা, আবদুর রহীম খান ৩টি স্বর্ণমুদ্রা ও আবদুল মাবূদ খান ২টি স্বর্ণমুদ্রা (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ পৃঃ ১৬৯)।

ক্যাপ্টেন আসাদ আলী বেগ ও রিসালদার আশরাফ বেগ তাকে শহরে নিয়ে যায়। তারপর প্রথমে মীর মিশকীনের প্রাসাদে এবং পরে শায়খ ইমাম বশখ বণিকের বাড়িতে অবস্থানের সিদ্ধান্ত করা হয়।

১৭৩. এ নযরানার মধ্যে ছিল দু' প্রকারের দুই থান উন্নতমানের কাপড়। মূল্যবান একটি আতরদান ও এলাচি ভর্তি একটি পানদান (সীরাতে.... পৃঃ ১২৫)।

১৭৪. প্রাগুক্ত

১৭৫. এক জুমআর ওয়াজে উলামা ও মাশায়েখের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ওয়াজের পর সকলে তার হাতে মুরীদ হন। উপস্থিত আলিমদের মধ্যে তখন ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ

আশরাফ, মাওলানা মখদুম সাহেব, মাওলানা ইমামুদ্দীন সাহেব বাংলাদেশী, মাওলানা নাসীলুদ্দীন শাহেবের ভ্রাতা মাওলানা ইমামদ্দীন লক্ষ্ণৌবী, মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফের শিষ্য মাওলানা আবদুল বাসিত, মাওলানা আবুল হাসান সাহেব নাসীরাবাদী, মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব, মাওলানা রহীমুল্লাহ সাহেব ফিরিঙ্গী মহল্লী, মাওলানা নজীবুল্লাহ সাহেব বাংলাদেশী, শাহ ইয়াকীমুল্লাহ সাহেব, তারই সাহেবজাদা মৌলভী আবদুল ওয়াহহাব সাহেব ও লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মীর উমীদ আলী সাহেব প্রমুখ। তাদের অধিকাংশ মসজিদের ভিতরই মুরীদ হন। তবে মৌলভী মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব, মৌলভী মখদূম সাহেব ও মৌলভী আবুল হাসান সাহেব প্রমুখ ঐ দিন বাড়ির ভিতর গিয়ে মুরীদ হন (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ পৃঃ ১৩৮)। মাওলানা বেলায়েত আলী সাহেব আযীমাবাদী যাকে এ আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় (অত্র গ্রন্থের চতুর্থ অংশে তার সম্পর্কীয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) তিনিও এ মজলিসে নিজের উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব সহ মুরীদ হন।

১৭৬. রিসালদার সিপাহীগণ হযরত সায়্যিদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, 'রিসালদার মেন্ডু খান সে সকল অতিথি মুসাফিরদের প্রতি কোন খেয়াল দেয় না যারা এ দিকে এসে থাকে। আর আমাদের নিজেদের কাছেও এতটুকু সাধ্য নেই যে তাদের সেবা করতে পারি। ফলতঃ অনেক মুসাফির যারা এদিকে বেড়াতে আসে তাদেরকে অভুক্ত ও খালি পেটে রাত অতিবাহিত করতে হয়।' সেমতে সায়্যিদ সাহেব মেন্ডুখানকে এ ব্যাপারে সচেতন করে দেন। তার কাছে মেন্ডুখান এ অঙ্গীকারও ব্যক্ত করে যে, আগামীতে তিনি প্রতিটি মুসাফিরের ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন আর তিনি যা আহার করবেন সেটিই মুসাফিরদেরকে আহার করতে দিবেন।

১৭৭. মেন্ডুখান পরিচালিত অশ্বরোহীদের উর্দী অদ্ভুত ধরনের ছিল। রিসালদার নামটিও ছিল হাস্যস্পদ। তাদেরকে 'লু লু-এর ওয়ার' বলা হত। সায়্যিদ সাহেবের কাছে মেন্ডুখান এ নামের পরিবর্তন ও তার নিজের পদোন্নতির ব্যাপারে দু'আ চেয়েছিলেন। তিনি দু'আ করেন। কাজও তেমনই ঘটে। সায়্যিদ সাহেব লক্ষ্ণৌ থেকে প্রত্যাবর্তনের দুমাস পরই রিসালদার নাম পরিবর্তিত হয়ে গেল। মেন্ডুখানকে পদোন্নতি দিয়ে খায়রাবাদ ও বাহরাইচ অঞ্চলের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হল। জীবনী লেখকগণ এটি সায়্যিদ সাহেবের দু'আর বরকত বলে অভিহিত করেছেন। আমরা তাকে দু'আ করার পাশাপাশি তিনি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলেও মনে করি। কারণ কোনই অসম্ভব নয় যে, তিনি আল্লাহ পাকের কাছে দু'আও করেছেন। আবার যাত্রার প্রাক্কালে মুতামাদুদ্দৌলার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার যে একান্ত বৈঠক চলেছিল সেখানে তিনি খুব সম্ভাব মেন্ডুখানের পদোন্নতির জন্য সুপারিশও হয়ত করেছিলেন।

১৭৮. রিসালদার মেন্ডুখান প্রমুখ যাদের সম্পর্ক হযরত সায়্যিদ আহমদের সহিত ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল এ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর সরকার তাদের জায়গীরের পরিধি ও পদমর্যাদা আরো বৃদ্ধি করেন। কিন্তু তাদেরকে এসব দিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেন। ফকীর মুহাম্মদ খানকে মুহাম্মদী লক্ষীপুরের অঞ্চল জায়গীর হিসাবে প্রদান করা হল। আর মেন্ডুখানকে দায়িত্ব বৃদ্ধি করে পাঠিয়ে দেওয়া হল খায়রাবাদ ও বাহরাইচ এলাকায়। বলা বাহুল্য ইংরেজ কূটনীতি সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিদের কাছে এখানে পদোন্নতি দানের

তুলনায় রাজধানীর বাইরে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আসল উদ্দেশ্য ছিল যে, হযরত সায়্যিদ সাহেব এক দীর্ঘ সময় এখানে সৈনিকদের মধ্যে অবস্থানের দরুন যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা নস্যাৎ করে দেয়ার লক্ষ্যেই তাদেরকে নগরের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৭৯. এই মতামাদুদ্দৌলা আগাসীর নায়েবুস সালতানও যিনি চিঠি লিখে সায়্যিদ সাহেবকে আমন্ত্রণ করেছিলেন তিনিই সায়্যিদ সাহেবের একান্ত মুরীদ ফকীর মুহাম্মদ খানের মাধ্যমে এ ধমকী উচ্ছাচরণ করে পাঠান যে, যদি সায়্যিদ সাহেব শীঘ্রই লক্ষ্ণৌ শহর ত্যাগ না করেন তা হলে দু'চারটি তোপের আঘাতে তার অবস্থানস্থল গুড়িয়ে দেওয়া হবে। অধ্যাপক গোলাম রাসূল মিহির কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন, সায়্যিদ সাহেবের কাছে মুরীদ হতে ইচ্ছুক লোকদের মধ্যে অনেক শীয়াপন্থীরাও যোগ দেয়। এতে শীয়া নেতৃবৃন্দের মনে ক্ষোভের উদ্রেক ঘটে। তারা সায়্যিদ সাহেবকে শীয়াদের মুরীদ করতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হন নি। তারপরই নেতৃবৃন্দ হযরত সায়্যিদ সাহেবকে নগর থেকে সরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

১৮০. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ১৫২।

সায়্যিদ সাহেব ও তার দ্বিতীয়বারের কাফেলা

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ) লক্ষ্ণৌর সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কয়েক মাস পর্যন্ত রায়বেলী অবস্থান করেন। তারপর শুরু হল তার দ্বিতীয়বারের ঐতিহাসিক সফর কর্মসূচি।[১৮২]

সফরের উদ্দেশ্য

এ সফরের উদ্দেশ্য বাহ্যিক ঘোষর্ণার মধ্যে কেবল এতটুকুই বলা হয়েছে যে, হজ্জের ফরয হুকুম পালনার্থে এ সফর করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে একটি জটিল প্রশ্ন রয়ে যায় যা অবশ্যই বিবেচনাযোগ্য। প্রশ্নটি হল ঃ সায়্যিদ সাহেব ও তার সাথীদের ওপর হজ্জ করা তখন ফরয ছিল কি ? তা ছাড়া যে পরিস্থিতিতে তিনি ও তার সঙ্গীগণ এ সফর করেন সে পরিস্থিতি কি এতটুকু মানের যেখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে হজ্জ ফরয হতে পারে।

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে হজ্জ তখন ফরয হয় যখন ব্যক্তির মালিকানায় নিজের পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় সম্পদ থেকে অতিরিক্ত এতটুকু পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে যার দ্বারা হজ্জের সফর সহজভাবে পূর্ণ করা সম্ভব। বলা বাহুল্য সায়্যিদ সাহেব ও তার সঙ্গীদের আর্থিক অবস্থা মোটেও এ মানের ছিল না। তাদের মধ্যে দারিদ্রতা এত প্রচন্ড ছিল যে, দু'বেলার আহর জুটানোও তাদের পক্ষে ছিল কষ্টকর ব্যাপার।

জীবনী লেখকগণ অবশ্য তার এ সফরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, তৎকালের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সংশোধন করণার্থে এ সফর করা হয়। অর্থাৎ তখন খ্রিস্ট্রিয় অষ্টাদশ শতকে নৌপথের ওপর[১৮৩] পুর্তগালীদের সন্ত্রাসের দরুন কতিপয় আলিম হজ্জ ফরয নয় বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন। ফলতঃ ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে এ ধারণা বিস্তার লাভ করে যে, পথ নিরাপদ নয় বলে ভারতীয়দের জন্য হজ্জ করার বিধান নেই। কাজেই হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ ও সাথীগণ নিজেরা হজ্জ পালের মাধ্যমে সেই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্যোগ নেন। এ ব্যাপারে জীবনী লেখকগণ হযরত মাওলানা আবদুল হাই ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (রহ)-এর একটি ফরতওয়া যেখানে হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভীর সত্যায়ন [১৮৪] ও বিদ্যামন তা দলিল হিাবে পেশ করে থাকেন।

কিন্তু জীবনী লেখকবৃন্দের এ অভিমতের ওপর আমরা পূর্ণ তৃপ্ত নই। কারণ একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সংস্কার ও সংশোধন করার জন্য বিশুদ্ধ ফতওয়ার প্রকাশ করাই যথেষ্ট। তা সংশোধন করার জন্য এত বিশাল পথের সফর অবলম্বন করার আদৌ প্রয়োজন নেই। শরীয়তের দৃষ্টিতে এহেন প্রতিরোধ উদ্যোগ কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বিচেনার দাবী রাখে। কাজেই এমন সন্দেহযুক্ত বিষয়টি হযরত সায়্যিদ সাহেব ও তার সচেতন শিষ্যরা মনে করে থাকবেন বলে ধারণা করা তাদের উচ্চমর্যাদা পরিপন্থি কথা।

এ সফরের বিস্তারিত বিবরণে যা বর্ণিত আছে তা থেকে বুঝা যায় যে, সায়্যিদ সাহেব ও সঙ্গীদের (যাদের সংখ্যা সবশেষে আটশত পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল) পাথেয় ছিল একমাত্র মহান আল্লাহর ওপর আস্থা ও ভরসা। বাড়ি থেকে যখন তারা যাত্রা শুরু করেন তখন তারা সম্পূর্ণ রিক্ত হস্ত ও কপর্দকহীন। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস আছে হেতুই যাত্রা শুরু করেন। এহেন অবস্থার ওপর হজ্জ ফরয হওয়া তো কল্পনাই করা যায় না বরঞ্চ এ অবস্থায় হজ্জের সফর করা কতটুকু বৈধ তাও সন্দেহযুক্ত ব্যাপার [১৮৫]।

সঙ্গীদের কতিপয় আত্মত্যাগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিজেদের মালিকানাধীন সহায়-সম্পদ, ভূ-সম্পত্তি, স্থাবর-অস্থাবর মালামাল যা ছিল সব বিক্রয় করে সফরে শরীক হন। এ ত্যাগ ও কুরবানী নিঃসন্দেহে প্রশংসা অর্জনের দাবী রাখে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত মানুষকে কখনও এ কাজের আদেশ দেয় নি এবং এমন ত্যাগী ও কুরবানী দাতাদের ওপর হজ্জের ফরয হুকুমও আরোপিত হয় না।

মোদ্দা কথা হল ত্যাগ-তিতিক্ষার ইতিহাসে এ সফরের তুলনা ইতিহাসে বিরল। যে কোন মানুষের কাছে এ সকল ত্যাগের উদ্দেশ্য ছিল। যদিও একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের সংশোধন করা হয়ে থাকল তা হলে এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা হয়ত ভিন্ন রকমের হতে পারে। শরীয়ত কখনও এ কথা বলে না কিংবা এমন কাজের অনুমতি দেয় না যে, ভ্রান্ত বিশ্বাসের সংশোধনার্থে এমন কাজ করা হবে যা নিজেই শরীয়তের কাছে সন্ধিঘ্ন। (مشتبه) তা ছাড়া যদি ভ্রান্ত আকীদার সংশোধন করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে তাহলে সক্ষম কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিলে কিম্বা তাদেরকে নিয়ে হজ্জ করে আসলেই তো যথেষ্ট ছিল। কাফেলা বানিয়ে এত কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন হত না।

এশীয় ব্লক গঠনের প্রয়োজনীতা

বাস্তব কথা হল যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজনীতিবিদগণ গত পঞ্চাশ বছর পূর্বেই এ কথা অনুভব করে নিয়েছেন যে, বহির্দেশীয় সাহায্য ব্যতিরেকে হিন্দুস্তানের ওপর থেকে ইংরেজ আধিপত্য নির্মূল করা সম্ভব হবে না [১৮৬]। এ কারণেই সুলতান ফতহে আলী খান টিপু ফরাসীদের সঙ্গে গোপন আতাতে মিলিত হয়েছিলেন। সে কালে সুলতান টিপু যদি ফরাসীদের সামরিক সাহায্য লাভে সক্ষম হতেন তা হলে ভারতবর্ষের মানচিত্র ভিন্ন রকমের দেখা যেত। মারাঠাগণও বহির্দেশীয় সাহায্য প্রয়োজনের বিষয়টি অনুভব করেছিল। সে কারণে তাদের ফৌজের মধ্যে ফরাসীদের একটি বিরাট দলকে স্থান করেও দিয়েছিল।

এ সব ছিল পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। তারপর হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের জীবনকালে পৌঁছে ইংরেজদের ক্রমোন্নতি আরও পঞ্চাশ ডিগ্রী ওপরে চলে গিয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতীয়দের শক্তি পঞ্চাশ ডিগ্রী নীচে নেমে আসছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় কোন রাজা বা কর্ণধারের ওপর ভরসা করে বিজয়ের আশা করা নিরর্থক বৈ কিছুই নয়। উপরন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ভারতীয় রাজন্যবর্গের যে কি চরিত্র তা সায়্যিদ সাহেব নিজেই প্রত্যক্ষ করছেন। ইংরেজদের তরফ থেকে সবুজ বাগান দানের প্রলোভন সামনে আসলে হোলকার [১৮৭] হোক আর আমীর আলী খান[১৮৮] কারুর মধ্যেই অবিচলতা অবশিষ্ট থাকে না। তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে যিনি বৃহত্তর ক্ষমতার অধিকারী ও যাকে দৃঢ়চেতা যোদ্ধা মনে করা হত, পাঞ্জাব, মুলতান ও সিন্ধু প্রদেশ যার একচ্ছত্র অধিকারে ছিল তিনিও[১৮৯] তখন পরামর্শ দিয়ে বলেন ঃ

কোম্পানী সাহেবদের সাথে যুদ্ধ করা ভুল হবে। বরং রাজ্য লাভ কর এবং আরামে শাসন চালাও।

মোটকথা সকল অন্ধকার ও নিরাশার এ যুগে সফলতা লাভের শুধু এ বিকল্পই ছিল যে ঃ

ক. গণমানুষের মনে বিপ্লবের চেতনা সৃষ্টি করা।

খ. ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মোকাবেলায় এশীয় শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা।

ধর্মীয় শিরোনামের প্রয়োগ

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী যে চিন্তাধারা দিয়ে গিয়েছেন তার আলোকে এশিয়ান শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধতা অর্থনৈতিক বিষয়ের ভিত্তিতে রচিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিষয়গুলো সমাজে সে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি যার ভিত্তিতে বিপ্লবের চেতনা সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। তবে ঐ কালে ধর্মীয় চেতনা মানুষের মধ্যে জীবন্ত ছিল[১৯০]। ধর্মের নামের ওপর বিপ্লব কার্যকরী করার লক্ষ্যে বড় থেকে বড় ধরনের উদ্যোগ ও সফলতা লাভ করা সহজ ছিল। তাছাড়া এশিয়ার ক্ষমতাসীন শক্তিগুলো যাদের সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্ক দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই বিদ্যমান–এরা সকলেই অভিন্ন ধর্মমতের ধারক বাহক। এহেন পরিস্থিতির আলোকে বিপ্লবী ও রাজনৈতিক ঐক্যজোট স্থাপনের পথে ধর্মীয় শিরোনামের পথ নিঃসন্দেহে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ। অবস্থার দাবী অনুসারে এ পথে সফলতা সম্ভাবনাও অন্য যে কোন পথের তুলনায় অনেক বেশি।

সফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

সায়্যিদ সাহেব যে প্রেক্ষাপটে হজ্জের ঘোষণা দিয়েছিলেন সেটি তাদের ওপর হজ্জ ফরয প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ তার নিজের ওপরে যেমন হজ্জ ফরয ছিল না তদ্রুপ তার সাথীদের ওপরও নয়। তবে বিপ্লব ফরয হওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে ঐ প্রেক্ষাপট যথেষ্ট বিবেচিত। কারণ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে যখন নিজ মাতৃভমির ওপর পর ধর্মীয় লোকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মুসলমানদের ওপর বিপ্লব ও জিহাদ ফরয হয়ে দাঁড়ায়। আবার তাও কেবল একটি দল বা গোষ্ঠীর ওপরই নয়, প্রত্যেকের ওপর তার নিজ চেষ্টার শেষ সীমানায় পৌঁছে হলেও জিহাদ করা ফরয। সেই ফরয হুকুম পালনার্থে যে কোন ধরনের ত্যাগ এখানে গৃহীত এবং যে কোন পদক্ষেপ এখানে প্রশংসার দাবী রাখে।

নিজের পরিবার-পরিজনকে অভূক্ত ও ক্ষুধার্থ রেখে নিজের সহায়-সম্পত্তি বিক্রয়পূর্বক মক্কা শরীফে হজ্জের জন্য যাওয়া জায়েয নয়। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি তার সফরটি জিহাদ ফী সাবীল্লিাহর উদ্দেশ্যে করে থাকে তবে এখানে প্রতিটি ত্যাগ ও প্রতিটি কদম মহা সওয়াবের কাজ। এ পথে অবতীর্ণ হওয়ার পর সেই

ধুলিকণাও দামী হয়ে যায় যা মুজাহিদের পায়ের ওপর উড়ে গিয়ে পড়ে, সেই ধুলা ময়লাও সম্মানের আসন লাভ করে যা মুজাহিদের কাপড়ে লেগে থাকে।

হযরত সায়িদ সাহেবের এ সফরের বাহ্যিক উদ্দেশ্য বায়তুল্লাহর যিয়ারত। কিন্তু এ যিয়ারতের অর্থ হুবহু ঐটিই যা ওয়ালী উল্লাহী দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, অর্থাৎ فك كل نظام তথা রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে সর্বাত্মক বিপ্লব সাধন করা। আর এ কারণেই দেখা যায় যে, হজ্জের আবশ্যিক কাজকর্ম শেষ করার পূর্বেই 'মিনা'-এর পবিত্র স্থান যেখানে প্রায় সাড়ে বারশত বছর পূর্বে প্রিয়নবী (সাঃ) তাঁর অনুসারী সাহাবীদের কাছ থেকে বাইয়াত নিয়েছিলেন সেখানে পৌঁছে হযরত সায়্যিদ সাহেব নিজের সঙ্গীদের কাছ থেকে জিহাদের বাইয়াত নেন[১৯১]।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এশিয়ান ব্লক গঠনের জন্য আটশত সঙ্গীর মহাকাফেলাসহ হজ্জের জন্য গমনের আবশ্যকতা কোথায় ? নিজের একান্ত কতিপয় সঙ্গীর সমন্বয়ে গঠিত কমিশন পাঠিয়েও এশীয় জাতিসমূহকে ঐক্যের আহবান করা যেত। তিনি নিজেও পরবর্তী সময়ে এভাবেই নিজের পয়গাম অন্য জাতির কাছে পাঠিয়েছেন বটে। কিন্তু এ প্রশ্ন তখনই উঠে যখন আন্দোলনের পূর্ণচিত্র সম্মুখে অনুপস্থিত থাকে।

বলা বাহুল্য যে, فك كل نظام-এর দাবী অনুসারে রাজনৈতিক বিপ্লব সাধনের পাশাপাশি সামাজিক বিপ্লব সাধন করাও ছিল এ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। যেন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনের পর সরকারি দায়িত্ব এমন ব্যক্তিবর্গের হাতে অর্পিত হতে পারে যারা নিজেরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং একটি উন্নয়নশীল সমাজের স্বার্থক সমাজকর্মী হিসাবে প্রমাণিত হতে পারেন। আটশত সদস্যের এ কাফেলা কেবল রাজনৈতিক কোন শোভাযাত্রাই ছিল না বরং এটি ছিল সঙ্গীদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণদানের একটি মহা-উপকরণ। যাকে আপাততঃ নজরে এক চলন্ত শিক্ষাগার ও খানকা বলা চলে যেখানে প্রশিক্ষণার্থীরা একদিকে প্রশিক্ষণ লাভ করছে আর অন্যদিকে জগতের দর্শকরা তাদেরকে দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছে। হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী বলেন ঃ

ইমাম শাহ আবদুল আযীয হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের বোর্ডকে প্রথমবার হিজরী ১২৩১ সালে তরীকত[১৯২] ও পীর মুরীদীর বাইয়াত

করানোর জন্য পাঠান। দ্বিতীয়বার হিজরী ১২৩৬ সালে তাদেরকে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য সফরে প্রেরণ করেন। তারপর তিনি তাদেরকে পূর্ণ কাফেলাসহ হজ্জে যাওয়ার নির্দেশ দেন যেন তাদের নিজেদের মধ্যে সাংগঠনিক রীতিনীতি ভালভাবে রপ্ত হতে পারে[১৯৩]।

দ্বিতীয় সফরের সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী

উল্লেখিত ভূমিকার পর নিম্নে এ সফর সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী লক্ষণীয়।

কানপুর ঃ ইতিপূর্বে ফোড়া জাহানাবাদ, মুজায়াম কাজওয়া, ফতহেপুর ও ডিলমুয়ী ইত্যাদি অঞ্চল থেকে দীর্ঘদিন থেকে আমন্ত্রণপত্র আসছিল। সায়্যিদ সাহেব তাদের আমন্ত্রণ কবুল করেন এবং ঐ সকল এলাকা সফর করে নিজ বাড়ি রায়বেরেলী প্রত্যাবর্তন করেন। এ সংক্ষিপ্ত সফরে প্রধানতঃ বৃহত্তর সফরের জন্য সঙ্গী যোগাড় করেন এব াদেরকে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝিয়ে দেন।

পরিশেষে ১৮২১ সাল মোতাবেক হিজরী ১২৩৬ সালের শাওয়াল মাসের শেষদিকে তিনি দ্বিতীয়বারের সফর করার উদ্দেশ্যে নিজের খানকা (তাকিয়ায়ে শাহ ইলমুল্লাহ) থেকে যাত্রা শুরু করেন। সঙ্গীদের সংখ্যা তখন ছিল চারশত জন। সকলের পথ খরচ ও ব্যয়ভার তার নিজের ওপর ছিল। তাকিয়া থেকে বের হওয়ার পর প্রথমে সী নদী অতিক্রম করেন। নদীর অপর তীরে পৌঁছে যারা বিদায়ের ইচ্ছুক ছিল তাদেরকে বিদায় দেন। হযরতের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ। তিনি তাকে ডেকে টাকা পয়সার হিসাব করে দেখলেন মাত্র একশত টাকার কিছু বেশি টাকা আছে। সায়্যিদ সাহেব এ পূর্ণ টাকাগুলো রায়বেরেলীর দরিদ্র-মিসকীন, অভাবী, ধোপা-মেথর প্রমুখদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

আল্লাহর ওপর ভরসার অনুপম দৃষ্টান্ত

সম্মুখে এক মাইল পথ অতিক্রমের পর কাফেলা একটি বাগানের ছায়ায় বিশ্রাম করে। সদস্য সংখ্যা গুনে দেখা গেল তারা চারশত পাঁচজন। তাছাড়া তাদের সঙ্গে আরও রয়েছে আশিজন ভিস্তি। সায়্যিদ সাহেব খাজাঞ্চি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবকে লক্ষ্য করে বলেন, তহবিলে অবশিষ্ট টাকা কত আছে। তিনি উত্তর দিলেন, মাত্র সাত টাকা। সায়্যিদ সাহেব বললেন সামান্য সাতটি

টাকা দ্বারা বিশাল কাফেলার কিছুই হবে না। দাও, প্রিয় ভূখণ্ডের গরীবদের যারা এখানে আছে যাদেরকে ইতিপূর্বে দান করা যায় নি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।

নির্দেশ মোতাবেক মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সেই টাকা বণ্টনের কাজ শেষ করলে হযরত সায়্যিদ সাহেব খোলা মাথায় দু'হাত ওপরের দিকে উঠিয়ে পরওয়ারদেগারে আলমের নিকট দু'আ করে বলেন,

> 'আয় বারে এলাহী ! তুমি এতগুলো মানুষকে আমি অধমের ওপর ন্যাস্ত করেছ। ওহে মাওলা ! তুমিই সমাধানকারী, ব্যবস্থা দানকারী। তুমি নিজের করুণা ও মেহেরবাণী দ্বারা পূর্ণ কাফেলার তত্ত্বাবধান কর, এ কাফেলাকে সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।'

কাফেলা সদস্যদের অবস্থা

চার শতাধিক সঙ্গীদের এ কাফেলা যেন একটি পরিবারের মত। নবাগত সঙ্গী কখনও রিক্ত হস্ততা কিংবা নিঃসম্বলতার দরুন অস্থির হয়ে উঠত তখন পুরাতন সঙ্গীরা তাকে প্রবোধ দিতে এগিয়ে আসতেন। তাকে ধৈর্য-সহ্য ও মাহন আল্লাহর স্বত্বার ওপর ভরসার তালকীন দিতেন (ওয়াকায়িয়ে আহমদী ও মাখযান)।

সঙ্গীরাও কত নিবেদিত প্রাণ ! প্রচণ্ড শীত গরমের যাতনার মধ্যেও আল্লাহ পাকের যিকির ও তার প্রতি শুকরিয়া বাক্যে তাদের জিহ্বা ভেজা থাকছে। পথিমধ্যে কোথাও তাদের মাথার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত চলছে, কোথাও প্রচণ্ড রোদ্রতাপ। কাদা, নদী-নালা, খাল-বিল তাদেরকে অতিক্রম করতে হচ্ছে। যদি কারুর পা পিছলে গেল তৎক্ষণাৎ সে ঈষৎ হেসে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলছে আল্লাহ তোমার একান্ত মেহেরবাণী যে, তোমার পথে চলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ার জন্য তুমি কবূল করেছ। আমাদের বিগত জীবনের কৃত সকল ভুল-ভ্রান্তির এটিই ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রহণ কর। আবার কেউ আঘাত খেয়ে হাফেযের নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে বলছে[১৯৫] ঃ

در بیاباں گر زشوق کعبه خواہی زد قدم
سر زنشها گر کند خار مغیلاں مخور

প্রথম মঞ্জিল

ডলমিউ নগরে নদী সংলগ্ন একটি দুর্গ অবস্থিত ছিল। এ দুর্গের বৈঠকখানায় সর্ব প্রথম অবস্থান গ্রহণ করা হয়। এ সময় আশেপাশের এলাকাগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ দর্শন ও সাক্ষাতের জন্য আসতে থাকে। মাওলানা আবদুল হাই সাহেব ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ তাদের প্রাণচাঞ্চল্যকর ওয়ায নসীহতের দ্বারা সাক্ষাৎ প্রার্থীদের মধ্যে নতুন জীবনের উন্মেষ ঘটাতে থাকেন।

৪ঠা যীকাদা ১২৩৬ হিজরী মোতাবেক ৩১শে আগষ্ট ১৮২১ সালে কাফেলা ডালমিউ থেকে নদীপথের যাত্রা শুরু করে। বানারস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য পাঁচটি নৌযান[১৯৬] পাঁচশত টাকায় ভাড়া করা হল। মহিলা শিশু ও দুর্বল লোকদেরকে এ সকল নৌযানে উঠিয়ে দেওয়া হল। অবশিষ্ট পুরুষদেরকে দু'টি দলে বিভক্ত করে একটিকে মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের[১৯৭] তত্ত্বাবধানে নদীর তীরবর্তী স্থলপথে প্রেরণ করা হল। অবশিষ্ট সত্তর জনের অপর একটি দলকে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফের নেতৃত্বে অন্য পথে পাঠানো হল। উভয় দলের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হল যে, পথে বিদ্যমান গ্রাম ও জনপদগুলোর মধ্যে অবতরণ করে লোকজনকে ওয়ায নসীহত করবে এবং তাদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানিয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হবে[১৯৮]।

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ ডালমিউ-এর সভাগুলোর মধ্যে এবং নৌযানগুলোতে আরোহণ করার মুহূর্তে সঙ্গীদেরকে নিম্নোক্ত হিদায়েত দান করেনঃ

এক. তোমরা একই পিতামাতার সন্তানের ন্যায় নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা ও ভালবাসা বজায় রেখে চলবে। অপর ভাইয়ের কষ্টকে নিজের কষ্ট বলে বোধ করবে। নিজে কষ্ট করে অন্যকে আরাম ও বিশ্রামের সুযোগ করে দিবে। তোমরা দুর্বলদের সাহায্য করবে, সেবা করাকে গৌরব মনে করবে। মনে রাখবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার এই একক পদ্ধতি[১৯৯]।

দুই. আমরা কেবল মহান আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করেই ঘর থেকে বের হয়ে আসছি। কাজেই আমাদের একান্ত বৈশিষ্ট্যের জিনিস যেটি হবে তা হল তাকওয়া ও পরহেযগারী। আমাদের পাথেয় হল তাওয়াক্কুল। আমরা কারুর কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করবো না। প্রয়োজন হলে নিজেরা খাটুনী

খেটে টাকা উপার্জন করবো। তারপর উপার্জিত টাকার অর্ধেক নিজেরা আহার করবো আর অপর অর্ধেক সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সংরক্ষিত রাখবো[২০০]।

অতঃপর তিনি সায়্যিদ যাইনুল আবেদীন সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, বর্তমানে যা কিছু অবশিষ্ট আছে নিয়ে আস। বলা বাহুল্য তখন মাত্র পাঁচ টাকা অবশিষ্ট ছিল। সায়্যিদ সাহেব সেই টাকাও গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং বলেন, আল্লাহ পাকের ভাণ্ডার সম্পদে পরিপূর্ণ[২০১]।

নদী পথে নৌকাগুলো যাত্রা করল। এদিকে স্থলপথের কাফেলাদ্বয়ও সম্মুখে যেতে আরম্ভ করল ডাটি মৌজা, ডিগডিগী মৌজা, পীরনগর, কিমিয়া মৌজা, উজানী মৌজা, আসরুলী মৌজা, ছুপড়ী মৌজা ব্রাহ্মান্ডী মৌজা ইত্যাদি স্থান হয়ে কোথাও একরাত্র কোথাও এক দুই দিন অবস্থানের মাধ্যমে কাফেলা শেষ অবধি এলাহাবাদ গিয়ে পৌঁছল। নৌকাগুলো বালুহ ঘাটে নোঙ্গর করে। কাফেলা রাজা উদ্যত নারায়নের বৈঠকখানায় অবস্থান গ্রহণ করে। সেখানে এলাহাবাদের প্রধান রঈস শায়খ গোলাম আলী কাফেলাকে আমন্ত্রণ জানান। বার দিন পর্যন্ত কাফেলা অবস্থান করে। এ দিনগুলোতে প্রত্যহ সকালে ও বিকালে প্রায় দু' হাজার মানুষের খানা তৈরী করতে হয়েছিল। বিদায়ের মূহুর্তে কাফেলার জন্য আনুমানিক দু হাজার টাকা মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র, একটি বড় খিমা, বারটি ছোট খিমা, নগদ পাঁচ হাজার টাকা, কাফেলার প্রতি সদস্যের জন্য একজোড়া কাপড়, নগদ এক টাকা, সায়্যিদ সাহেব ও তার পরিবার-পরিজনের জন্য মূল্যবান পোষাক, দামী কতিপয় তোহফা ও প্রায় পাঁচশত নগদ টাকা হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হয়[২০২]। এ প্রসঙ্গে ওয়াকিয়ে আহমদী গ্রন্থের একটি উদ্বৃতি লক্ষ্যণীয় ঃ

> 'এলাহাবাদের প্রধান রঈস শায়খ গোলাম আলী সাহেবের নিয়ম ছিল যে, যতবার তিনি হযরত সায়্যিদ সাহেবের দরবারে আসতেন ততবারেই সঙ্গে কোন মূল্যবান অস্ত্র হাদিয়া হিসাবে নিয়ে আসতেন। কোন কোন দিন একবার আবার কোন দিন দু'বারও আসতেন। হযরত বললেন, এখন তো আমরা হজ্জে যাচ্ছি। সেখানে হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়ার আদৌ দরকার নেই। আপনি প্রতিদিন কেন এহেন কষ্ট করছেন। সেখান থেকে মহান আল্লাহ আমাদেরকে যখন নিরাপদ ভাবে ফিরিয়ে আনবেন তখন

আমরা এগুলো আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব। শায়খ সাহেব উত্তর দিলেন, প্রথম কথা হল যে, আপনি কোন এলাকায় জিহাদ করবেন সে তো আমার জানা নেই। এদেশে করবেন, না অন্য কোন দেশে। তারপর আমি আমার জীবনের ওপরও খুব বেশি আশাবাদী নই। কাজেই আমি যদি মরে গেলাম তাহলে আমার মনের আশা অপূর্ণ থেকে যাবে। এ জন্য এখন আপনি এগুলো নিয়ে যান। তারপর আপনার এখতিয়ার থাকল যেখানে খুশি সেখানে রেখে যেতে পারেন[২০৩]।

এটি ছিল তার দৈনিকের হাদিয়া দান। এগুলো ছাড়াও শায়খ সাহেব ঐ সময় হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের হাতে মুরীদ হওয়ার পর অনেক মূল্যবান হাদিয়াসহ[২০৪] সতেরটি এমন দুর্ভল ও সুন্দর হাতিয়ার নযরানা হিসাবে পেশ করেন যা বড় বড় আমীরদের অস্ত্র ভান্ডার ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না[২০৫]।

শায়খ সাহেবের ওপর অর্পিত দায়িত্ব

ওপরে শায়খ সাহেবের আতিথেয়তার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এ মহা-আতিথেয়তার বিনিময়ে হযরত সায়্যিদ সাহেব কি উপদেশ দিয়েছিলেন তাও লক্ষ্যণীয়। হযরত সায়্যিদ সাহেব তাকে বললেন ঃ

শায়খ সাহেব! এ পূর্ণ এলাকার সংস্কার-সংশোধন আপনার উপর অর্পিত থাকল। কৃষক, চাষী ও মজদুরদের বিভিন্ন কাজ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে আপনি দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর সাহায্য করবেন। খাজনা যথাসম্ভব ন্যূনতম হারে নির্ধারণ করবেন। উসূল করার সময়েও তাদের সাথে কোমল আচরণ করতে হবে। আপনি তাদের মনে নিজের আসন করে নিন তাহলে তারাও আপনার হয়ে কাজ করবে। তখন আপনি যা বলবেন জীবন দিয়ে হলেও তারা সে কথা মান্য করে দেখাবে[২০৬]।

এলাহাবাদের দূর্গে অবস্থান

এলাহাবাদ দূর্গে প্রায় তিনশত মুসলিম সিপাহী ছিল। তারা সায়্যিদ সাহেবকে দাওয়াত করে নিজেদের দূর্গে নিয়ে গেল। তারপর মুসলিম বাদশাদের ব্যবহৃত সিংহাসনে তাকে উপবেশন করতে দিল এবং সকলে তার হাতে মুরীদ হল। প্রত্যাবর্তনের সময় হাদিয়া হিসাবে নগদ চল্লিশ টাকা, একটি পিস্তল, একটি ইউরোপীয় গুরুজ ইত্যাদি পেশ করে। প্রধান আমীন মৌলভী কারামত আলী

সাদা ও পশমী কাপড়ের দু'টি থান ও নগদ চল্লিশ টাকা, শাহ্ আজমল সাহেব[২০৭] নগদ পঞ্চাশ টাকা ও সুদর্শন অনেকগুলো লেপ হাদিয়া দেন।

এলাহাবাদ থেকে মির্জাপুর

এলাহাবাদে কাফেলা বার দিন অবস্থান করার পর ঐ জাকজমকের সাথে সম্মুখের দিকে যাত্রা করল। মহিলা শিশু ও দুর্বল লোকদেরকে নৌকায় করে সমুদ্র পথে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অবশিষ্ট লোকজন দু' দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামের পর গ্রাম গাশত করে হেটে চলল। এভাবে তারা পৌঁছে গেলেন মির্জাপুর। মির্জাপুরে জনৈক সওদাগর কাফেলার অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। একান্ত প্রাণ খোলাভাবে তিনি কাফেলার আতিথেয়তার আয়োজন করেন। এক সপ্তাহ অবস্থানের পর এখান থেকে যখন কাফেলা রওয়ানা হল তখন নগদ চার হাজার টাকা ও একটি পিস্তল হাদিয়া দেন। সবচেয়ে বড় কথা হল তিনি নিজেও হজ্জের উদ্দেশ্যে কাফেলার অভিযাত্রায় যোগ দেন। মাওলানা ফরযান্দ আলী সাহেবও মোট আশি টাকা নগদ ও কাফেলা সদস্যদের জন্য চল্লিশ থান মোটা কাপড় হাদিয়া দেন।

মির্জাপুর থেকে চুনারুঘাট হয়ে এ কাফেলা একমাস ছাব্বিশ দিন পর হিজরী ১২৩৬ সালের ৮ই জিলহজ্জ তারিখ বানারস গিয়ে পৌঁছে। বানারসে অবস্থান করে একমাস। তারপর এখান থেকে অন্য নৌকা ভাড়া করা হল। ১০ই মুহাররম সন্ধ্যায় কাফেলা পুনরায় যাত্রা করে। প্রথম বিরতি ঘটে গাযীপুর জেলার যামানিয়্যা নামক স্থানে। তারপর গাযীপুর, বারা, বেকসার ও বিলায় অবস্থানপূর্বক কাফেলা গিয়ে পৌছল চিপরায়। এখানে জনাব ফরহাত আলী সাহেবের বাড়িতে বহু লোকজন মুরীদ হয়। তারপর চিপরা থেকে দানাপুর পৌঁছে এক সপ্তাহ অবস্থান করা হয়।

দানাপুর থেকে যাত্রা করে কাফেলা আযীমাবাদ (পাটনা) পৌঁছে। মাদরাসার সংলগ্নে নৌকাগুলো ভিড়ানো হল। দীর্ঘ দু'সপ্তাহ পর্যন্ত কাফেলা এ নগরে থাকে। হাজার হাজার মানুষ বাইয়াত লাভে উপকৃত হয়।

তারপর আযীমাবাদ থেকে প্রথমে বাড়া, তারপরে মুঙ্গীর, ভাগলপুর ইত্যাদি স্থানে অবস্থানপূর্বক পৌঁছে গেল মুর্শিদাবাদ। এখানে কয়েকদিন থাকে। তারপর

হুগলীতে নৌকার নোঙ্গর করা হয় এবং কাফেলা এক সপ্তাহের জন্য অবস্থান করে।

হুগলীতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শায়খ আমীনুদ্দীন সাহেব[২১১] কাফেলাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। তিনি হযরতের অবস্থানের জন্য প্রাচীরবেষ্টিত একটি বাগান খরিদ করে দেন। এটিই কাফেলার অবস্থানস্থল হিসাবে ব্যবহার হয়েছিল।

হযরত সায়্যিদ সাহেবের কাছে বেশ অনেক অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তৎকালে কোন অস্ত্র সঙ্গে করে কলিকাতা প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু শায়খ আমীনুদ্দীন সাহেব যেহেতু ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক তখন খুবই উপকারে আসে। তিনি চেষ্টা চালিয়েছেন বলে সায়্যিদ সাহেবকে কোন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়নি। সমস্ত কাফেলা নির্বিঘ্নে নগরে প্রবেশ করে।

কলিকাতায় অবস্থানকাল ছিল দু'মাস। এ দু'মাসে কাফেলার সংবাদ বঙ্গদেশের সীমানা অতিক্রম করে সুদূর আসাম, বার্মা ও জাভা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বার্মার পেগু থেকে সায়্যিদ হামযা নামক এক ব্যক্তি স্বর্ণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কলিকাতা এসেছিলেন। পেগুব সরকারী মহলেও তার প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তিনি সায়্যিদ সাহেবের হাতে মুরীদ হন। এভাবে সিলেট, চট্টগ্রাম ইত্যাদি থেকেও অসংখ্য মানুষ ছুটে এসে তার হাতে মুরীদ হয়।

বঙ্গদেশের ভূখন্ড যা নবাব সিরাজুদ্দৌলার যুগ থেকে আহত অবস্থায় পড়েছিল এবং মাওলানা হাজী শরীয়ত উল্লাহর[২১২] মত দুঃসাহসী ব্যক্তিত্ব যে আঘাতের উপশম চেষ্টা করে আসছিলেন সেখানে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের শুভ আগমন মানুষের মনে নতুন জীবনের স্পন্দন জাগিয়ে দিল।

বঙ্গদেশের দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষের বিশাল জামাআত মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্যে ছুটে আসতে থাকে। তারপর এ দরবারের আলোকে নিজেদেরকে সুগঠিত করে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে নিজেরা বড় বড় কুরবানী দেওয়ার নতুন অঙ্গীকার করতে থাকে। কলিকাতায় তখন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা ওয়াজ নসীহত চলতে থাকত। ফাঁকে ফাঁকে চলত মুরীদ হওয়ার পালা। অসংখ্য মানুষের ভীড়ের দরুন একজন একজন করে মুরীদ করানো কঠিন

হয়ে গেল। মাঝে মাঝে তাই চতুর্দিকে কয়েকটি পাগড়ী খুলে দেওয়া হত। লোকজন ঐ পাগড়ীতে হাত রেখে মুখে বাইআতের শব্দগুলো উচ্ছারণ করে মুরীদ হয়ে যেত। প্রত্যহ সতের আঠারবার এ আমল অনুষ্ঠিত হত। অনুমান করা হয় যে, কলিকাতায় তখন প্রায় ষাট হাজার মুসলমান হযরতের হাতে মুরীদ হয়[২১৩]।

মানুষের এহেন উচ্ছ্বাস ও আন্তরিকতা প্রদর্শনের ফলাফল এ দাঁড়াল যে, বঙ্গদেশের বেশ্যালয়গুলো নিস্তব্ধ হয়ে যায়, মদ্যশালা তাড়ীঘর ইত্যাদির দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। ঠিকাদার লোকের পর্যন্ত নিজেদের ঠিকাদারী ফিরিয়ে নেওয়ার নোটিশ প্রদান শুরু করেছিল[২১৪]।

বৃটিশ লেখক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার যিনি হযরত সায়্যিদ সাহেবকে একজন লুটেরা প্রমাণের চেষ্টায় কোন ত্রুটি করেন নি, যিনি তার সাথীদের ওপর যে কোন ধরনের কালিমা লেপনে খুবই সচেষ্ট ভূমিকা রাখেন তিনিও বাধ্য হয়ে স্বীকার করে বলেন ঃ

> খ্রিস্টিয় ১৮২০ সালে এ মুজাহিদ ধীরে ধীরে নিজের সফর দক্ষিণ দিকে শুরু করেন। তার সঙ্গী মুরীদগণ তার তুচ্ছ তুচ্ছ কাজও সুন্দরভাবে সম্পাদন করে চলেন। সেখানে অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও আলিমগণ নগন্য সেবকের ন্যায় তার পালকীর পেছনে পেছনে নগ্ন পদে ছুটে চলাকেও নিজের জন্য গৌরব বলে বোধ করেন। পাটনায় দীর্ঘ অবস্থানের পর তার মুরীদদের সংখ্যা এত পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল যে, তাদের জন্য রীতিমত একটি সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে গেল। তিনি সেমতে নিয়মিত নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তারা তার পথিমধ্যের শহরগুলো থেকে বাণিজ্যিক মুনাফার ওপর কর আদায় করত। তারপর তিনি নিজের চারজন খলীফা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য নাযির এবং একজন প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। মুসলমান বাদশাগণ যেভাবে নিজের গভর্নরদের ওপর বিভিন্ন সময়ে ফরমান জারী করে থাকেন তদ্রুপ তিনিও নিজ খলিফাদের ওপর এহেন ফরমান জারী করতে থাকেন। তার চারজন খলীফা হলেন[২১৫] মাওলানা বেলায়েত আলী সাহেব, মাওলানা এনায়েত আলী সাহেব, মাওলানা মুহাররম আলী সাহেব ও মাওলানা ফরহাত হোসাইন

সাহেব। তার নিযুক্ত কাযীউল কোযাত ছিলেন শাহ মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব।

একটু পরে হান্টার সাহেব আরও লিখেন ঃ

এভাবে পাটনায় তিনি একটি নিয়মতান্ত্রিক কেন্দ্র স্থাপনের পর গঙ্গা নদী তীরবর্তী অঞ্চল হয়ে তিনি কলিকাতা পৌঁছেন। পথে যেখানেই সুযোগ হয়েছে সেখানেই লোকজন মুরীদ করেন এবং প্রধান প্রধান স্থানে নিজের প্রতিনিধি নির্ধারণ করে আসেন। কলিকাতায় তার চতুষ্পার্শে এত পরিমাণ মানুষের ভীড় হয়ে গিয়েছিল যে, তার হাতের সাথে হাত মিলিয়ে মুরীদ করানো সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত পাগড়ী খুলে তাকে ঘোষণা দিতে হল যে, যে ব্যক্তি এ পাগড়ীর অংশ স্পর্শ করবে সে ব্যক্তি তার মুরীদ হিসাবে গণ্য[২১৬]।

মরহুম টিপু সুলতানের অবশিষ্ট বংশধর

মরহুম সুলতান টিপুর পরিবার-পরিজনের অবশিষ্ট লোকজন কলিকাতায় গৃহবন্দীর জীবন-যাপন করছিলেন। সায়্যিদ সাহেবের খান্দানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রাচীণকাল থেকেই চলে আসছিল। কারণ সুলতান টিপুর পিতা ও মহীসুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব হায়দার আলী খান ছিলেন হযরত সায়্যিদ সাহেবের নানা মাওলানা শাহ আবূ সাঈদ (রহ)-এর মুরীদ। সফর চলা অবস্থায় সায়্যিদ যখন কলিকাতা পৌঁছলেন তখন সুলতান টিপু পরিবারের শাহজাদা ও বেগমগণ পূর্বের সম্পর্ককে নতুনভাবে জীবন্ত করার উদ্যোগ নেন। তারা সায়্যিদ সাহেব ও তার কাফেলাকে আমন্ত্রণ জানান। জাকজমকের সাথে আহারের ব্যবস্থা করেন এবং মূল্যবান হাদিয়া পেশ করেন।

কলিকাতা থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা, হজ্জ পালন ও প্রত্যাবর্তন

হিজরী ১২৩৭ সালের রবিউস সানী মাসের শেষ দিকে কাফেলা হজ্জের উদ্দেশ্যে জাহাজে আরোহণ করে জিদ্দার দিকে রওয়ানা হয়। দীর্ঘ চারমাস পর্যন্ত সমুদ্র পথে অবস্থানের পর তারা জেদ্দা বন্দরে পৌঁছেন। ২৮শে শাবান (হিঃ ১২৩৭) পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেন। তারপর সাড়ে পাঁচমাস পর্যন্ত এ পবিত্র ভূখন্ডে অবস্থান অব্যাহত থাকে। হজ্জের কাজকর্ম থেকে অবসর হওয়ার পর

১৫ই সফর তারা মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ২৯শে রবিউল আউয়াল মদীনার যিয়ারতের কাজ শেষ করে পুনরায় মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এখানে রমযান পর্যন্ত অবস্থান করার পর ১২৩৮ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল সায়্যিদ সাহেব দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বড় বড় কয়েকটি জাহাজ প্রস্তুত ছিল। কয়েক মাস পর্যন্ত কাফেলা সমুদ্রে অবস্থানের পর হিজরী ১২৩৯ সালের শুরুর দিকে বোম্বাই বন্দরে এসে পৌঁছে।

বোম্বাই শহরে অবস্থান

বোম্বাই দ্বীপ ইংরেজ ও পুর্তগালদের ব্যবহৃত দোলনা হিসাবেই পরিচিত। তবে এ দোলনার বিভিন্ন স্থানে তখনও মারাঠা নেতাদের দৌরাত্ম লুকিয়ে অবস্থান করছিল। সেখানে তখনও হোলকার ও আমীর আলী খানের স্বাধীনতা যুদ্ধের শ্লোগান উচ্চারিত হত। এহেন পরিস্থিতিতে বোম্বাই ভূখন্ডের ওপর সায়্যিদ সাহেবের কদম পড়া মাত্রই এ ভূখন্ড যেন তার কাছে নিজের দুঃখের ইতিহাস শুনাতে আরম্ভ করল। মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরানো ধ্বনি আবার নতুন করে জেগে উঠতে লাগল। সায়্যিদ সাহেব বোম্বাইকে আরেক কলিকাতা বানিয়ে দিলেন। তিনি আঠার দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। হাজার হাজার মানুষ তার কাছে মুরীদ হল এবং নতুনভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঠ গ্রহণ করল।

জীবনী লেখকগণ মানুষের মধ্যে এ জোয়ার সুচিত হওয়ার কারণ হিসাবে বলেছেন যে, যেহেতু তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের পবিত্র হজ্জ পালন করে আসছিলেন তাই এত ভীড়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মতামত ছিল নিম্নরূপ ঃ

> 'বোম্বাইতে তিনি প্রথম জাহাজ থেকে পদার্পন করেন। অসংখ্য লোকজন তার কাছে সাক্ষাৎ কিংবা 'মুরীদ' হওয়ার জন্য ছুটে আসতে থাকে। লোকজনের এ মহাস্রোতও তাকে বোম্বাইতে দীর্ঘ সময়ের জন্য ধরে রাখতে পারে নি। সম্মুখে যেখানেই যেতেন সেখানেই মক্কা সফর পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় নিজের অনেক বেশি সফলতা দেখতে পেতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি নিরাপদ স্থানে নিজের জৌলুসপূর্ণ ওয়াজ নসীহতের অনুষ্ঠানকে বড়ই তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতেন। মনে হত যে, তার আসল দৃষ্টি নিবন্ধিত হয়ে রয়েছে সূদুর

সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ওপর যেখানকার বাসিন্দারা সর্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকে[২১৭]।

হান্টার সাহেব এ স্থানে তার সেই অপবাদ আরোপনের বীজও বপণ করে দেন যে অপবাদের প্রপাগান্ডা দ্বারা তারা মুসলমানদের এ আন্দোলনকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। হান্টার সাহেব কয়েক লাইন পরেই লিখেছেন ঃ

> মক্কা মুআযযমায় অবস্থানকালে সায়্যিদ সাহেব সম্পর্কে স্থানীয় সরকারের নিকট এ রিপোর্ট গিয়েছিল যে, তিনিও এখানকার ঐ সকল মরুবাসী যাযাবরদের মত চিন্তাধারা পোষণ করে থাকেন যাদের কারণে বিগত কালে পবিত্র ভূখন্ডকে নানারূপ ক্ষতিগ্রস্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রিপোর্টের কারণে মক্কায় সায়্যিদ সাহেবকে জনসমক্ষে অপমান করা হয় এবং নগর থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। এ শাস্তিদানের ফল দাড়াল যে, তিনি যখন হজ্জের সফর শেষ করে দেশে ফিরলেন তখন তিনি আর বিদআতের সংস্কারক কিংবা ধর্মপাগল ব্যক্তিই ছিলেন না বরং তিনি হয়ে গেলেন আবদুল ওয়াহহাবের একজন পাক্কা মুরীদ[২১৮]।

হান্টারের এ বক্তব্য জঘন্য একটি অপবাদ ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। মক্কা শরীফে তাকে অপমান করার কোন ঘটনাই ঘটে নি। তবে মক্কা শরীফের কাজকর্ম শেষ করার পর তার কাফেলা যখন মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে পথ চলছিল তখন পথিমধ্যে তারা একদল লুটেরা যাযাবরদের হাতে আক্রান্ত হয়। কিন্তু কাফেলায় অবস্থিত আরবীয় সফর সঙ্গীগণ তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলে লুটেরাদের মনে সুবোধের উদয় হয়। ফলে তারা ফিরে চলে যায়। সেখানে না কোন লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে আর না কোন প্রকারের খুন খারাবী[২১৯]।

ফার্সি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, دروغ گورا حافظ نه باشد অর্থাৎ মিথ্যাবাদী লোকের স্মরণশক্তি নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ প্রবাদ মিষ্টার হান্টারের ক্ষেত্রে সর্বাংশে সত্য হয়ে ফুটে উঠছে। কারণ তিনি নিজেই কয়েক পৃষ্ঠার পর স্বীকার করছেন যে,

> '১৮১৩ সাল থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত মক্কা নগরের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, কোন ওহাবী এখানে নিজের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া ব্যতিরেকে চলাফেরা করতে সক্ষম হত না।'

এমতাবস্থায় এ কথা বলা যে, সায়্যিদ সাহেব যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন আবদুল ওয়াহ্হাব একজন পাক্কা মুরীদ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন–সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অবাস্তব ও অপবাদ নয় তো কি ? বস্তুত তাদের মূল লক্ষ্য হল সায়্যিদ সাহেবের ব্যাপারে জনমনে বিদ্বেষ ছড়ানো। জনমনে এমন কিছু উত্তেজনার উদ্রেক করে দেওয়া যেমনটি তৎকালে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের সম্পর্কে মানুষের মনে বিরাজিত ছিল।

হাজার প্রপাগান্ডা ও মিথ্যা অপবাদের পরও যা সত্য তা সত্যই থেকে যায়। বাস্তবকে ঢাকা দেওয়া প্রপাগান্ডাকারীর পক্ষেও অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ নীতির কাছে মিষ্টার হান্টারও পরাজিত হয়েছেন। সায়্যিদ সাহেবের আন্দোলন সম্পর্কে মানুষকে মন্দ ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যেই তিনি তার গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একজন ডাকাত সন্ত্রাসী ও লুটেরা বলে প্রমাণ করতে কোন ক্রটি করেন নি। এতদসত্ত্বেও নিম্নোক্ত স্বীকৃতি প্রকাশ না করে তার গত্যান্তর ছিল না। তিনি বলেন ঃ

> এ সব লোকেরা নিজেদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস মোতাবেক বড়ই পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির ছিলেন। তারা রাজদ্রোহীতায় অংশ নিচ্ছেন বটে তবে তুচ্ছ কোন লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে নয়[২২০]। সায়্যিদ সাহেবের জীবনের মধ্যভাগ এমনও ছিল যে, তার হৃদয় দেশবাসী নিগৃহীত লোকজনকে উদ্ধার করার চিন্তায় সর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকত[২২১]। তিনি দেশবাসীর ব্যবহারিক জীবনের ওপর ওয়াজ নসীহত করার সময় সকল প্রকারের বিভ্রান্তিকর মৌল বিষয়ের আলোচনা উপক্ষো করে যেতেন। এ সকল ব্যাপারে তার শত্রুদের ধারণা ছিল যে, তিনি সে সব বিষয়ের আলোচনা করার ক্ষমতাই রাখেন না। আর তার মুরীদদের দাবী ছিল যে, তিনি ওসব কিছু এড়িয়ে চলেন। কারণ এগুলো তার উচ্চাসন বিরোধী বক্তব্য[২২২]। তবে তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বিপ্লবের উৎসাহী লোকদের আশা-আকাঙ্খার পূর্ণ অনুকূলবর্তী ছিল। তার সঙ্গীদের মধ্যে শত সহস্র ব্যক্তিত্ব এ মানেরও ছিলেন যারা বাস্তবিকভাবেই উচ্চমানের বুযুর্গ ও পরহেযগার ব্যক্তি। যারা কুপ্রবৃত্তি ও খায়েশের দমন কার্যকে নিজের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করতেন[২২৩]।

হান্টার সাহেবের বক্তব্যে এ অপেক্ষা আরও হাস্যস্পদ কথা হল যে, তিনি হযরত সায়্যিদ সাহেবকে একদিকে আবদুল ওয়াহহাবের পাক্কা মুরীদ বলে বক্তব্য রাখছেন আর অপর দিকে তিনি তাকে দ্বাদশ ইমামপন্থী কিংবা ষড়ইমাম পন্থীদের জনৈক ইমাম বলেও প্রাচরণা করেছেন[২২৪]। অথচ ওয়াহাবী চিন্তাধারা ও ইমামী চিন্তাধারার মধ্যে আসমান জমিন তফাৎ। উভয়ের মধ্যে এতটুকু বৈপরীত্য বিদ্যমান যে, একদল অন্যদলকে কাফির ও ইসলাম বহির্ভূত বলে বিশ্বাস করে। এমতাবস্থায় বিপরীত চিন্তাধারার দুটি বিষয়ের সহিত অপবাদ গ্রন্থ বানানোর মধ্যে হান্টার সাহেবের ষড়যন্ত্র ঢাকা দেওয়ার কোন উপায় থাকে না।

বোম্বাই থেকে কলিকাতা

আঠার দিন বোম্বাই নগরে অবস্থানের পর তিনি নদী পথে কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে আলেপ্পা বন্দরে দু'দিনের জন্য যাত্রা বিরতি ঘটে। এইবারে কলিকাতায় শায়খ আবদুল্লাহ সাহেব (ব্যবসায়ীদের গৌরব শায়খ গোলাম হোসাইনের পুত্র) পূর্ণ কাফেলার আতিথ্য করেন। তবে যেহেতু সঙ্গীদের একটি জাহাজ (আতিয়াতুর রহমান) পথ হারিয়ে পেছনে রয়ে গিয়েছিল সে জাহাজের অপেক্ষায় কলিকাতায় দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অবস্থান করতে হল। এ দিনগুলো ছিল তার বড়ই অস্থিরতার মূহুর্ত। সঙ্গীদের বিরহের যাতনা আর নানা রকমের দুশ্চিন্তা সায়্যিদ সাহেবকে ব্যাকুল করে রেখেছিল। সকলেই তখন বিশেষভাবে দু'আ-দরূদ ও ওযীফা পাঠ ইত্যাদির মধ্যে লিপ্ত থাকে। একমাস অতিক্রান্তের পর সেই জাহাজ নিরাপদে কলিকাতা পৌঁছতে সক্ষম হলে অনতিবিলম্বে রায়বেরেলীর দিকে যাত্রার কাজ শুরু হল। কিন্তু জিহাদের প্রস্তুতি ও প্রেরণা তখন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি অবস্থায় তাকে তাড়া দিচ্ছে। তখনকার সেই সফর যেন যুদ্ধের জন্য রণক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা বলেই মনে হচ্ছিল।

টীকা

১৮২. সাত হাজার মাইলের সফর অর্থাৎ প্রথমে রায়বেরেলী থেকে কলিকাতা, তারপর কলিকাতা থেকে মক্কা শরীফ, সেখান থেকে মদীনা, তারপর মদীনা থেকে পুনরায় মক্কা শরীফ, মক্কা থেকে বোম্বাই, সেখান থেকে সমুদ্র পথে কলিকাতা ও কলিকাতা থেকে নিজ বাড়ি রায়বেরেলী পর্যন্ত।

১৮৩. ইতিহাসের কত শিক্ষণীয় ব্যাপার যে, সেই মুসলিম জাতি যাদেরকে সমূদ্র জগতের সম্রাট মনে করা হত, যাদের নৌযান সাত সমূদ্রের বুক জুড়ে রাতদিন ছুটে চলত, যারা বিশ্ববাসীর জন্য সামুদ্রিক পথে বাণিজ্যের পথ খুলে দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত যারা কলম্বাসের নৌকা ইউরোপ থেকে আমেরিকায় পৌছিয়ে দেয় যাদের পথ নির্দেশের ভিত্তিতে ভাস্কোদাগামা আফ্রিকার সৈকত থেকে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছে তাদের অবস্থান এমন নিচে নেমে গিয়েছে যে, নিজেদের লালিত পালিত পুর্তগালদের দ্বারা আজ এতই কোনঠাসা হয়ে আছে যে, হজ্জের মত ফরয জিনিসকেও মাফ বলে ফতওয়া দিতে শুরু করছে।

১৮৪. দেখুন সীরাতে সাহিয়্যদ আহমদ শহীদ খঃ ১, পৃ. ১৭৫।

১৮৫. স্বয়ং হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের বক্তব্য থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, হজ্জ আর্থিব অস্বচ্ছলতার ওপর হজ্জ ফরয হয় না। যেমন পাটনায় অবস্থাকালে তিব্বতের কাতিপয় মুসলমান যারা তার কাফেলায় শরীক হয়েছিলেন এবং হজ্জে গমনের মনস্থ করেছিলেন সায়্যিদ সাহেব তাদেরকে বারণ করেন। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবহেতু তিনি তাদেরকে হজ্জ করার পরিবর্তে নিজ দেশে গিয়ে তাবলীগ ও ইসলাহের কাজে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন। তিনি বললেন, যেহেতু তোমাদের কাছে পথ খরচের অভাব রয়েছে সেহেতু তোমাদের ওপর হজ্জ করা ফরয নয়। আর বায়তুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্য তো হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তোমরা যদি আমার কথা শোন তা হলে আমার পরামর্শ হল তোমরা নিজ দেশে ফিরে যাও। সেখানে দাওয়াত ও তাবলীগ, ইসলাহ্ ও সংস্কারের কাজ চালিয়ে যাও। আর মনে রেখ যে, তোমাদের ওপর যত দুঃখ কষ্টই নেমে আসুক না কেন–তোমাদেরকে প্রহার করুক কিংবা কষ্টে ফেলুক সর্বাবস্থায় ধৈর্য্যের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করবে। প্রতিশোধ কিংবা বদল লওয়ার চিন্তাও মনে আসতে দিবে না (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ২১৯, খঃ ১)।

১৮৬. এ ব্যাপারে ১৭৮৯ সালে জেনারেল ম্যাডুজ ও কর্নেক ম্যাকসুল যখন সুলতান টিপুর মোকাবেলা করছিলেন তখনকার অবস্থা সম্পর্কে মিস্টার বুর্যাঙ্গ-এর বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

সুলতান টিপু পন্ডিচেরী পৌঁছে ফরাসী গভর্নরের নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন তাকে যেন ছয় হাজার ফরাসী সৈন্য দ্বারা সাহায্য করা হয়। তা হলে তিনি উভয়ের শত্রু ইংরেজকে এখান থেকে উৎখাত করে দেবেন। টিপু তখন অঙ্গীকার করেছিলেন যে, ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল তিনি এ সুবাদে ফরাসীদের হাতে ন্যাস্ত করবেন। ফরাসী গভর্নর তার এ প্রস্তাব তাদের সম্রাটের নিকট পেশ করে কিন্তু সম্রাট ষড়দশ লুই ফ্র্যান্সে বিপ্লব

ঘটে যাওয়ার আশংকায় এ প্রস্তাবের দিকে মনোনিবেশ প্রদান করেন নি (তারীখে সালতানাতে খোদাদাদ, মহীসুর, পৃঃ ২৩২)।
মেজর জেনারেল স্যার জন ম্যাক্লম যিনি সুলতান টিপুকে ইংরেজ সরকারের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক দুশমন বলে অভিহিত করতেন তার অন্যান্য কারণের মধ্যে এটিও একটি কারণ ছিল যে, টিপু ইংরেজদের মোকাবেলা করার জন্য ফরাসী সাহায্য লাভে সম্মত ছিলেন (সিয়াসী তারীখে হিন্দ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

১৮৭. যশোবন্ত রাও হোলকার যাকে ইন্দুর রাজ্যের রাজত্ব প্রদান করে নিস্তব্দ করে দেওয়া হয়।

১৮৮. আমীর আলী খান যাকে টুংক প্রদেশের রাজত্ব দিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়।

১৮৯. অর্থাৎ পাঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কারণ ১৮০৯ সালে যশোবন্ত রাও হোলকার ও নওয়াব আমীর আলী খান পাঞ্জাবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মহারাজা তাদেরকে কোন প্রকার সামরিক সাহায্য প্রদানের পরিবর্তে এ পরামর্শ দেন যে, লড়াই করে লাভ নেই ; ইংরেজদের সাথে তোমরা সন্ধি করে নাও। এরপর তিনিই উদ্যোগী হয়ে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দেন। (মহারাজা রণজিৎ সিং, কৃত অধ্যাপক কুহেলী)।

১৯০. হযরত সায়্যিদ সাহেবের এ আন্দোলনের প্রায় ত্রিশ বছর পর ১৮৫৭ সালে যখন জাতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি গৃহীত হয় তখনও এই ধর্মীয় শিরোনামকেই অবলম্বন করা হয়েছিল। যেমন বিপ্লবের ইস্যু হিসাবে তখন গরুর চর্বি মিশ্রিত কার্তুস এবং চাক্কির মধ্যে হাড্ডি পিশে আটার সাথে মিশ্রিতকরণ ইত্যাদি পেশ করা হয়। ঐ সময় সম্রাট বাহাদুর শাহ যুফার জনগণের কাছে যে আপীল পেশ করেন তাতেও এ ধর্মীয় বিষয়ের অজুহাত পেশ করে বলা হয়েছিল যে, ইংরেজরা সকল ধর্মকেই ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে। এ ব্যাপারে কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখের পর শেষের বাক্যটি ছিল ; হিন্দু ভাইদের প্রতি গঙ্গাজী, তুলসী ও সালিক রামের দোহাই আর মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআনের দোহাই যে, সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের জান ও ঈমানের সংরক্ষণের জন্য ইংরেজ গোষ্ঠীকে হত্যা করা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করবে (তারীখে বাগাওয়াতে হিন্দ, পৃঃ ৩৮৫-৩৮৭)।

১৯১. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, তিনি মিনা ও আকাবায় নিজ সঙ্গীদের কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

১৯২. অর্থাৎ নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সংশোধন করার লক্ষ্যে পারস্পরিক চুক্তি।

১৯৩. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ কী সিয়াসী তাহরীক পৃঃ ১৫৩।

১৯৪. মুনশী মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী বলেন, হিজরী ১২৩৬ সালের ১লা শাওয়াল অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামায আদায়ের পর চারশত পুরুষ মহিলা ও শিশুদের সহ হজ্জের উদ্দেশ্যে তিনি বেরেলী থেকে যাত্রা করেন। এক মাইল অতিক্রমের পর একটি বাগানে

সামান্য অবস্থান করা হয়। সেখানে কাফেলার সদস্য সংখ্যা গণনা করা হলে দেখা গেল কাফেলায় সর্বমোট চারশত সাত জন মানুষ রয়েছেন (সাওয়ানিহে আহমদী, পৃঃ ৫৯)।

১৯৫. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ১৫৬।

১৯৬. পাঁচটি বড় বড় নৌকার প্রতিটি একশত টাকা করে ভাড়া করা হয় এবং ভাড়ার টাক অগ্রিম তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয় (সীরাতে সায়্যিদ, পৃঃ ১৯০)।

১৯৭. অধ্যাপক গোলাম রসূল মিহিরের ভাষ্যমতে তাদের একটি দলকে পদব্রজে চলার নির্দেশ দেন। শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল, মাওলানা আবদুল হাই, মৌলভী মুহাম্মদ ইউসুফ ফুলতী প্রমুখ পালাক্রমে এ দলের নেতৃত্ব দেন। এলাহাবাদ থেকে বানারস পর্যন্ত সফরের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (রহ) সায়্যিদ আহমদ, পৃঃ ২০২)।

১৯৮. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ, পৃঃ ১৮৩।

১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০-১৮১।

২০০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৩, ওযাকায়িয়ে আহমদী গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, হযরত সায়্যিদ সাহেব ভারতীয়দের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ করে বলেন, এলাহী ; ভারতবাসীদের জন্য তোমার পবিত্র কাবা শরীফ গমনের পথ রুদ্ধ হয়ে আছে। অসংখ্য বিত্তবান ধনী লোকজন যাদের ওপর হজ্জ করা ফরয ছিল তারা নাফস ও শয়তানের দেয়া ধোকায় পড়ে হজ্জবিহীন ভাবেই মারা গিয়েছে। নফস ও শয়তান তাদেরকে রাস্তার নিরাপত্তাহীনতার কথা বলে ধোকাগ্রস্থ করেছে। বর্তমানেও অসংখ্য সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ এ ধোকায় পড়ে হজ্জ পালন থেকে বিরত আছে। এলাহী ! তুমি নিজের রহমত ও অনুগ্রহের দ্বারা এমন প্রশস্থ পথ খুলে দাও যেন হজ্জ পালনে ইচ্ছুক প্রত্যেকটি লোক নির্বিঘ্নে হজ্জ করে আসতে পারে। এই মহা নিয়ামত লাভ করা থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না থাকে। তিনি বলেন, আল্লাহ পাক আমার এ দু'আ কবুল করেছেন এবং বলেছেন যে, তুমি যখন হজ্জ করবে তখন এ পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যকার যে সেই পর্যন্ত জীবিত থাকবে ইনশাআল্লাহ তার সব কিছু সে নিজ চোখেই প্রত্যক্ষ করবে (ওযাকায়িয়ে আহমদী, সায়্যিদ আহমদ শহীদ গ্রন্থের খঃ ১, পৃঃ ১৯২-এর সূত্রে)। তবে উল্লেখ্য যে, এ বক্তব্য তার জিহাদী সংকল্প অস্বীকার করে না। একই গুলিতে দুই শিকার এর এটি হল সুন্দর একটি উদাহরণ (মুহাম্মদ মিয়া)।
তাই দেখা যায় সায়্যিদ আহমদ শহীদ গ্রন্থের লেখক জনাব মিহির সাহেব উপরোক্ত বক্তব্য বর্ণনা করার পরেই বলেন, হজ্জের আবদ্ধ পথ উন্মুক্ত করা ছিল সুলতান ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাজ। কারণ এর প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ সাধারণতঃ তাদের কাছেই থাকে। অন্যদের কাছে থাকার কথা নয়। অথচ হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ যার হাতে ইসলামের প্রতি নির্মল ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন শক্তিই নেই তার মাধ্যমে পথ উন্মুক্ত করার সুকঠিন ব্যাপারকে সহজে সম্পাদন করার মর্যাদা দান করেছেন। অনুরূপভাবে জিহাদের পথ উন্মুক্ত করা সাম্রাজ্য ও সরকার প্রধান ব্যক্তিদের কাজ। সাধারণ নাগরিকের জন্য এটি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অথচ এ গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র

কাজটিও দীর্ঘ বার শতাব্দীর পর নবুওয়াতের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পুনরায় চালু করার গৌরব আল্লাহ পাক হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদকে দান করেন।

یه رتبه بلند ملا جسکو مل گیا

ہر مدعی کے واسطے دار ورسن کہاں

২০১. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ১৮৩।

২০২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯২ ও ১৯৩।

২০৩. ওযাকায়িয়ে আহমদী, সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ খঃ ১, পৃঃ ১৯৪-এর সূত্রমতে।

২০৪. নযরানার বিবরণ ছিল নিম্নরূপ ঃ কয়েক থান কাপড়, কয়েক জোড়া চাদর, মলমল আর্দি ও মোটা কাপড়ের কয়েক থান এবং নগদ পাঁচশত টাকা (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ১৯২)।

২০৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩।

২০৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ

২০৭. এলাহাবাদের দায়েরায়ে শাহ আজমল যেখানে বর্তমান গদী নশীন হিসাবে উত্তর প্রদেশ জমিয়তে উলামার সভাপতি মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ শাহিদ ফাখিরী শাহেব অধিষ্ঠিত রয়েছেন সেই খানকা [illegible] নামের দিকে সম্পর্কীত।

২০৮. এ সময় হযরত শাহ আজমল সাহেব অসুস্থ ছিলেন। তিনি নিজে সায়্যিদ সাহেবের সাক্ষাতে আসতে পারেন নি। তাই নিজের পুত্র শাহ আবুল মুআলীকে অভ্যার্থনার জন্য পাঠান। অতঃপর কাফেলা যখন এলাহাবাদের সফর শেষ করে রওয়ানা করে তখন বর্ণিত নযরানা হাদিয়া করেন (ওযাকায়িয়ে আহমদী, সীরাতে সায়্যিদ আহমদ প্রভৃতি)।

২০৯. মুনশী আমিনুদ্দীন সাহেব পশ্চিমবঙ্গের একটি উচ্চ খান্দানের সদস্য। তিনি কলিকাতার উচ্চ পদস্থ ধনীদের একজন ছিলেন। ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে তিনি ওকালতি করতেন। কোম্পানীর সমগ্র ভারতবর্ষের যত মামলা মোকদ্দমা কলিকাতার কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে রুজু হত সেগুলো মুনশী আমিনদ্দীনের মাধ্যমে পেশ হত। এ ব্যাপারে তার জন্য নির্ধারিত কোন বেতন ছিল না। তবে ওকালতীর ভাতা হিসাবে যা পেতেন তাই প্রতি মাসে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা হয়ে যেত। হাতীর পিঠের ওপর বোঝাই করে জাকজমক সহ ইংরেজ সরকার তার কাছে পাঠিয়ে দিত। তিনি উদার মনের লোক ছিলেন। চার পাঁচশত শিক্ষার্থীকে নিজ খরচে শিক্ষাদান করতেন (সায়্যিদ আহমদ শহীদ)।

২১০. মাওলানা হাজী শরীয়ত উল্লাহ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাহাদুর পুরের জনৈক যুবক আলিম। তিনি আঠার বছর বয়সে বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ করার জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। বিশ বছর হিজাযের পবিত্র ভূমিতে অবস্থান করেন। তখন শায়খ তাহির সাম্বুল মক্কীর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেন। ১৮০২ সালে দেশে ফিরে এসে দাওয়াত ও ইসলাহের অভিযান শুরু করেন। তার নেতৃত্বে ১৮০৪ সালে ফারায়েজী নামে একটি সংস্কারবাদী দল গঠিত হয়। সমাজ সংস্কার ও ইসলাহের কাজে তিনি এতই অনুপ্রাণিত

ছিলেন যে, পীর মুরীদ জাতীয় পুরাতন শব্দমালার পরিবর্তে তিনি উস্তাদ শাগরিদ ইত্যাদি শব্দের প্রচলন দেন। দুধু মিয়া তার খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত মনোনীত হন। তিনি বাহাদুরপুরকে কেন্দ্র করে কৃষকদের মাঝে তাবলীগের কাজ শুরু করেন। ধর্মের প্রচারণা ছাড়াও গরীবদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সমবেদনার প্রেরণা সৃষ্টি তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি স্থানীয় জমিদারদের নির্যাতন থেকে কৃষক শ্রেণীকে মুক্তির চেষ্টা করে যান (রওশন মুস্তাকবিল, ১০৪)।

২১১. প্রত্যহ এক হাজারের মত লোকজন মুরীদ হতে থাকে। এ সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছিল। মুরীদ হতে ইচ্ছুক লোকদের মধ্যে বঙ্গদেশ ছাড়াও আসাম, জাভা ইত্যাদি এলাকার মুসলমান অন্তর্ভূক্ত ছিলেন (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ২৩১)।

২১২. প্রাগুক্ত,

২১৩. হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ ২২।

২১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২ ; কিন্তু হান্টার সাহেব এখানে কয়েকটি তথ্যগত ভুল করেছেন। যেমন হজ্জে যাওয়ার সময় তার চারজন খলীফা ছিল না। বায়তুল্লাহ্ শরীফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি খলীফাদের নিযুক্ত করেন। যাওয়ার সময় তো অবস্থান ছিল সংক্ষিপ্ত সময়ের। কারণ কতিপয় লোক স্থানীয় কালেক্টর সাহেবকে এ কথা বলে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে যে, এ লোকজন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কালেক্টর তাদের এ সকল বক্তব্যে বাহ্যিকভাবে যদিও কোন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেননি তবুও এ সব রিপোর্টের কারণে সায়্যিদ সাহেব বেশি দিন বিলম্ব করা উচিত মনে করেন নি (ওয়াকায়িয়ে আহমদী)।

২১৫. হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ ৯০।

২১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯।

২১৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ; সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, ওয়াকায়িয়ে আহমদী. মাখযানে আহমদ, সাওযানিহে আহমদী, প্রভৃতি। হান্টার সাহেবের উপরোক্ত অসত্য বক্তব্যের কোন শুদ্ধ ব্যাখ্যা করতে চাইলে বড়জোর এতটুকু বলা যায় যে, তিনি ভুলক্রমে মৌলভী আবদুল হক সাহেব নিউতনুবীর ঘটনাকে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের ওপর চালিয়ে দিয়েছেন। আবার তাও অনেক বাড়াবাড়ি ও অতিশয়তাসহ। এ ঘটনার হাকীকত সম্পর্কে গোলাম রাসূল মিহির সাহেব বলেন, মৌলভী আবদুল হক সাহেব ব্যক্তিগতভাবে রূক্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি শরীয়ত বিরোধী কোন বিদআত বা রুসুম দেখলেই তা শক্ত হাতে প্রতিরোধ করতেন। কাজটি তো খুবই ভাল তবে পদ্ধতি ছিল কঠিন প্রকৃতির। হিজাজে মাত্র কয়েক বছর হল যে, নজদীদের সাথে যুদ্ধ করা হয়েছে। নজদীদের বিরোধীতায় হিজাযের লোকজনের মনে উত্তেজনা তখনও প্রশমিত হয়নি। এহেন পরিস্থিতিতে যে কেউ যখন বিদআত বিরোধী বক্তব্যে কঠোরতা অবলম্বন করত তাকেই নজদী চিন্তাধারার বলে ধারণা করা হত। এ ধারণার ভিত্তিতেই সেখানে মাওলানা আবদুল হক সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়। সংবাদ শুনে মাওলানা আবদুল হাই সাহেব

জামিন হয়ে তাকে ছুটিয়ে আনেন। তারপর মোকাদ্দমার জবাবদিহী করার সময়েও তিনি তাশরীফ নিয়ে যান। আদালতে তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়। এভাবে তিনি মাওলানা আবদুল হক সাহেবের মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেন। আবদুল হক সাহেব মক্কা পর্যন্তই সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে অবস্থান করেন তারপর সাফা চলে যান। সেখানে কাযী শওকানী (রহ)-এর কাছ থেকে হাদীসের সনদ লাভ করে হিন্দুস্তান প্রত্যাবর্তন করেন। (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ২৩৬, ২৩৭ খঃ ১)।

২১৮. হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, চতুর্থ অধ্যায়, পৃঃ ২০৬।

২১৯. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় অধ্যায় পৃঃ ৭৬।

২২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭।

২২১. প্রাগুক্ত, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৫৮।

২২২. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৭৮।

স্থানীয় সদস্যমন্ডলী

যারা দ্বিতীয় সফর চলাকালে কাফেলার সেবা করেছেন

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ)-এর এ কাফেলার সদস্য সংখ্যা সত্তরজন থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত আটশত পর্যন্ত পৌছেছিল, এ কাফেলা যে স্থানে গমন করে সেখানে তাদের আমন্ত্রণ ও আতিথেয়তার জন্য বহু উদার হৃদয়ী অগ্রসর হয়ে আসেন। তাদের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। দুঃখের বিষয় আমাদের ইতিহাস সে সব মানুষের নামগুলো সংরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়নি। তারপরেও বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে সকল নাম ছড়িয়ে পড়ে আছে সেগুলো নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে পেশ করা হল। এ চিত্রের মধ্যে পাঠক কতিপয় অমুসলিম মেযবানের নামও দেখবেন। তা থেকে বুঝা যায় যে, হযরত সায়্যিদ সাহেবের সেই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ গণমুখী। গণমানুষের সকলের মনেই তার আন্দোলন প্রভাবের সৃষ্টি করেছিল। তা ছাড়া এ থেকে তৎকালীন মুসলিম অমুসলিম সম্পর্কের ওপরও একটা সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্থান ও অবস্থান কাল	**কর্মী ও আমন্ত্রণকারীদের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী**
ডিলমিউ চারদিন ঃ	সায়্যিদ সাহেব এখানে পৌছার পর দুই ভাইয়ের মধ্যে কে আগে আতিথ্যের জন্য গ্রহণ করবে সে বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ফয়সালার ভার সায়্যিদ সাহেবের ওপর অর্পিত হলে তিনি বড় ভাইয়ের পক্ষে রায় দেন এবং বলেন বড় ভাইয়ের হক অগ্রবর্তী।
ডুঈ দমদমা মৌজা ঃ	এখানে এক রাতের জন্য অবস্থান করা হয়। শায়খ মাযহার আলী সাহেব কাফেলার আমন্ত্রণ জানান।
ডুগডুগী মৌজা ঃ পূর্ণদিনের জন্য অবস্থান করা হয়	এখানের শায়খ মুহাম্মদ পানাহ সাহেব ও তার সুযোগ্য সন্তান সুযোগ্য সন্তান শায়খ মুহাম্মদ ফাকাহ মেহমানদারী করেন। পূর্ণদিন অবস্থানের পর পরদিন ভোরে কাফেলা ডুগডুগী থেকে যাত্রা করে। সন্ধ্যাকালে মাল্লাবা নৌকাগুলো এমন একটি স্থানে নোঙ্গর করে যে, আশেপাশের কোথাও

আবাদী নেই। নদীর পার্শ্ববতী ভূমি অনেক দূর পর্যন্ত এত নোংরা যে, সেখানে নেমে আহার তৈরীর কোন ব্যবস্থা নেই। ইত্যবসরে হঠাৎ আকাশে কালমেঘ দেখা দেয়। তীব্র গতিতে বায়ু প্রবাহ শুরু হয়। কিছু কিছু বৃষ্টিও ঝরতে থাকে। সকলের ধারণা হয়ে গেল যে এ রাত না খেয়েই কাটাতে হবে। হঠাৎ দূর থেকে বাতির আলো দেখা গেল। তারা কাছে পৌঁছার পর জানা গেল যে, তেলের ইংরেজ ব্যবসায়ী তার মুসলিম শ্রমিকদের অনুরোধ রক্ষার্থে কয়েক ডেগ পোলাও পাকিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। এদিকে তারা নিজেরা ঘোড়ায় আরোহণ করে আসছে [২২২]।

গিতনা, (একদিন) ঃ এখানে কাফেলা রিসালদার আসিফ খানের বাড়িতে অবস্থান করে।

জাহানাবাদ ঃ এখানে নদীর ঘাটে নৌকাগুলো তিনদিন পর্যন্ত থেমে থাকে। মেহমানদারীর পূর্ণ ব্যবস্থা করেছেন শায়খ হাসান আলী সাহেব। অবশ্য তার নিজ বাড়ি ঘাট থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। বিদায় বেলা শায়খ হাসান আলী তার আরো চার ভাই ও মহিলাদের সহ কাফেলার সঙ্গী হয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন[২২৩]।

মৌজা উজানী ঃ কাফেলা এখানে একদিন অবস্থান করে। জমিদার শায়খ লাল মুহাম্মদ সাহেব আতিথেয়তার আয়োজন করেন[২২৪]।

মৌজা আমরূলী ঃ একদিনের অবস্থান, শায়খ মুহাম্মদ উজীর (শায়খ লাল মুহাম্মদ সাহেবের শ্বশুর) মেহমানদারী করেন।

মৌজা ঝুপড়ী ঃ বিস্তারিত জানা যায়নি।

এলাহাবাদ ঃ এখানে কাফেলা বার দিন পর্যন্ত অবস্থান করে। কাফেলার অভ্যর্থনায় যথাক্রমে অংশগ্রহণ করেন শায়খ গোলাম আলী রঈস, মুহাম্মদ তাকী ও তদীয় ভ্রাতা, আবদুল্লাহ কাসসাব, শাহ আজমল সাহেবের পুত্র শাহ আবুল মায়ালী, এলাহাবাদ দূর্গের দারোগা বস্তী মিয়া, রণজিৎ খান

মেওয়াতী, প্রধান আমীন মৌলভী কারামত আলী, হাফিজ ইকরামুদ্দীন দেহলবী, হাফিজ নাজারত আলী সওদাগর, মুহাম্মদ হোসাইন, আবদুল কাদির ও শায়খ সারিঙ্গ প্রমুখ।

মির্জাপুর ঃ এখানের অবস্থানকাল তিন দিন। শায়খ আবদুল লতীফ ও শায়খ শাহ মুহাম্মদ আতিথেয়তার আয়োজন করেন। তাদের উভয়ে ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। আবদুল লতীফ সাহেব সম্পর্কে কথিত আছে যে, বিভিন্ন শহরে তার সাতাইশটি বাণিজ্য কুঠি ছিল। তিনি বিদায় বেলা নগদ চার হাজার টাকা হাদিয়া দেন। তাছাড়া নিজ মাতাকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জে গমনের প্রস্তুতি নেন। তিনি নিজের জন্য পৃথক একটি নৌকাও ভাড়া করে নিয়েছিলেন। শায়খ মুহাম্মদ শাহ নগদ পাঁচশত টাকা, একজোড়া পিস্তল, মখমল ও সুতি কাপড়ের বিশটি থান, কাফেলা সঙ্গীদের পোষাক তৈরীর জন্য আঠার থান মোটা কাপড় হাদিয়া দেন।

চুনারুঘাট ঃ অবস্থানকাল তিন দিন। পাঁচটি আমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথমটি জনৈক তামাক ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে দ্বিতীয়টি চাউল মুন্ডীর চৌধুরী সাহেবের তরফ থেকে, তৃতীয়টি নগর চৌধুরীর পক্ষ থেকে চতুর্থটি দুর্গের সিপাহীদের পক্ষ থেকে, আর পঞ্চম আমন্ত্রণ এসেছিল দুর্গের খালাসীদের তরফ থেকে।

বানারস ঃ অবস্থানকাল এক মাসের মত। কাফেলা সেখানে ঈদুল আযহার পূর্বে পৌছে এবং ১০ই মুহাররম (হিজরী ১২৩৭) তারিখে বিদায় নেয়। এখানে তখন প্রবল বৃষ্টিপাত চলছিল। একটানা পনের দিন পর্যন্ত বৃষ্টি থাকে। দুর্যোগের ভিতরেও তাবলীগ ও ইসলাহের কাজ অব্যাহত ছিল। এরই মধ্যে কয়েক স্থানে মেহমানদারীর আয়োজনও করা হল। হাজার হাজার মানুষ বাইয়াত গ্রহণ করে। তন্মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের নাম নিম্নরূপ ঃ

শাহজাদা মির্জা বালাকী,[২২৫] শাহজাদা মির্জা হাজী, মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব, মিয়া ভূলা চাবুক সওয়ার, মিয়া আল্লাহ রাক্ষো সাহেব, মিয়া ইয়ার মুহাম্মদ সাহেব, মিয়া দীন মুহাম্মদ সাহেব, মিয়া লাল মুহাম্মদ সাহেব, মির্জা কারীমুল্লাহ বেগ সাহেব, মৌলভী গোলাম ইয়াহ্‌য়া সাহেব, হাকীম সালামত আলী খান সাহেব, হায়াতুননিছা বেগম, এ ভদ্র মহিলা ছয় হাজার টাকা নগদ হাদিয়া পেশ করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ইতিপূর্বে ইংরেজদের সহিত সম্পর্ক রেখে আসছিলেন তাই সায়্যিদ সাহেব উক্ত টাকা গ্রহণে অসম্মতি জানান। মহিলা তাতে কাঁদতে শুরু করে এবং বলে, আমি তো তওবা করছি, আমার তওবা কি কবুল হবে না ? তিনি বললেন এ সম্পদ নাপাক, আমি কেবল হালাল মালের হাদিয়াই গ্রহণ করে থাকি। হাকীম সালামত আলী খান সাহেব এ বেগমের প্রধান কার্য-নির্বাহী ছিলেন।

সামানিয়্যা ঃ অবস্থানকাল দু'দিন। হযরত সায়্যিদ সাহেবের একান্ত সাথীদের একজন ছিলেন রুস্তম আলী খান। সেকালে তিনি টুংকে অবস্থানরত ছিলেন। তারই পুত্র হযরত সায়্যিদ সাহেবকে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। সেখানে আরও বহু পাঠানগণ হযরতের কাছে মুরীদ হয়। নিকটেই বনের ভিতর জনৈক মজযুব বাস করত। কেউ তার কাছে যেতে চাইলে তিনি নিক্ষেপ করে সরিয়ে দিতেন। হযরত সায়্যিদ সাহেব একাকী তাঁর কাছে পৌছে যান। অবশিষ্ট সঙ্গীরা পেছনে রয়ে যায়। মজযুব লোকটি সায়্যিদ সাহেবকে দেখা মাত্রই অতিশয় প্রফুল্লচিত্তে হাফিযের নিম্নোক্ত গযল আবৃত্তি করতে শুরু করে ঃ

تعالی اللّٰه چه دولت دارم امشب
که امد ناگهاں ولدارم امشب ،

এভাবে পূর্ণ গযলটি সেই মজযুব নিজের মজযুবী হালাতের মধ্যে পড়ে শুনিয়ে গেল। এরপর হাফিযের আরও কতিপয় গযল তিনি শোনাতে লাগলেন। শেষে সায়্যিদ সাহেবকে

জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোন পর্যন্ত যাওয়ার এরাদা করছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, হারামইন পর্যন্ত। মজযুব বললেন, বাইতুল মুকাদ্দাস, বাগদাদ, নাজাফ, কারবালা ইত্যাদিও গমন করবেন ? সায়্যিদ সাহেব বললেন, না অতটুকু নয়, তবে আশু জরুরী একটি কাজ সামনে আছে। হজ্জের পর সেটির আয়োজন শুরু করতে হবে। এ কারণে বর্তমানে আর অন্য কোথাও যাওয়ার এরাদা নেই।

গাযীপুর ঃ এখানে অবস্থানকাল তিন দিন। এখানে গাযীপুরের রঈস শাহ্ মনসুর আলম সাহেব, শায়খ গোলাম যামিন, কাযী মুহাম্মদ হাসান সাহেব, তেগ আলী খান সাহেব প্রমুখ কাফেলাকে দাওয়াত দেন। তাদের সকলে নিজেদের পরিবার-পরিচনসহ হযরতের হাতে মুরীদও হন। গাযীপুরের অপর এক রঈস শায়খ ফরযান্দ আলী সাহেব যিনি হযরত সায়্যিদ সাহেবের একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন। ঘটনাক্রমে তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। বাণিজ্য কাজে অন্যত্র গিয়েছিলেন। তারই ম্যানেজার মির্জা মুহীউদ্দীন বেগ উপস্থিত ছিলেন। তিনি রঈসের পক্ষ থেকে আতিথেয়তার কার্য-সম্পাদন করেন।

বাড়া ঃ অবস্থানকাল ছিল মাত্র একদিন। এ গ্রামটি সেই শায়খ ফরজান্দ আলী সাহেবেরই খরিদকৃত গ্রাম। এখানে শায়খ সাহেবের পুত্র মুহাম্মদ আমীর সাহেব বাস করতেন। তিনিই হযরত সায়্যিদ সাহেবের যিয়াফতের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর গোটা গ্রামের ছোট বড় সকলে সাক্ষাতের জন্য আসে এবং মুরীদ হয়ে যায়। হযরত সায়্যিদ সাহেব এখানে তেগ আলী সাহেব ও সরদার খানকে খেলাফতনামা লিখে দেন।

বিলয়া মৌজা ঃ অবস্থানকাল মাত্র একদিন ছিল। এ গ্রামটিও ছিল শায়খ ফরজান্দ আলী সাহেবের। এখানেও তার পক্ষ থেকে কাফেলার মেহমানদারীর কাজ আদায় করা হয়। শায়খ সাহেবের উল্লেখযোগ্য হাদিয়ার বিস্তারিত বিবরণ

ইনশাআল্লাহ পরে আলোচিত হবে। তবে এখানে বলা আবশ্যক যে, কংগ্রেস আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাক্তার সায়্যিদ মাহমুদ সাহেব যিনি বর্তমানে ভারত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি এই ফরজান্দ আলী সাহেবেরই পৌত্র।

বকসার ঃ বসকার পৌঁছলে বকসারের কাযী সাহেব কাফেলার জন্য পোলাও পাকিয়ে মেজবানী করেন। এ সময় বহু মানুষ হযরতের হাতে মুরীদ হয়।

চিপড়া ঃ অবস্থানকাল একদিন। এখানে জনাব ফরহাত আলী সাহেব কাফেলার আতিথ্য করেন।

দানাপুর ও মৌজা ডংকা ঃ অবস্থানকাল এক সপ্তাহ। এখানকার বিত্তবান ব্যক্তিত্ব শায়খ জান আলী হযরত সায়্যিদ সাহেবকে সঙ্গে করে নিজ মৌজা ডংকা নামক স্থানেও নিয়ে যান। উল্লেখ্য যে, সায়্যিদ সাহেব যখন জিহাদে গিয়েছিলেন তখন বিহার এলাকায় অবস্থিত তার ভক্তবৃন্দের দেওয়া চাঁদার টাকা এই শায়খ জান আলী সাহেবের কাছেই জমা হত। তার নামে সায়্যিদ সাহেবের প্রেরণকৃত কয়েকটি চিঠিও আছে। শায়খ সাহেব ছাড়াও দানাপুরের বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিত্ব সদরুদ্দীন কাসসাবও মুরীদদের একজন ছিলেন।

আযীমাবাদ পাটনা ঃ অবস্থানকাল আটদিন। এখানে আমন্ত্রণকারীদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা সায়্যিদ মাযহার আলী সাহেব মাওলানা এলাহী বখশ সাহেব সাদিকপুরী, রঈস লক্ষ্মী মিয়া, মাওলানা ফতহে আলী সাহেব, শাহ মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব, খাজা কুতুবুদ্দীন সাহেব ইনি হাদিয়া হিসাবে উন্নতমানের বেশকিছু কাপড়, একটি পুরাতন ও দামী গুজরাটী তরবারী, একটি ইংরেজী পিস্তল, একটি বন্দুক, দুটি কামান, দুটি তীর নিক্ষেপক ও প্রায় পাঁচশত নগদ টাকা পেশ করেন। আফগান চামড়া ব্যবসায়ী রহীম খান, তার ভাতিজা ও জামাতা আমীর খান, ব্যবসায়ী আবদুর রহমান সাহেব। এ ব্যবসায়ীগণ বিভিন্ন রকমের কাপড়ের

থান এবং অনেক নগদ টাকা হাদিয়া করেন। উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের সকলে নিজেদের পরিবার-পরিজনসহ মুরীদ হন। তাদের সঙ্গে আরও যারা মুরীদ হয়েছিলেন তাদের সংখ্যাও ছিল কয়েক হাজার।

বাড়হ ঃ অবস্থানকাল দু'দিন। এখানে আশেপাশের জনপদ থেকে বহু মানুষ এসে পৌঁছে। তাদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা বখশ সাহেব, খাজা আফজল আলী, শায়খ সুভপন, ওয়াজিদ আলী সাহেব, ইকরামুল হক সাহেব ও শাহ গসিটা সাহেব। শেষোক্ত জন স্থানীয়ভাবে বিশাল প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁকেই খেলাফতনামা প্রদান করা হয়েছিল।

রাজমহল ঃ অবস্থানকাল মাত্র দু'দিন। এখানে আছেন মুনশী মুহাম্মদী আনসারী। ইনি সায়্যিদ সাহেবের বিশেষ ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন। রাজমহল থেকে তার বাড়ি বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। হযরত সায়্যিদ সাহেবকে তিনি সেখানে নিয়ে যান। তারপর নিজের পরিবার-পরিজনের সকলকে মুরীদ করিয়ে দেন। তার সকল আত্মীয়-স্বজনও তখন মুরীদ হয়। তাদের নাম ছিল নিম্নরূপ ঃ মুনশী শাহ মুহাম্মদ (মহাম্মদী আনসারী সাহেবের পুত্র) মুনশী রউফুদ্দীন সাহেব, মুনশী মখদুম বখশ, মুনশী হাসান সাহেব, মুনশী ফযলূর রহমান সাহেব ও মুনশী আযীযুর রহমান সাহেব।

কলিকাতা ঃ অবস্থানকাল ছিল দীর্ঘ দু'মাস। এখানকার সদস্য ছিলেন মুনশী আমীনুদ্দীন সাহেব, শায়খ রমযানী সাহেব, শায়খ ইমাম বখশ ব্যবসায়ী, কাদির বখশ লক্ষ্মৌবী, সাঈদুদ্দীন সাহেব না খোদা, মুনশী হাসান আলী সাহেব, ফখরুত তুজ্জার শায়খ গোলাম হুসাইন সাহেব, শায়খ গোলাম হুসাইনের পুত্র আবদুল্লাহ সাহেব।

এভাবে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ) হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের নিজ বাড়ি রায়বেরেলী পৌঁছা পর্যন্ত তার কাফেলা যে সকল স্থানে অবস্থান করেছিল সেগুলোর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

নাম ও স্থান	অবস্থানকাল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ
বোম্বাইর ময়মন দাড়া মহল্লা ঃ	অবস্থানকাল আঠার দিন। এখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ কাফেলার সেবাকর্মে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তারা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আনাস ও তার পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব, ইমামুদ্দীন সাহেব, মুহাম্মদী সাহেব, শায়খ বর্ধন। এই শায়খ বর্ধন সাহেব নিজেও কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।
মঙ্গলকোট ঃ	একদিন অবস্থান করা হয়। মুনশী মুহাম্মদী সাহেব আয়োজন করে দেন।
মুরশিদাবাদ ঃ	অবস্থানকাল কয়েকদিন। এখানে কাফেলার আতিথ্য করেন দেওয়ান গোলাম মুরতাযা সাহেব। বিদায়ের মূহুর্তে দেওয়ান সাহেব নগদ টাকাসহ সাতটি উন্নতমানের ছোট পিস্তল, একটি রুমী বন্দুক যেখানে সাতটি গুলির ছিদ্র ছিল। প্রতিটি ছিদ্র পথে দুশত কদম দূরত্ব বেড়ে যেত। সে হিসাব মত সপ্তম ছিদ্র দ্বারা নির্গতগুলি চৌদ্দশত কদম দূর পর্যন্ত পৌঁছে যেত। দেওয়ান সাহেব নতুন যে কাজটি করেছিলেন সেটি হল তিনি স্থানীয় দোকানদারদেরকে বলে দেন যে, কাফেলার সদস্যগণ তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু খরিদ করবে এর বিল তোমরা আমাদের কোষাগার থেকে গ্রহণ করবে। কিন্তু কাফেলার সদস্যগণের সেই ইচ্ছা ততদিনে শোধিত ও সংশোধিত হয়ে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। তারা রাজকীয় জাকজমক ছেড়ে দিয়ে সুকনা রুটি আহারে পূর্ণ অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সৌখিন জিনিসপত্র খরিদের ইচ্ছাই তাদের জাগ্রত হয়নি বিধায় দেওয়ান সাহেবকে একটি বিলও পরিশোধের প্রয়োজন দেখা দেয়নি।
মোঙ্গীর ঃ	অবস্থানকাল মাত্র কয়েকদিন। এখানে সায়্যিদ সাহেব অস্ত্র নির্মাতাদের নিকট থেকে কিছু বন্দুক ও ছোট পিস্তল খরিদ করে নেন।

বসরায়ে বাড়া ঃ এখানেও কয়েকদিন পর্যন্ত অবস্থান করা হয়। তখন মাওলানা বেলায়েত আলী সাহেব, শাহ মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব, সায়্যিদ কারামত উল্লাহ সাহেব, সায়্যিদ আবদুর রহমান সাহেব, তালিব হোসাইন সাহেব, মুহাম্মদ হায়াত সাহেব প্রমুখ মেহমানদের মেযবানী করেন। তারপর সকলেই কফেলার সঙ্গে নিজেদেরকেও যুক্ত করে নেন।

ফুলওয়ারী শরীফ ঃ এখানে একদিনের যাত্রা বিরতি ঘটে। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন শাহ নিয়ামত উল্লাহ সাহেব ও মাওলানা আহমদী সাহেব।

মুহাম্মদাবাদ ইউসুফপুর ঃ বিরতিকাল কয়েকদিন পর্যন্ত। এটি সেই ইউসুফপুর মুহাম্মদাবাদ যার পবিত্র ভূমি প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ডাক্তার মোখতার আহমদ আনসারী ও হাকীম আবদুর রাযযাক সাহেবের ন্যায় দেশপ্রেমিক নওজোয়ানকে জন্ম দিয়েছিল। যারা বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের গৌরব অর্জন করেছিলেন। এখানে একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কাফেলা মুহাম্মদাবাদে অবস্থানকালে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ নিজে একাকীভাবে একটি গ্রামের দিকে রওয়ানা হন। সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করল, হযরত কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা ? তিনি উত্তর দিলেন, بوئے دوست می آیند বন্ধুর সুঘ্রাণ আসছে। এ বন্ধু ছিলেন কাযী ফরযান্দ আলী। ইতিপূর্বেও তার সম্পর্কীয় আলোচনা পেশ করা হয়েছে। অসুস্থতার কারণে তিনি নিজে আসতে সক্ষম হন নি। সায়্যিদ সাহেব তার বাড়ি পৌঁছলে তিনি খুশি হন। বিদায় বেলা হাদিয়া হিসাবে নগদ এক লক্ষ টাকা ও একটি উন্নত জাতের ঘোড়া পেশ করেন। তারপর নিজের এক সন্তানকেও তিনি কাফেলার জন্য নযরানা হিসাবে পেশ করেন। তার নাম সায়্যিদ মুহাম্মদ আমজাদ। সায়্যিদ সাহেব অন্যন্ত গৌরবের সহিত সঙ্গীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন তোমরা আমার বন্ধুকে দেখছো তো ? অনুপ্রেরণার এতই সাদৃশ্যতা

ছিল যে, তিনি কাযী সাহেবের সন্তানকে নিজের সঙ্গে রেখে সেই রঙ্গে রঙ্গীন করে দেন। তারই পৌত্র ডাক্তার সায়্যিদ মাহমুদ সাহেব সেই স্বাধীনতার অনুপ্রেরণার ওপরেই লালিত পালিত হন।

বানারস ঃ অবস্থানকাল কয়েকদিন। এখানে মির্জা মাহমুদ বখশ ও মির্জা বালাকী যারা অযোধ্যার রাজ পরিবারের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন তারা কাফেলার সেবাকর্মে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

মির্জাপুর ঃ অবস্থানকাল মাত্র একদিন। এখানে শায়খ আবদুল লতীফ সহেব আতিথেয়তার দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে নিজেও কাফেলার সঙ্গী হন। এলাহাবাদ রঈসের পুত্র শায়খ গোলাম হোসাইন সাহেবও এখানে পৌঁছে যান। তারপর মির্জাপুর থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত পথের যাবতীয় ব্যয় সাহেবজাদা নিজে নির্বাহ করেন।

মেহেরুন্দা ও ইলিয়েটগঞ্জ ঃ এলাহাবাদ থেকে তিনি গোলাম হোসাইন সাহেবের গ্রামের বাড়ি মেহরুন্দা গমন করেন। সেখানে এক রাত্রি অবস্থানের পর চলে গেলেন ইলিয়েটগঞ্জ। সেখান থেকে মুস্তফাবাদ ও অন্যান্য স্থানেও গমন করেন। এ সফরে তালিব আলী আযীমাবাদী তার ঘোড়ার লাগাম বহন করেন। ঘটনাক্রমে তার পায়ে কাটা বিধে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে অপর এক সঙ্গী নিজের ঘোড়া তাকে দান করে বলল, তুমি ঘোড়ায় চড়ে আরামে পথ অতিক্রম করো। কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। কেউ লাগামের বদলে রাজ সিংহাসন দান করলেও আমি নিতে রাজি নই।

زراه عشب اگر در یا خلد خارے
نباید از زہش بر بز کدرن
که از خاہش کلها شگوفد
قدم بر خار باید تیز کردن ،

প্রত্যাবর্তন

সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে, এ সফরে দীর্ঘ দু'বছর দশ মাস কাল অতিক্রমের পর ২৯শে শাবান হিঃ ১২৩৯ মোতাবেক ২৯শে এপ্রিল ১৮২৪ সালে তিনি নিজ বাড়িতে অবতরণ করেন।

বায়তুলমাল

কাফেলা যখন বাড়ি থেকে যাত্রা করছিল তখন সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত অবস্থায় ছিল। একমাত্র মহান আল্লাহ পাকের অফুরন্ত খাজানার ওপরই তারা ছিলেন আস্থাশীল। এ আস্থাশীলতা ও ভরসার ফল দাঁড়িয়েছিল যে, দু'বছর দশ মাস পর্যন্ত রাজকীয় বিশালত্বসহ পূর্ণ কাফেলার ব্যয়-ভার নির্বাহ করার পাশাপাশি প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ এবং কেবল নিজেদের জন্যই নয় বরং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলে জন্য হাদিয়া তোহফা খরিদ করার পরেও কাফেলা যখন রায়বেরেলীতে পৌছল তখন হিসাব করে দেখা গেল বাইতুল মালে তখনও দশ হাজার টাকা অতিরিক্ত রয়ে গিয়েছে।

সংশোধন ও প্রশিক্ষণদান

ইসলামে হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং এ ফরযের আদায় করাও একটি পবিত্র সংকল্প। কিন্তু ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ সফরের উদ্দেশ্য একমাত্র হজ্জ করাই নয়। বরং এটি একটি বিপ্লবী আন্দোলন যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আন্দোলনের স্থপতি (হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ) পূর্বেই فك كل نظام বাক্যে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে গিয়েছেন। যে আন্দোলনের তালীম ও তাবলীগ হযরত শাহ আবদুল আযীয নিজের রাজনীতি প্রশিক্ষণাগারে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবৎ পরিচালনা করে আসছেন। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ)-এর এই ভ্রমণ কার্য ছিল সেই আন্দোলনেরই অবিচ্ছিন্ন একটি অংশ। এ কাফেলার আটশত সঙ্গীরা সংক্ষিপ্ত অর্থে কেবল হাজীই নয় বরং তারা কোন বিপ্লবকে সফল করার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলিষ্ঠ কর্মীদল বটে। দীর্ঘ প্রশিক্ষণ ও মুজাহাদার দ্বারা এরা নিজেদের তনুমন সককিছু পরিবর্তন করে নিয়েছে ফলে তারা যে এলাকা ও যে জনপদে গিয়ে উঠছে সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতিও বদলিয়ে দিচ্ছে। এদের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক বিপ্লব সামান্য আচল মাত্র যার জামা হল নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব।

এরা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লালায়িত নয় বরং যেকালে এ দেশের কোন কোন রাজনৈতিক ও সামরিক পট পরিবর্তনের পালা চলছিল তখন তারাই সে সকল পরিবর্তনের নায়কের ভূমিকা পালন করছিল। তখনকার যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করেছিল। তাদের মধ্যে নেতৃত্ব ও বীরত্ব প্রকাশ এখন আর অতি আকাঙ্খার কিছুই নয়। বরং তা থেকে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে এখন তাদের বিশ্বাস প্রকৃত বিপ্লব হল সামাজিক বিপ্লব। আর এই সামাজিক বিপ্লব ব্যতিরেকে فك كل نظام-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয় আর এটি ব্যতিরেকে স্বজাতির লোকদেরকে পরজাতির শৃঙ্খল থেকেও মুক্ত করা সম্ভব হবে না।

রণক্ষেত্রে তরবারীর ঘাত প্রতিঘাত দ্বারাও জিহাদ হতে পারে তাতে তাদের কোন অস্বীকৃতি নেই। তবে তাদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা হল যে, তীর, তলোয়ার ও বন্দুকের লড়াই তখনই জিহাদে পরিণত হবে যখন মুজাহিদীনের নিয়্যত থাকবে পরিচ্ছন্ন, তাদের নৈতিকতা উন্নতমানের ও উদ্দেশ্য হবে উচ্চ বিষয়ের। তাদের বিশ্বাসমতে জিহাদের কর্মী ঐ ব্যক্তিই হতে পারে যে আখলাক ও নৈতিকতায় নিজে যেমন প্রশিক্ষণ দ্বারা সুগঠিত হয় তেমনি নিজ আদর্শের দ্বারা কোন সমাজকে পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম।

তারা খুব ভাল করেই জানত যে, পবিত্র কুরআন তরবারীর জিহাদ পরিচালনার পূর্বে নিজের সত্তা ও নিজের সমাজকে সংশোধন করে নেওয়া শুধু ফরযই নয় বরং বৃহত্তর জিহাদ বটে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وجاهدهم به جهاداً كبيراً

সাধারণভাবে অন্যের বিনাশ সাধন করাই জিহাদের অর্থ বলে মনে করা হয়। অথচ এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা মনে করে ইসলাম যে জিহাদকে উচ্চতর ইবাদত হিসাবে আখ্যা দিয়েছে সেটি অপরের বিনাশ নয় বরং চেষ্টা ও প্রচেষ্টার কাজে যেখানে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে দেওয়া হয় সেটি হল জিহাদ। তারা মনে করেন মুজাহাদা হল নিজের বড়ত্বভাব ও আমিত্ব খতম করা এবং নিজ ব্যক্তিস্বত্ত্বাকে এতখানি মিটিয়ে দেওয়া যে এখানে আমি বা আমার বলতে কিছুই থাকবে না।

জাতীয়তাবাদ যা বর্তমানের রাজনৈতিক অঙ্গনে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন চেতনা বলে জ্ঞান করা হয় সেই মুজাহিদ কর্মীগণ এ ধারণাকেও রাজতান্ত্রিকতা ও ক্ষমতা

লিপ্সার একটি শাখা বলে জ্ঞান করেন। কারণ এখানে নিজ স্বত্তার স্বার্থ না হলেও নিজ জাতি কিংবা নিজ নেশনের আধিপত্যের চিন্তা করা হয়। নিজের বংশকে না হলেও নিজ দেশীয় ভ্রাতৃত্বকে গোটা সৃষ্ট জগতের ওপর সওয়ার করার অভিলেষ কার্যকরী থাকে। স্বজাতি ও স্বদেশীদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষায় তখন বিশ্বশান্তির পথে বিঘ্নতা ডেকে আনে, জাতীয়তার ধ্বজা তুলে মানবতার ওপর বিপর্যয় চালিয়ে যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের জাতীয়তাবোধও নিন্দিত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا نساراً

অর্থাৎ আখিরাতের সেই ঘর যা মানুষের সবচেয়ে পবিত্র উদ্দেশ্য, বিশ্ব শ্রষ্টা আল্লাহ পাক সেটি তাদের জন্যই নির্ধারণ করে রেখেছেন যারা পৃথিবীতে ক্ষমতা পুজা কিংবা স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষাকে উদ্দেশ্য হিসাবে স্থির করে নি এবং যারা কোনরূপ বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় না।

এ 'জিহাদে কাবীর' ও সমাজ সংশোধনের কতিপয় দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে প্রথমবারের সফরের বর্ণনাকালে আলোচনা করেছি। সেমতে দ্বিতীয়বারের সফরে সংস্কারমূলক যে সকল কাজ করা হয়েছিল তার কিছু উদাহরণ নিম্নে দ্রষ্টব্য।

জনসেবা

হযরত সায়্যিদ সাহেবের কাফেলা মির্জাপুর পৌঁছে দেখল ঘাটে একটি নৌকা নোঙ্গর করে আছে। নৌকার মধ্যে তুলার গাইট বোঝাই করা। মালিক এ গাইটগুলো নামাতে চাচ্ছেন কিন্তু তিনি কোন মজুর পাচ্ছিলেন না। কাফেলা সঙ্গীরা মালিকের এ অস্থিরতা অনুভব করতে পারলেন। ফলে অগ্রসর হয়ে তারা ঐ লোকের তুলার গাইটগুলো নামিয়ে তার গুদাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিল। মালিক নিজেও আশ্চার্য আর শহরবাসী লোকেরাও হতবাক হয়ে গেল যে, পূর্ব থেকে জানাচেনা ব্যতিরেকে ফেরেশতাদের এ দল কোথা থেকে এসে গেল ; চেহারা ও পোষাকে শরাফতের চিহ্ন বিদ্যমান অথচ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে বিনা পারিশ্রমিকে তুচ্ছ মজুরের কাজ করে দিচ্ছে।

সাম্য

সেই মির্জাপুরেরই ঘটনা। এখানে ইট পোড়ানো লোকদের সাতটি বাড়ি ছিল। যেহেতু তারা পোড়ানো ইট পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য গাধাও রাখত তাই

তার গাধাওয়ালা নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। শহরের বড় বড় খান্দানের লোকের এ কারণে তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করত, তাদের বাড়ি গিয়ে কোন কিছুর আহার করাকে চরম লজ্জাকর বলে জ্ঞান করত।

কিন্তু সায়্যিদ সাহেব মির্জাপুর পৌঁছলে দরিদ্র এ গাধাওয়ালা লোকদের মনেও তার কাফেলাকে আমন্ত্রণের আকাঙ্খা জাগল। এ ব্যাপারে প্রথমে তার কথাটি বলার সাহসও পাচ্ছিল না। পরে অনেক হিম্মত করে তারা কথাটি ব্যক্ত করলে কাফেলার অন্যান্য আমন্ত্রণকারীগণ তা চরমভাবে প্রতিবাদ করে বসে। কিন্তু শহরবাসী ও আমন্ত্রণকারীরা তখন অবাক হয়ে গেল যখন তারা দেখল যে, এতদসত্ত্বেও হযরত সায়্যিদ সাহেব হাসিমুখে গরীব গাধাওয়ালাদের দাওয়াত কবুল করে নেন। তারপর তিনি খুব আগ্রহের সহিত তাদের মহল্লায় যান এবং আন্তরিকতা ও ভালবাসার সহিত আহার গ্রহণ করেন। আহারের পর তারা একটি তশতরীর ওপর নগদ চারশত টাকা এবং অপর একটির ওপর রেশমী কাপড় ও ধারীদার কাপড়ের থান ইত্যাদি হাদিয়া হিসাবে পেশ করে। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব এ হাদিয়া গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, আমি যদি তোমাদের হাদিয়া গ্রহণ করি তাহলে শহরবাসী লোকেরা মনে করবে যে, এ হাদিয়ার লোভেই আমি দাওয়াত কবুল করেছি।

বানারস

বানারসে তালুকা নামক জনৈক মুচী বাস করত। লোকটি ছিল অতিশয় গরীব। একটি ছোট ঝুপড়ির মধ্যে নিজের স্ত্রী নিয়ে বাস করত। মৌলভী আবদুল্লাহ ও ভুলা চাবুক সওয়ারের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। সায়্যিদ সাহেবের কাফেলা যখন বিশাল জাকজমক সহ বানারসে পৌঁছে তখন কাফেলার কথা শহরের সর্বত্র জানাজানি হয়ে যায়। লোকজন প্রচুর আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে কাফেলাকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। তখন দরিদ্র মুচী লোকটির মনেও সেই অভিলাষ জেগেছিল। কিন্তু মনে মনে দুশ্চিন্তাও করছে যে, দরিদ্র এ মুচীর গৃহে যুগের সম্রাট কিভাবে আসবেন। আর কেই বা তাকে আসতে দিবেন? অতঃপর তারই বন্ধু মৌলভী আবদুল্লাহ ও ভোলা চাবুক যখন তার কাছে মুরীদ হয়ে গেল এবং হযরত সায়্যিদ সাহেবের বিভিন্ন প্রশংসা করতে লাগল তখন দরিদ্র তালুকার মনে কষ্টের সীমা রইল না। অবস্থাদৃষ্টে উভয় বন্ধু তাকে সান্ত্বনা

দিয়ে বলল তুমি যদি হযরতকে দাওয়াত দিতে চাও তা হলে তিনি অবশ্যই তোমার এখানে আসবেন। তালুকা এটিকে তার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া মনে করছে। অতি আন্তরিকতার সাথে সে হযরত সায়্যিদ সাহেবের কাছে আমন্ত্রণ পেশ করলে তিনি আগ্রহের সাথে এ দাওয়াত কবুল করেন। সেমতে যথাসময়ে তিনি তার ঝুপড়ীতে পৌঁছেও গেলেন। দরিদ্র মুচী লোকটি সে সময় একটি ছেড়া ধুতি ও চেড়া ময়লা কোর্তা পরিহিত ছিল। এ অবস্থাতেই সে সায়্যিদ সাহেবের সামনে আসল। তিনি নিঃসংকোচে তার সঙ্গে একটি চৌকীর ওপর বসেন, প্রাণ খোলাভাবে তার সাথে কথাবার্তা বলেন। লোকটি হযরতকে সাত পয়সা হাদিয়া দেয়। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তা কবুল করেন এবং সঙ্গীদেরকে বলেন এ হাদিয়া যেন সংরক্ষিত রাখা হয়। হযরতের এ সরলতা ও আন্তরিকতা প্রদর্শনের ফল হয়েছিল যে, মুচীর বংশের বিশ পঁচিশটি পরিবার সায়্যিদ সাহেবের জন্য প্রাণোৎসর্গী হয়ে যায়। তারা মুসলমান হয়ে সায়িদ সাহেবের হাতে মুরীদ হয়[২২৬]।

কলিকাতা

কলিকাতায় জনৈক পীরজাদা সাহেব তাকে দাওয়াত করেছিলেন। তিনি সায়্যিদ সাহেবের সম্মানার্থে পথে পাগড়ী বিছিয়ে দেন। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব এখানে আসামাত্রই মাটির ওপর থেকে বিছানো পাগড়ী তুলে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বললেন, কাপড় পরিধান করার জন্য, পা দ্বারা দলিত করার জন্য নয়।

কলিকাতা বন্দরে বারটি জাহাজ ভাড়া করা হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল বিশাল আকারের যুদ্ধ জাহাজ। জাহাজটির নাম 'আতিয়াতুর রহমান' ষাটটি কামান তার ওপর সাজানো থাকত। এর পরিচালক মুহাম্মদ হুসাইন তুরক চল্লিশটি জাহাজের কাপ্তান ছিলেন। সায়্যিদ সাহেবের একান্ত বিশেষ মুরীদ ফখরুত তুজ্জার গোলাম হুসাইন সাহেব প্রস্তাব পেশ করে বলেছিলেন যে, সায়্যিদ সাহেব এ জাহাজে আরোহণ করবেন। তাহলে তিনি আরব অঞ্চলে পৌঁছলে লোকজন তাকে অধিক সম্মান করবে।

এ কথা শুনে সায়্যিদ সাহেবের চেহারা লাল হয়ে গেল, রাগে তার চেহারা যেন ফেটে পড়বে। তিনি বললেন, সম্মান আর অপমান সবই আল্লাহ পাকের হাতে। লোক দেখানো সম্মানের আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই। এ কথা বলে

তিনি নিজ সঙ্গীদেরকে ভাল ভাল জাহাজগুলোতে উঠিয়ে দেন। তারপর নিজে পুরাতন মডেলের একটি জাহাজে আরোহরণ করেন। কথিত আছে এ জাহাজটি চলার ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল ছিল। এর নাম ছিল 'দরিয়াবাকী[২২৭]। তার এ সাম্য সবরলতা ও অনাড়ম্বরতার ফলেই কলিকাতা অবস্থানকালে তিনি শায়খ মুহাম্মদ আমীন সাহেবকে বলে দেন যে, আমাদের সকলের জন্য একই ধরনের আহার তৈরী করবেন। আহারের ক্ষেত্রে নানা রকমের আড়ম্বর পূর্ণ আহার না হওয়া চাই। এখানে প্রত্যহ আতিথেয়তার জন্য রকমারী আহার প্রস্তুতের যে নীতি শুরু হয়েছে তা যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেমতে তার পর থেকে আর রকমারী আহার প্রস্তুত করা হয় নি।

কলিকাতার কতিপয় বিত্তবান বর্ণিক কাফেলার সদস্যদের জন্য কয়েক জোড়া পরিধেয় বস্ত্র ও কয়েকটি করে ইহরামের কাপড় খরিদ করে দিয়েছিল। হযরত সায়্যিদ সাহেব এ কথা জেনে সদস্যদের প্রত্যেকের জন্য শুধু দুটি করে ইহরামের কাপড় (অর্থাৎ দুটি পরিধানের আর দুটি গায়ে দেওয়ার কাপড়) মঞ্জুর করে অবশিষ্ট কাপড় ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন ন্যূনতম প্রয়োজন দুটির দ্বারাই সেরে যায়। তারপরে আগামী সময়ে প্রয়োজন হলে মহান আল্লাহ নিজ থেকেই ব্যবস্থা করে দিবেন। পূর্ব থেকে বোঝা বহনের কি প্রয়োজন ?

দ্বিতীয়বারের সফরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল এ সফরে তাযিয়াদারী ও মাতমের কুপ্রথা বন্ধ করা হয়। প্রায় সব বাড়িতেই তখন তাযিয়া রাখার জন্য মাটি উঁচু করে ভিটার মত বানানো থাকত। মসজিদের ন্যায় এ স্থানটিকে সম্মান করা হন। তিনি মালিকদের সম্মতি নিয়ে এগুলো ভেঙ্গে দেন। তারপর তাযিয়ার অভ্যন্তরস্থ বাশের কঞ্চিগুলোর দ্বারা কাফেলার খানা পাকানোর কাজ করা হয়। অনুরূপে এ সফরে কবরপুজার উচ্ছেদ সাধন করা হয়েছে। কারণ হল এ সকল কুপ্রথা প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমান জাতিকে দুর্বলমনা ও উদ্যোমহীন করে দেয়। তাছাড়া এগুলো মানুষকে বাস্তব সত্যের উপলব্ধি থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে।

যারা মুরীদ হয়েছিলেন তাদের বহু সংখ্যক ছিলেন ইতিপূর্বে বিলাস মত্ততায় জীবন যাপনকারী। কোলকাতার শায়খ আমীনুদ্দীন ও এলাহাবাদের শায়খ

গোলাম আলী সাহেবের মত প্রাণ উৎসর্গী মুরীদ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মুরীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের জীবনে আনন্দ উল্লাস ও ভোগে মত্ততা বিবর্জিত ছিল। অথচ মুরীদ হওয়ার পর তাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। এ ধরনের প্রভাবশালী লোকজনের জীবনে পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফল হয়েছিল যে, কাফেলা যেখানে যেখানে যেত সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি আকাশ পাতাল পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে যেত। কলিকাতায় কাফেলা বেশ অনেক দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছিল বিধায় স্থানীয় মদ্যশালা ও তাড়ী দোকানীদের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এমনকি বেশ্যালয়ের ঠিকাদার লোকেরা নিজেদের ঠিকাদারী ফিরিয়ে দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত শুরু করেছিল। বলা বাহুল্য এটিই ছিল সামাজিক বিপ্লবের রূপরেখা যা সাধিত হওয়া ব্যতিরেকে فك كل نظام -এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে পারে না।

কঠোরতা এড়িয়ে চলা

সংস্কার ও প্রশিক্ষণ কাজের বুনিয়াদী নীতি হল কাজের ক্ষেত্রে রূক্ষতা ও কঠোরতা এড়িয়ে চলতে হবে। সকল ক্ষেত্রে নম্রতা বিনয় ও ধৈর্য্য সহ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। সায়্যিদ সাহেব কতিপয় মানুষকে তিব্বতের দিকে প্রেরণ করেন। তখন তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন, তোমাদেরকে কেউ যদি লাঠির আঘাতে কিংবা পাথর নিক্ষেপে কিংবা পথে টেনে হেচড়িয়ে রক্তাক্ত করেও দেয় তবুও ধৈর্য্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করবে। প্রতিবাদ করে কাউকে কিছু বলবে না (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ পৃঃ ২১৯)।

আসাম ও বঙ্গদেশে কাজ করার জন্য তিনি যাদেরকে নির্ধারণ করেছিলেন তাদেরকেও নিম্নোক্ত উপদেশ দেন ঃ

'যে তোমাদেরকে প্রহার করবে কিংবা দুঃখ বা কষ্টে নিক্ষেপ করবে তাতে কোন প্রতিবাদ জানাবে না। ধৈর্য্য ধারন করবে এবং সর্বদা মানুষকে ওয়ায নসীহত করা অব্যাহত রাখবে[২২৮]।'

হিজায অঞ্চলে তৎকালে যাযাবর আর দুস্যদের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। হাজীদের কাফেলার ওপর চড়াও হওয়া নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তাছাড়া মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ যাওয়ার পথটি ছিল নিশ্চিত দস্যু-ডাকাতের হাতে আক্রান্ত হওয়ার পথ। এ কারণে হাজীদেরকেও অস্ত্র সজ্জিত হয়ে এ পথ পাড়ি

দিতে হত। হযরত সায়্যিদ সাহেবের মুক্তহস্তের দানশীলতা তার আটশত সঙ্গীদের মনে এ কথার আস্থা সৃষ্টি করে দেয় যে, তিনি যেখানেই যাবেন কুদরতী অদৃশ্য ধন-ভান্ডার তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই পৌঁছে যাবে। এ কারণে তার কাফেলা ডাকাত ও দস্যুদের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হওয়াও একান্ত নিশ্চিত ব্যাপার ছিল। এতটুকু নিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকাসত্ত্বেও হিজাযের পথে তিনি সঙ্গীদেরকে বলে দেন, কেউ যেন নিজের সঙ্গে কোন হাতিয়ার না রাখে। সম্পূর্ণ খালি হাতে অস্ত্রশস্ত্র ব্যতিরেকে সকলে যেন মদীনার পথে যাত্রা করে। কাফেলার সদস্যগণ সেমতে অস্ত্রহীনভাবেই নিরাপদে মদীনার পথ অতিক্রম করেছিল।

বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী

বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী মানুষের চারিত্রিক গুণের বুনিয়াদী বিষয়। কাফেলার প্রতিটি সদস্য এ গুণের অনুপম আদর্শে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণেই কোলকাতা অবস্থানকালে শায়খ আমীনুদ্দীন সাহেব তাদেরকে নিজের বাগানে অবস্থান করতে দেন। বাগানে সব ধরনের ফুল ফল বিদ্যমান ছিল। শায়খ সাহেবের পক্ষ থেকে এগুলো ভোগ করার অনুমতি ও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, কেউ তো বাগানে কোন ফল কিংবা ফুল ছেড়া তো দুরের কথা, ঝরে পড়া ফলও কেউ নিজের জন্য তুলে নিচ্ছে না। প্রত্যহ এগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সায়্যিদ সাহেবের কাছে জমা দেওয়া হত। তিনি সেগুলো কাফেলার সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। এটি যেমন তাদের মধ্যকার আমানতদারীর অনুপম দৃষ্টান্ত তেমনি সমাজ বদ্ধ জীবনের নিয়ম শৃঙ্খলা কি ধরনের হওয়া উচিত তার উদাহরণও এখানে বিদ্যমান।

পাঠক ইতিপূর্বে আরও লক্ষ্য করে আসছেন যে, মুরশিদাবাদ জেলায় দেওয়ান গোলাম মুরতাজা কাফেলার জন্য বাজারের সকল জিনিস পত্রও ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। সাথে সাথে তিনি দুনিয়ার প্রতি সদস্যদের নির্মোহ জীবনের দুর্ভল উদাহরণ দেখেও ব্যাকুল হয়ে গিয়েছেন। কারণ কাফেলার কেউ বাজার থেকে কোন জিনিস আনার প্রয়োজন বোধ করে নি, আর এ দিকে কারুর মনো নিবেশও লক্ষ করা যায় নি।

বলা বাহুল্য তাদের দীর্ঘ সফরের স্বাভাবিক দাবী হিসাবে নিজের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য হলেও কিছু হাদিয়া তোহফা খরিদের প্রয়োজন ছিল।

আর এ প্রয়োজন মেটানোর পথও তখন গোলাম মুরতাযা সাহেব উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অথচ তারা নিজ প্রবৃত্তি ও খায়েশকে এতখানি সংযত করে নিয়ে ছিলেন যে, সে ইচ্ছা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে দেয় নি। আর ইচ্ছা সৃষ্টি হলেও তারা ইচ্ছাকে দমন করা পছন্দ করেছেন কিন্তু আমন্ত্রণকারীর উপর সামান্য বোঝা তুলে দেওয়াকে পছন্দ করে নি।

টীকা

২২২. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ২৪৭-২৪৮।

২২৩. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ।

২২৪. এখান থেকে যাত্রা করার পর জনৈক ইংরেজের মুসলিম স্ত্রী তাকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি কবুল করতে অসম্মতি জানান। পরে ইংরেজ লোকটি নিজে এসে দাওয়াত করলে তিনি সে দাওয়াত কবুল করেন (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ১৯৫)।

২২৫. শাহজাদা মির্জা বালাকী অযোধ্যা রাজ্যের শাহজাদা ছিলেন। মির্জা হাজী কিছুকাল গাযীউদ্দীন হায়দারের অধীনেও চাকরী করেন (কায়সারুত তাওয়ারীখ, খঃ ১, পৃঃ ১২৮ ও১২৯)।

২২৬. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ২০৭।

২২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৮।

২২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৫।

নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বাস্তব চিত্র

ইতিপূর্বে হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর প্রশিক্ষণালয় সম্পর্কীত আলোচনায় আমরা এ প্রশিক্ষণ ও দীক্ষাদানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করে আসছি। সেখানে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ)-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযাত্রার বিস্তারিত বিবরণসহ সংস্কারমুলক বিভিন্ন কাজকর্মের সম্পাদন ও প্রশিক্ষণদানের নানাবিধ প্রতিক্রিয়া ও ফলশ্রুতি সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা এ আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের ব্যক্তিগত জীবন ধারা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করছি। তাহলে ভিন্ন শিরোনামে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ফলাফলের বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাছাড়া আরও বুঝা যাবে যে, কাফেলার সদস্য কর্মীরা যারা গণমানুষের মাঝে সংঘবদ্ধভাবে সংস্কারের এ অভিযান পরিচালনা করছে তারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং আত্মজীবনে এ সংস্কারানুভূতিকে কতখানি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের এ সংস্কারাভিযান তাদের নিজেদেরকে কতটুকু রঙ্গীন করতে পেরেছিল।

কর্মীদের ব্যক্তিজীবন এবং তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অভিরুচীর ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হলে খুব সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব যে, এ সকল বুযুর্গানে দীন যে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল?

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ)

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ অযোধ্যার একটি সুপরিচিত খান্দানের সদস্য ছিলেন। পূর্বকাল থেকেই এ খান্দান তাকওয়া ও তাহারাত, খোদাভীতি ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা এবং পরোপকার ইত্যাদি মহৎ গুণের ধারক বলে ব্যতিক্রম ধর্মী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। আর এ সকল সৎগুণাবলীর কারণেই তাদের 'খানকাহ' যা 'তাকিয়ায়ে শাহ ইলমুল্লাহ'[২২৯] (হযরত শাহ ইলমুল্লাহর দরবার শরীফ) নামে সুপরিচিত ছিল সেটি সমগ্র অযোধ্যার ইলমী ও রুহানী তথা জাহেরী ও বাতেনী শিক্ষা ও দীক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

হযরত সায়্যিদ সাহেবের মাতামহ ছিলেন হযরত শাহ আবু সাঈদ (রহ)[২৩০]। যিনি হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ)-এর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। হযরতের মামা হযরত শাহ আবুল লাইছ (রহ)[২৩১] ছিলেন হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর অন্যতম শিষ্য। এ সকল কারণে ওয়ালী উল্লাহী চিন্তাচেতনার সার নির্যাস ও মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্ব থেকেই তার ধমনীতে বিরাজিত ছিল।

এ কারণেই হযরত সায়্যিদ সাহেবের পাড়া প্রতিবেশী লোকেরা তাঁকে অতি শৈশবকাল থেকে এমন একটি শিশুর চরিত্রে দেখতে পেয়েছিল যার মন মস্তিষ্ক ও গোটা আপাদমস্তক ছিল গণমানুষের সেবা ও কল্যাণ চিন্তার দ্বারা সম্পূর্ণ উদ্বেলিত।

জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এ দরদ ও কল্যাণ চিন্তা সামান্য শিশুকে শুধু নিজ মহল্লাই নয় বরং আশপাশের অন্যান্য মহল্লায় অবস্থিত অসহায় দুর্বল অনাথ অভিভাবকহীন লোকদের সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়। নিজ অন্তরের অব্যক্ত সমবেদনা তাকে সকাল সন্ধ্যায় অসহায় লোকদের সেবায় হাজির হতে বাধ্য করে। তিনি নিয়মিত তাদের কাছে যেতেন । তাদের প্রয়োজনগুলো জেনে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সেগুলো পুরনের ব্যবস্থা করতেন। তিনি নিজে বাজারে গিয়ে তাদের জন্য সদায়পত্র এনে দিতেন। কুপ থেকে পানি তুলে নিজেই বহন করে তাদের বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতেন। এভাবে অসুস্থ ও বিপদগ্রস্থদের সেবাযত্ন, দরিদ্রদের সাহায্য দান, দুর্বলদের বোঝা বইয়ে দেওয়া ইত্যাকার সেবামূলক কাজকর্ম শিশু সায়্যিদ আহমদের প্রিয় কাজকর্মে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

শিশু সায়্যিদ আহমদ ক্রমে বড় হতে থাকে। ক্রমশ বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রথাগত লেখাপড়ার প্রতি তার আগ্রহ উদ্দীপনা অতিদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় নি। তবে তার মনে মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধন চিন্তা এতখানি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল যে, একবার যখন তিনি রুজি রোজগারের সন্ধানে সমবয়সী বালকদের সঙ্গে লক্ষ্ণৌর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন পথিমধ্যে সফরসঙ্গীদের কেবল সেবাই নয় বরং তাদের বোঝাগুলো পর্যন্ত তিনি নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, হযরতের বয়স যখন সবেমাত্র ১২ বছর তখন তাঁর আব্বাজান ইন্তেকাল করেন। পিতার স্নেহছায়া হারানোর ফলে বাধ্য হয়ে তাকে রোজগারের দিকে অগ্রসর হতে হল। তিনি সমবয়সী ৭ জন বালকের সাথে লক্ষ্ণৌ গমনের

সিদ্ধান্ত নেন। যাত্রা শুরুর কয়েক মাইলের ভেতর তিনি দেখলেন সাথীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। নিজেদের সামান্য ব্যাগপত্র বহন করতেও তাদের কষ্ট হচ্ছে। বালক সায়্যিদ আহমদ অনতিবিলম্বে একটি বুদ্ধি খাটিয়ে সকলের মালপত্র এক জায়গায় করে একটি বড় বোঝার মত বানালেন। তারপর সকলকে আরামের সুযোগ করে দিয়ে তিনি একাই সেই বোঝা মাথায় তুলে নিলেন। সাথীরা সকলে আরামে চলতে লাগল আর তাদের সাথে প্রখ্যাত পীর বংশ ও সায়্যিদ বংশের জনৈক সন্তান নিঃসংকোচে সকলের বোঝা নিজ মাথায় তুলে হেটে চলল। রায়বেরেলী থেকে লক্ষ্ণৌর দুরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মাইল। এ পথ অতিক্রম করতে তাদের তিন দিন সময় লেগেছিল। আর প্রত্যেক দিনই সায়্যিদ সাহেব একই পদ্ধতিতে সাথীদের সেবা করে যান। সাথীদের কেউ কেউ বোঝা অর্পনে অসম্মতি জানিয়েছিল। কিন্তু তিনি অতিশয় দরদ ও কোমল ভাষায় তাদেরকে শেষ পর্যন্ত রাজি করিয়ে নিতেন।

লক্ষ্ণৌ গিয়ে পৌঁছলে স্থানীয় জনৈক আমীর সায়্যিদ সাহেবকে চিনে ফেলেন। আমীর তখন সায়্যিদ সাহেবকে তার বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণের অনুরোধ জানান। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব নিজের অন্য সাথীদেরকে ছেড়ে একা কারুর আতিথেয়তা গ্রহণকে পছন্দ করলেন না। ফলে আমীর সায়্যিদ সাহেব যেখানে থাকতেন সেখানে তাঁর আহারের জন্য সকাল বিকাল আহার পাঠিঠয়ে দেন। সায়্যিদ সাহেব সাথীদেরকে নিয়ে এ আহার গ্রহণ করেন। কখনও কখনও এমনও ঘটেছিল যে, রোজগার হীনতার সেই দিনগুলোতে সায়্যিদ সাহেবের জন্য পাঠানো একজনের আহারই সকল সাথীদের অনাহার দূর করার একমাত্র অবলম্বনের কাজ দিয়েছিল।

এভাবে চলে গেল কয়েক মাস। রুজি রোজগারের তেমন সুবন্দোবস্ত হল না। সায়্যিদ সাহেব সাথীদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, এভাবে ঘুরে আর কতদিন কাটাব? চল দিল্লী চলে যাই। সেখানে গিয়ে হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর দরবারে হাজির হয়ে দীন কামাই করে নেই। সাথীরা তাতে সম্মত হল না। অগত্যা তিনি একাই চললেন দিল্লীর উদ্দেশ্যে।

এ সফরের একটি ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি পথিমধ্যে দেখলেন যে, জনৈকি বৃদ্ধলোক মাথার ওপর রাব ভর্তি একটি কলস তুলে নিয়ে এক সিপাহীর পেছনে

পেছনে হেটে চলছেন। লোকটি এতই দুর্বল যে চলার মত শক্তি ছিল না। কিন্ত যেন অগত্যা তাকে এ বোঝা মাথায় নিতে হয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন যে, সম্ভবতঃ সিপাহী লোকটি অন্যায়ভাবে তাকে খাটিয়ে নিচ্ছে। তাই তিনি সিপাহীকে হিতোপদেশের চেষ্টা করেন। সিপাহী উত্তর দিল অনর্থক খাটানোর ব্যাপার নয় বরং পারিশ্রমিক প্রদানের শর্তেই বৃদ্ধের মাথায় বোঝা দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধ লোকটি নরম ভাষায় বলল যে, পেটের ক্ষুধা নিবারনের জন্য তিনি এতটুকু কাজ পাওয়াকে গণীমত বলে তুলে নিয়েছেন। কাজেই সিপাহী লোকটিকে ভালমন্দ কিছু বলে তাকে পারিশ্রমিক লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। বিষয় বৃত্তান্ত অবগত হয়ে সায়্যিদ সাহেব সিপাহী থেকে পারিশ্রমিক নিয়ে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে তাকে বিদায় করে দেন। এদিকে তার পরিবর্তে নিজে সিপাহীর কলসটি মাথায় তুলে এটি যেখানে পৌঁছাবার কথা সেখান পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন[২৩২]।

আল্লাহপাক তাঁকে শারীরিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার নিয়ামত দান করেছিলেন। তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। প্রত্যহ সকাল বেলা অন্তত একশ বুকডন লাগানোর নিয়ম ছিল। শরীর চর্চায় তিনি যে মুগদরটি ব্যবহার করতেন সেটির ওজন ছিল একমন বাইশ সের। কিন্তু এ সকল অনুশীলনের উদ্দেশ্য কেবল শরীরকে শক্তিশালী করাই ছিল না বরং যেন এ শরীর দ্বারা যথাসাধ্য অধিক পরিমাণে মানুষের সেবা করা যায় এটি ছিল তার লক্ষ্য।

তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে নওয়াব আমীর আলীর সেনা বাহিনীতে যোগদান করেন। এখানে তার অন্তর্নিহিত সৈনিকতার যোগ্যতা আরও উন্নতি লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু এই সৈনিক জীবনেও তার মধ্যে খোদাভীতি ইবাদত বন্দেগী ইত্যাদির কোথাও কোন ত্রুটি আসতে পারে নি। তিনি কখনও অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট দিতেন না। নিরীহ মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন কিংবা তাদের ক্ষেত খামারের ক্ষতি সাধন কিংবা নিজেদের ঘোড়াগুলো মানুষের ক্ষেতে ছেড়ে দেওয়া তৎকালে সৈনিক শ্রেণীর সাধারণ নিয়ম বলে মনে করা হত। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ কাজ মোটেও বৈধ বিবেচিত নয়। অথচ হযরত সায়্যিদ সাহেবের নিয়ম ছিল যে, তিনি নিজের ঘোড়াটি অন্যান্য সৈনিকদের ঘোড়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখতেন। নিজ

ঘোড়ার আহার বিহার ইত্যাদিতেও শরীয়তের সীমারেখা পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখে চলতেন।

হযরতের কারামত ছিল যে, ঘোড়াটিও এভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে, এটি অনাহার থাকত কিন্তু অন্যের ক্ষেতে মুখ বাড়াতো না[২৩৩]।

সমাজের যারা দরিদ্র শ্রেণী তাদের নানাবিধ সেবা এবং তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দানের ধারাবাহিকতা এতটুকু বড় আকার ধারন করে ছিল যে, তিনি কোন অদৃশ্য ভান্ডার লাভ করেছেন বলে মানুষের মধ্যে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল।

সৈনিকতার চাকুরীকাল শেষ হল। তিনি চলে গেলেন দিল্লীতে। সেখানে হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (রহ)-এর দরবারের পক্ষ থেকে তাকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হল। তখন থেকে তাঁকে একদিকে যেমন রাজনৈতিক বিষয়ের নেতৃত্ব দিতে হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে তরীকতের একজন শায়খ হিসাবেও দায়িত্ব পালন করতে হয়। তবে এতটুকু বাধ্য বাধকতা আরোপিত ছিল যে, তিনি নিজের কাজকর্ম স্বাধীনভাবে সম্পাদন করবেন তবে প্রয়োজনের মূহুর্তে অন্য সাথীদের সাথে মিলে কাঠ চিরবেন, ঘাষ কাটবেন এবং বোঝা মাথায় বইবেন[২৩৪]।

রায়বেরেলীকে প্রধান কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করা হল। তখন বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার কর্মীদল রায়বেরেলী গিয়ে একত্রিত হতে থাকে। সাথীদের অবস্থানের জন্য বিশাল আয়তনে ব্যারাক বানানোর প্রয়োজন দেখা দিল। সেমতে প্রাণোৎসর্গী কর্মীদল নিজ হাতে কাঁচা মাটির দেওয়াল নির্মাণ শুরু করে। হযরত সায়্যিদ আহমদ তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। তার এ অবস্থা থেকে জগৎ সেদিন সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ নতুনভাবে প্রত্যক্ষ করেছিল[২৩৫]।

শায়খুল ইসলাম মাওলানা সায়্যিদ আবদুল হাই (রহ)

হযরত মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের পিতার নাম মাওলানা হিবাতুল্লাহ ও পিতামহের নাম হযরত মাওলানা নূরুল্লাহ সাহেব। তাঁর পিতামহ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের বিশিষ্ট শাগরিদ ও তাঁর পার্টির একজন শক্তিশালী সদস্য ছিলেন। মূল বাড়ি মীরাঠ জেলার অন্তর্গত বুড্ডানা গ্রামে[২৩৬]।

মাওলানা আবদুল হাই সাহেব হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর প্রসিদ্ধ সাগরিদের অন্যতম[২৩৭]। শাহ আবদুল আযীয তাঁকে অন্যতম বিগদ্ধ আলিম ও

শায়খুল ইসলাম উপাধিতে উল্লেখ করেছেন। স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন একাগ্রচিত্ত, নিষ্ঠাবান, সদাচারী ও মিতভাষী পুরুষ। কথা খুব কম বলতেন কিন্তু বক্তৃতা আরম্ভ করলে মনে হত তিনি কথার জাদুকর। যার কণ্ঠের কয়েকটি বাক্য শুনামাত্রই শ্রোতাদের চিন্তা জগতে সূচিত হত আমুল পরিবর্তন।

হযরত সায়্যিদ সাহেবের হাতে মুরীদ হওয়ার পূর্বেও তিনি অগাধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, উন্নত চরিত্র মাধুরী, গভীর উপলব্ধি, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অসম বাগ্মীতার কারণে কেবল রাজধানী দিল্লী অঞ্চলেই নয় বরং গোটা উত্তর ভারতের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সকলেই তাঁকে সম্মানের চোখে দেখত। কিন্তু সায়্যিদ সাহেবের হাতে মুরীদ হওয়ার পর নিজের সমুদয় যোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি তাঁরই ইচ্ছার ওপর উৎসর্গীত করে দেন। এতকাল যিনি ছোট বড় সকলের কাছে ছিলেন পরম সেবায়িত এখন তিনি নিজেই সায়্যিদ সাহেবের জুতা বহন করে চললেন। তাঁর ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে কিংবা পালকীর পেছনে পেছনে খালি পায়ে হাটতে আরম্ভ করলেন। এতদসত্ত্বেও স্পষ্টভাষিতা ও অকুণ্ঠ চিত্তে সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তার নীতির কোন পরিবর্তন করেন নি।

সত্য প্রকাশে তার এ নীতি এতখানি দৃঢ় ও শক্তিশালী ছিল যে, কারুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার কারণে কিংবা কারুর প্রতি আতংকিত হয়ে কখনও তা দমিত হওয়ার মত ছিল না। তাই সায়্যিদ সাহেবের প্রতি তার অগাধ ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল অথচ কখনো তুচ্ছ কোন ক্রুটি চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই আত্মনিবেদিত মুরীদ আপন শায়খকে সচেতন করে দিচ্ছে।

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ)-এর সংস্কারমূলক কার্যক্রম সমূহের মধ্যে বিধবা বিবাহের রীতি পুনরুজ্জীবিত করাও ছিল একটি। সেমতে তাকেও বিয়ে করতে হয়েছিল। এ সময় প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর দুদিন ফজরের নামাযে 'তাকবীরে উলা' ছুটে যায়। মাওলানা আবদুল হাই-এর ন্যায় একান্ত পীরভক্ত মুরীদ তা মেনে নিলেন না। দ্বিতীয় দিবসেই তিনি আপন মুরশিদকে সচেতন করে দেন। আর এই মুরশিদ নিজেও অপরিসীম সত্য পুজারী। তিনি বিনাবাক্যে তাৎক্ষণিক নিজের ক্রুটির কথা স্বীকার করে নেন। বলা বাহুল্য ইসলামী শরীয়তে ইদ্দত অতিক্রান্তের পর বিধবাদের বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। পরিস্থিতির বিচার

অনুসারে অনেক ক্ষেত্রে বিধবাদের বিবাহকে ওয়াজিব এব ফরজ হিসাবেও ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু তৎকালের ধ্যান-ধারণা এ স্বচ্ছ অনুভূতি থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। পারিপার্শ্বিক ভিন্ন ধর্মের প্রভাবে ইসলামের এহেন স্বচ্ছ বিধান জাহেলী চিন্তা-ভাবনার কাছে পরাজিত হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা বিধবাদের বিবাহ করাকে নিজের জন্য লজ্জাস্কর ভাবতে লাগল। বিধবাদের জীবনেও নেমে আসল নিরাপত্তাহীন অস্বাভাবিক জীবনের কাল ছায়া। ঘটনাক্রমে হযরত সায়্যিদ সাহেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাওলানা মুাম্মদ ইসহাক সাহেব ইন্তেকাল করেন। তখন হযরত শহীদের সংস্কার আন্দোলনের এই ধারা আপন পরিবারের পরিমণ্ডলেই বাস্তবায়নের প্রয়োজন দেখা দিল। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ প্রাথমিক দিকে বেশ দ্বিধাগ্রস্থ হন। হযরত মাওলানা আবদুল হাই এখানেও তম্বিহ করে বলেছিলেন چوں کفر از کعبه بر خنیرد کجا ماند مسلمانی অর্থাৎ কাবাগৃহ থেকেই যদি কুফরী প্রকাশ পায় তাহলে মুসলমানী আর কোথায় অবশিষ্ট থাকবে। অবশেষে তিনি এ বিবাহে সম্মত হন।

বস্তুত সত্যের অন্বেষণ ও অকুণ্ঠ চিত্তে সত্যের অবলম্বন এই সুনীতিই পীর ও মুরীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছিল। তাদের প্রত্যেকে এ নীতির আলোকেই নিজেদের প্রতিটি কথা ও প্রতিটি কাজকে বিচার করত। একবার হযরত সায়্যিদ সাহেব মাওলানা আবদুল হাইকে বলেছিলেন, মাওলানা ! যদি আমার কোন কিছু খেলাফে শরীয়ত বলে দেখেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে তম্বী করে দিবেন। উত্তরে মাওলানা বললেন, হযরত! আপনি শরীয়তের বরখেলাফ কোন কাজ করলে আবদুল হাই আপনার সংস্পর্শে থাকবেই কেন ?

ন্যায়-পরায়ণতা ও সত্যপ্রিয়তার এই প্রেরণা মাওলানা আবদুল হাই-এর মত এক বিদ্যোতসাহী ব্যক্তিত্বকে দরসগাহ থেকে সরিয়ে জিহাদী কাফেলার ক্যাম্পে এনে দিয়েছিল। এই প্রেরণা তাকে শিক্ষকতার মসনদে উপবেশন বাদ দিয়ে মুক্ত ময়দানে বিচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। হাদীস শরীফে প্রিয়নবী (সা) এই অনুভূতিকেই الحب في الله ، الحب لله। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ভালবাসা, আল্লাহর কাজে ভালবাসা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই অনুভূতির মনীষীগণই আখিরাতে বেহেশতের অতি উচ্চাসন লাভ করবেন। সেদিন তাদের সম্মান ও সমাদরের কুরসীগুলোকে মেশক ও সুগন্ধির উচ্চটিলার ওপর সজ্জিত করা হবে।

হযরত সায়্যিদ সাহেবের গোটা আন্দোলনে এবং তার সকল কার্যক্রমে যিনি 'মুশীরে আলা' তথা ঘনিষ্ঠ সহযোগীর ভূমিকা পালন করেন তিনি ছিলেন শায়খুল ইসলাম মাওলানা আবদুল হাই (রহ)। আন্দোলনে তিনি ছিলেন সায়্যিদ সাহেবের দক্ষিণ হস্ত। সীমান্ত অঞ্চলে যখন মুজাহিদদের স্বাধীন সরকার গঠিত হল তখন তিনি ছিলেন সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ বিচারক। কিন্তু প্রতিপক্ষের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে হঠাৎ তিনি মারাত্মক উদরাময় ও আউসারগ্রস্থ হন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহ......।

হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (রহ)

দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজের জীবনকে হাসিমুখে উৎসর্গকারী এক মর্দে মুজাহিদের নাম মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ যাকে ওয়ালী উল্লাহী দর্শনের জীবন্ত তাফসীর বলে জ্ঞান করা হত। যার সীমাহীন ত্যাগ ও তিতিক্ষা খবীহুল্লাহ সায়্যিদুনা ইসমাঈল (আঃ)-এর আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করে দিয়েছিল। উম্মতের কল্যাণ চিন্তা ও দরদ যার অন্তরাত্মার সামান্য অংশও অবশিষ্ট রাখে নি। তাদের ভালবাসায় যার অন্তর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। যার ইলম ছিল আমলের সমকক্ষ আর আমল ছিল সীমাহীন ইলমের স্বচ্ছ মুকুর। যিনি চিন্তাধারার স্বাধীনতা ও আযাদীর সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ সমর্থক, (প্রতারণামূক্ত) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতাকাবাহী, রাজতান্ত্রিকতার একান্ত দুশমন ও বাদশা পূজার জমদূত। যিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ওপর বিরক্ত বরং ক্ষুব্ধ আর দাসত্বের নাপাক চিন্তা থেকেও সম্পূর্ণ অনভ্যস্থ। যার জীবন নিরলস সাধনা লিপ্ত এক জীবন। যে জীবনের প্রভাত হয়েছে জিহাদের ময়দানে আর এই রণক্ষেত্রেই সেই জীবনের রক্তিম সূর্য হয়েছিল অস্তমিত।

পিতার নাম মাওলানা শাহ আবদুল গণী আর পিতামহ ছিলেন জগৎ বিখ্যাত মনীষী হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ)। এই শাহ ওয়ালী উল্লারই আন্দোলনকে বহন করে তিনি জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর শেষ অবধি এ পথেই শাহাদাত বরণ করে অমরত্বের জীবন লাভ করেন।

ইলম ও আমলের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত একটি পরিবারে তাঁর জন্ম। এই পরিবেশেই তিনি লালিত-পালিত হন। শৈশবেই পিতা ইন্তেকাল করলে অদৃষ্ট তার লালনের জন্য হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-কে মনোনীত করে।

অদৃষ্টের অর্পিত তত্ত্বাবধান পেয়ে ভাতষ্পুত্র যেমন পিতৃব্যের প্রতি পরম কৃতজ্ঞ তেমনি ভ্রাতুষ্পুত্রের যোগ্যতা দেখে পিতৃব্য পরম গর্বিত। পিতৃব্যের অব্যক্ত কণ্ঠ থেকে তখন বার বার ধ্বনিত হয়েছিল ঃ

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق

ইলমের দোলনায় লালিত হয়েছিলেন বিধায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ঠুনকো মনমানসিকতা ও ভীতু হওয়ার কথা ছিল। অথচ তিনি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বভাবের ঠুনকোপনাকে তিনি চরম ঘৃণা করতেন। তার প্রকৃতির মধ্যে ছিল জিহাদের হৃদয় ভর্তি আগ্রহ। অভিমান ও ভঙ্গুরতার স্থলে তিনি নিজকে কষ্ট সহিষ্ণু এবং বিপরীত পরিস্থিতির ওপর চলতে এতখানি অভ্যস্থ করে নেন যে, অনুভূতির মধ্যে শীত-গ্রীষ্মের ব্যবধানটুকুও অবশিষ্ট রাখেন নি।

নিজের পঠিত শাস্ত্রগুলোর মধ্যে মানাতক, ফালসাফা অংক ও জ্যামিতিতে মেযন উন্নত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তেমনি হাদীস ও ফিকহের অধ্যায়নেও তার জুড়ি ছিল না। একই নিয়মে সৈনিকতা ও যুদ্ধ বিদ্যায় উস্তাদসম যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ)-এর চরিত্রে বহুমুখী যোগ্যতা ও কৃতিত্বের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন উন্নত যোগ্যতাসম্পন্ন মুফাসসির, মুহাককিক, ফকীহ ও মুহাদ্দিস। অনুরূপে একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ও তীর চালকও বটে। সফল নেতা ও সতর্ক চিন্তানায়ক হিসাবেও তিনি বিখ্যাত। অভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধানে তিনি ছিলেন পারদর্শী এবং যুদ্ধের ময়দানের একজন শক্তিশালী জেনারেল ও ফিল্ড মার্শাল।

প্রাচীন খান্দানের শিশুদের যারা আজও বেঁচে আছেন তারা সাক্ষী যে, ঠিক খাড়া দুপুরে দিল্লী জামে মসজিদের পাথর ডালা চত্বরে নগ্নপদে হেটে হেটে তিনি অগ্নিবৎ উত্তপ্ততা সহ্য করাকে কেমনভাবে রপ্ত করে নিয়েছিলেন। অনুরূপে যমুনা নদীর তরঙ্গগুলোও সাক্ষ্য দিবে যে, এই মুজাহিদ তার অনুশীলন পর্বে দিল্লীর যিনাত মসজিদ থেকে কিভাবে তরঙ্গের সাথে লড়াই করে আগ্রার তাজমহল পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন। তারপর আবার ঢেউয়ের সাথে ভেসে ভেসে তাজমহল থেকে যিনাত মসজিদ পর্যন্ত ফিরে আসতেন। শীত-গ্রীষ্ম তার কাছে ছিল সমান। মে জুন মাসে চাদর কম্বল জড়িয়ে থাকতে যেমন কষ্ট হত না তেমনি ডিসেম্বর ও

জানুয়ারিতে পাতলা কাপড়ে অবস্থানেও কোন আপত্তি হত না। হযরতের জীবনের একান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সেবা করা। মানব সেবার পরিসরকে তিনি সুবিশাল আয়তনে দেখতেন। এই পরিসরের মধ্যে ধনী দরিদ্র সকলকে অন্তর্ভূক্ত মনে করতেন। শরীফ খান্দানের দারিদ্র পরিতদের যেভাবে আর্থিক সেবা করতেন তেমনি শরাবের আড্ডায় নৈতিকতা বিবর্জিত শ্রেণীকেও সেবা করে সরল পথে আনয়নের চেষ্টা করতেন। তাদের নৈতিক অবক্ষয় তাকে দারুনভাবে কষ্ট দিত। আর এই দরদের কারণেই অবক্ষয়গ্রস্থ লোকদিগকে সুষ্ঠু জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনতে সম্ভাব্য সকল পন্থা তিনি অবলম্বন করতেন। কখনও কখনও এমনও দেখা গিয়েছে যে, তিনি নিজের বেশভূষা পরিবর্তন করে সাধারণ পাবলিকের ন্যায় তাদের আসর পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। তারপর তাদের কানে নিজের কথাগুলো শুনিয়ে এবং মনের মধ্যে একটা অদ্ভূত পরিবর্তন ঘটিয়ে আবার এসে যেতেন[২৩৮]।

মাওলানার উপরোক্ত মেহনতের কারণে যে সকল মানুষ মূল থেকে ধ্বংস হয়ে যায় নি তাদের হাজার হাজার সংখ্যক পুনরায় সরল পথের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু বক্র মানসিকতায় যারা সমূলে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তারা মানব সেবার এহেন মহৎ উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ায়।

শত্রু দুশমনদের ভয়ে তখন বন্ধুদের কতিপয় মাওলানাকে তার সংস্কারমূলক কর্মসূচি স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেন[২৩৯]। কিন্তু মানবতার কল্যাণকামিতায় বিদগ্ধ এই মহৎপ্রাণ কিছুতেই বিরত হলেন না[২৪০]। তিনি বললেন ঃ ان کی رسوائی ہوئی تو کیا میری رسوائی نیہں (অর্থাৎ তারা নিজেদের জন্য অপমানবোধ করুক তাতে কি আছে আমি তো আমার জন্য কোন অপমানবোধ করছি না।)।

হযরত শাহ সাহেবের যখন যৌবনকাল তখন দিল্লীর ওপর মৃত্যুর ঘনঘটা চলছিল। তৎকালে সেখানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'রেসিডেন্সী' রীতিমত আসন পেতে বসে। আর মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ঐক্যে দেখা দেয় নানান বিভক্তি। দিল্লী নগরের যেখানে হাজার বছর থেকে চিন্তাধারার স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা এবং বহুজাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের অপূর্ব নিদর্শন চলে আসছিল সেখানে

ইংরেজ ভাইসরয়ের এজেন্ট প্রতিষ্ঠা লাভের পর পরই শুরু হয় ধর্মের নামে নানান কলহ ও ঝগড়া বিবাদ। হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের ফতওয়া বিভাগ থেকে নাস্তিকতার ফতওয়া প্রচার করা হয়েছিল। কারণ ছিল এই যে, তিনি আপন সমাজ থেকে সে সকল রুসুম ও রেওয়াজ তথা 'সামাজিক ক্যানসার' রোধ করার চেষ্টারত ছিলেন যেগুলো যে কোন সমাজকে অলীক কল্পনা পুজারী বানিয়ে দেয়, যেগুলো মানুষকে দুর্বলচিত্ত কাপুরুষ ও হীনমন্য হতে বাধ্য করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইউরোপিয়ান মুফতীর ফতওয়া সামাজিকভাবে কোন স্বীকৃতি পায় নি। অবশেষে সাম্রাজ্যবাদ ব্যাপক নিরাপত্তার[২৪১] দোহাই দিয়ে তার বাক-স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। অগত্যা এই সত্যসেবী স্বয়ং তাকেই লক্ষ্য করে কথা আরম্ভ করে। ফলাফল হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদের পক্ষে আসল। বৃটিশ রেসিডেন্ট কোন সদুত্তর করতে পারে নি বিধায় অগত্যা তাঁকে নিজের নির্দেশ তুলে নিতে হল[২৪২]।

সরলতা ও সরল জীবন

বলা-বাহুল্য উম্মতের কল্যাণ চিন্তা ও দরদে যার তনুমন ভরট হয়ে থাকে এমন ব্যক্তি নিজের বাহ্য রঙঢঙের দিকে কখনও খেয়াল করতে পারে না। তার মন-মস্তিষ্ক এ সকল লৌকিকতা আভিজাত্য ও আড়ম্বরতার চিন্তা করা থেকে সম্পূর্ণ অনভ্যস্থ থাকে। সেমতে হযরত শাহ ইসমাঈল (রহ)-কে আমরা দেখেছি নিম্নরূপ ঃ

'হযরত শাহ সাহেবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, রচনা ও বক্তৃতা, উন্নত পর্যায়ের বাগ্মীতা ও উপস্থিত জবাব প্রদান যোগ্যতার কথা দূর দূর পর্যন্ত চর্চা হত। দূর থেকে তার এ সকল গুণের কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই মনে হত তিনি নিশ্চয় পূর্ণ আড়ম্বরতা ও অতিশয় জাঁকজমকসহ কোন জোব্বা পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তিত্ব হবেন। কিন্তু এ সকল ধারণার পর লোকেরা যখন তাকে নগ্নপদে হযরত সায়্যিদ সাহেবের রেকাব হাতে নিয়ে ছুটতে দেখত কিংবা ধুলা বালিতে লুটোপুটি অবস্থায় একান্ত সাধারণ পোষাকে দেখত কিংবা ঘোড়ার শরীর থেকে ধুলি বালি ঝাড়তে দেখত তখন তাদের অবাক হওয়ার কোন সীমা থাকত না। দেওবন্দের একজন উচ্চপ্রদস্থ ও সুপ্রসিদ্ধ আলিম হযরত মাওলানা যুলফিকার আলী সাহেব বলেন[২৪৩] ঃ

'হযরত সায়্যিদ সাহেব দেওবন্দ শহরের উদ্দেশ্যে তাশরীফ আনছেন এ সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বড় বড় লোকেরা তার এস্তেকবাল করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। শহরের বাইরে জনৈক বুযুর্গের একটি পুরাতন মাযার ছিল। লোকজন অগ্রসর হয়ে সে পর্যন্ত পৌঁছলে তারা সায়্যিদ সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ করে। তখন দেখা গেল যে, সায়্যিদ সাহেব একটি টাঙ্গা গাড়িতে আছেন। আর দু'দিকে দু'জন ঘোড়ার রশি হাতে নিয়ে হেঁটে চলছেন। লোকজন অগ্রসর হয়ে হযরতের সঙ্গে মোলাকাত করল কিন্তু পার্শ্বস্থ দু'জনের কাউকে তারা চেনে নি। আর মোলাকাতে মিলিত হওয়ার প্রয়োজনও বোধ করে নি। ইত্যবসরে সায়্যিদ সাহেব বললেন, তাদের সঙ্গেও মোলাকাত করুন। ইনি মাওলানা শাহ ইসমাঈল আর উনি মাওলানা শাহ আবদুল হাই[২৪৪]।

লক্ষ্ণৌর বিদ্যোৎসাহী আলিমদের মধ্যে হযরত শাহ ইসমাঈলের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, উপস্থিত জবাবদান ও সুক্ষ্ণ উপলব্ধির খুব চর্চা হয়েছিল। এ সকল কথা শুনে তারা শাহ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। কিন্তু কাফেলায় পৌঁছে দেখতেন সৈনিকের পোষাকে প্যারেডরত এক মুজাহিদ, কখনও এমনও ঘটেছে যে, তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে যে, তিনি আস্তাবল খানায় কর্মরত আছেন কিংবা কেউ ইশারা করে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, ঐ দূরে ঘোড়ার শরীর থেকে ধুলাবালি পরিষ্কারের কাজে যিনি আছেন তিনিই মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল।

কাফেলা কলিকাতা গিয়ে পৌঁছলে এখানে শায়খ মুহাম্মদ আমীন কাফেলার আতিথ্য করেন। শায়খ আমীন প্রথমতঃ হযরত সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে তার নৌকায় গিয়ে মোলাকাত করেন। অতঃপর অন্যদের মধ্যে হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদের সঙ্গে সর্বাগ্রে মোলাকাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। মাওলানা অন্য নৌকায় ছিলেন বলে তাঁকে ডেকে পাঠানো হল। এ সময় জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সুপ্রসিদ্ধ পরিবারের এ সদস্য এতই সাধারণ অবস্থায় এসে দাঁড়ালেন যে, শায়খ আমীন অবাক হয়ে যান। এ অবস্থা তাকে এতটুকু প্রভাবিত করেছিল যে; চোখ থেকে গড়িয়ে অশ্রু ঝরছিল। তিনি অবাক হয়ে চিন্তা করেছিলেন যে, ইনিই কি হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর পৌত্র আর শাহ আবদুল গণীর কলিজার টুকরা ও শাহ আবদুল আযীযের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ? ইনিই কি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা জগতের মহাসম্রাট অথচ এতখানি সরল পোষাকের অনাড়ম্বর ও পরিশ্রমী ?

রাজতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধাচরণ ও রাজতান্ত্রিকাতর ওপর ঘৃণাবোধ ঃ

হযরত শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর জীবন চরিত্রে বাদশা পুজার বিরুদ্ধাচরণ একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসাবে গণ্য। যে কথাটি হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইশারা ইঙ্গীতে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, যেটিকে শাহ আবদুল আযীয তার অমুদ্রিত তাফসীর গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করে দিয়েছেন সে কথাগুলো শাহ ইসমাঈল কোন জড়তা ও অস্পষ্টতা অবশিষ্ট না রেখে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন এবং কথার প্রতটি বাহুর পূর্ণ বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন। তার রচিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'মানসবে ইমামত' গ্রন্থ আজো মানুষের হাতে উপস্থিত আছে। ইমামত ও খিলাফতের মর্যাদা কতখানি উন্নত তা এ গ্রন্থ পাঠে সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রচলিত মুসলিম বাদশাদের বাদশাহী যাকে আল্লাহর ছায়া এবং আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহ বলে সাধারণভাবে কল্পনা করা হয় সে বাদশাহীকে জবরদস্তি ও স্বৈরতন্ত্রের রাজত্ব বরং যুগের সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইতিপূর্বে এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বর্ণনায় ''মানসবে ইমামত' গ্রন্থের কতিপয় উদ্বৃতিও পেশ করা হয়েছে। বর্তমানে সে গ্রন্থ থেকে আরও একটি উদ্বৃতি লক্ষ্য করুন। বাদশা ও বাদশাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তিনি কতখানি কঠিন মনোভাব পোষণ করতেন নিম্নোক্ত উদ্বৃতি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

তিনি বলেন ঃ

استصال او عين انتظام است وابلاك او عين اسلام
واطاعت ہر متسلط از احکام سراعیه نیت واتقیاد ر
متجبر از اغوامر دينسه نه،

অর্থাৎ তাদের পূর্ণ মূলৎপাটন শৃঙ্খলা কায়েমের নামান্তর তাদের বিলুপ্তি সাধন ইসলামের দাবী। রাজ্য ক্ষমতার অধিকারকারী প্রত্যেকের অনুগত্য করা শরীয়তে বিধান নয় আর এ ধরনের যে কোন স্বৈরশাসকের সামনে আত্ম-সমর্পন করতে হবে বলেও ইসলামের হুকুম নেই। (মানসবে ইমামত, পৃঃ নং-৯৮)।

এখানে গভীরভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ইমামত ও খিলাফতের অতি উন্নত মর্যাদার তুলনায় যিনি মুসলিম বাদশাদের রাজত্বকে এতখানি কঠিন দৃষ্টিতে দেখতেন তার

দৃষ্টিতে অমুসলিম ইংরেজদের রাজত্ব কতখানি কঠিন দৃষ্টির ছিল ? ইংরেজ রাজত্ব সম্পর্কে তার অভিমত কত রুক্ষ হবে উপরোক্ত মন্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর ওফাত

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের কাফেলা হজ্জ সমাপন করে প্রত্যাবর্তন করেছে কিন্তু এখনও দিল্লী পর্যন্ত এসে পৌঁছেনি। ইত্যবসরে আন্দোলনের ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাবিধুর ঘটনা ঘটে। এ মুহূর্তে আন্দোলনের সেই মুরুব্বী ও বর্ষীয়ান নেতা যার দীর্ঘ তেষট্টি বছরকাল দেশ ও জাতির সেবা তথা আন্দোলনকে লালনের কাজে অতিবাহিত হয়েছিল। যার অঙ্গুলি নির্দেশে হযরত সায়্যিদ সাহেবের খোদায়ী ফৌজ প্রাচ্যসীমা থেকে পাশ্চাত্য সীমা পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছিল তার ওফাত ঘটে। হিজরী ১২৩৯ সালের ৭ই শাওয়াল মোতাবেক ১৮২৪ ইং ৬ই মে তিনি এ নশ্বর ধরাধাম থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। অতর্কিতভাবে উপস্থিত এ মহাবিপদের বিস্তারিত বিবরণ এখানে উল্লেখ করার সুযোগ নেই আর সে ইতিহাসের এখানে উল্লেখ তেমন দরকারও হয় না। তবে ধারাবহিক আলোচনা রক্ষার প্রয়োজনে আন্দোলন সম্পর্কীয় কয়েকটি জরুরী কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক।

এক. হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী 'সর্বাত্মক বিপ্লব' সাধনের যে বীজ বপন করেছিলেন শাহ আবদুল আযীয সাহেবের শক্তিশালী তত্ত্বাবধানের ফলে সে বীজ অংকুরিত হয়ে রীতিমত শিরদাঁড়া বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিণত হয়। কারণ এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য বুনিয়াদী কর্মসূচি হিসাবে যে সকল কাজের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল হযরত শাহ আবদুল আযীযের আমলে সেগুলো ব্যাপক পরিসরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে ছিল মানুষকে ইলমে দ্বীনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান এবং বিশেষ ধরনের নৈতিক ট্রেনিং-এর মাধ্যমে সৈনিকরূপে গড়ে তোলা। বলা-বাহুল্য শাহ আবদুল আযীয দেহলবীর সময়ে এ কর্মসূচি এতখানি ব্যাপকতা অর্জন করেছিল যে, গোটা ভারত উপমহাদেশে এমন কোন উল্লেখযোগ্য আলিম অবশিষ্ট ছিল না যিনি সরাসরি কিংবা কোন মাধ্যম হয়ে শাহ সাহেবের শিষ্যত্ব ও ফয়েজ লাভ করা থেকে বিরত ছিলেন।

দুই. ফৌজী আয়োজনের ব্যাপারে ততদিনে হযরত সায়্যিদ সাহেবের নেতৃত্বে প্রায় আটশত এমন মুজাহিদ তথা মুক্তিযোদ্ধা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে যাদের চিন্তা-চেতনা ও আগ্রহ উদ্দীপনা ওয়ালী উল্লাহী চিন্তা-দর্শনের আলোকে সুগঠিত। যারা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে একটি বিপ্লব ঘটানোর জন্য যথোপযুক্ত।

তিন. কাফেলার পুনঃপুনঃ সফর ও অভিযাত্রার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের মন-মানসিকতায় বিপ্লবের এমন এক প্রেরণার সঞ্চার হয়ে গিয়েছিল যা কোন মূল্যে দমিত হওয়ার মত নয়। এমনকি ১৮৫৭ সালের গণহত্যা ও রক্ত বন্যাও গণমানুষের সেই প্রেরণাকে স্তব্ধ করতে সক্ষম হয় নি।

চার. হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর পবিত্র জীবনধারা ও তার ইখলাস সমৃদ্ধ কাজকর্ম সাধারণ মানুষের মধ্যে এতখানি ভালবাসার জন্ম দিয়েছিল যে, সাধারণতঃ জানাযার নামায একবারই পড়া হয়; কিন্তু এ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্রাটের জানাযা পড়া হয়েছিল ৫৫ বার[২৪৬]।

পাঁচ. অর্থনীতির ব্যাপারে হযরত শাহ ওয়ালীর বুনিয়াদী নীতি ছিল এই যে, আর্থিক অবস্থা সকলের মধ্যে সমান থাকা চাই। হযরত শাহ আবদুল আযীয এ নীতির এত দৃঢ় অনুসারী ছিলেন যে, নিজে সারা জীবন সুতার মোটা কাপড় ব্যবহার করে গিয়েছেন। তারপর ইন্তেকালের মূহুর্তে শেষ অসিয়তের মধ্যেও বলে যান যে, জীবনভর তিনি যে মানের কাপড় ব্যবহার করে আসছেন সে মানের কাপড় দ্বারাই যেন তার কাফন দেয়া হয়[২৪৭]।

ছয়. ইন্তেকালের সময় তিনি জোর তাগিদ করে বলে গিয়েছিলেন যে, তার ইন্তেকালের সংবাদ যেন সম্রাটকে না শোনানো হয়। কারণ সম্রাট তার জানাযায় উপস্থিত থাকুক তিনি এ কথা কামনা করতেন না[২৪৮]। এ অসিয়ত ও জোর তাগিদের কারণ এটি নয় যে, সম্রাটের ওপর তার কোন ক্ষোভ ছিল। বস্তুতঃ সম্রাট তাঁকে যথেষ্ট ইজ্জত ও সম্মান করতেন[২৪৯] আর তিনিও সম্রাটের সঙ্গে যথেষ্ট শালীনতার সঙ্গে মিলিত হতেন। কিন্তু একজন আল্লাহওয়ালা মুমিন হিসাবে দুনিয়া থেকে বিদায়ের মূহুর্তে রাজকীয় জাঁকজমক তার পছন্দীয় ছিল না। বিশেষতঃ জীবনভর যিনি রাজতান্ত্রিকতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সর্বাত্মক বিপ্লব কায়েমে সাধনারত ছিলেন বিদায় বেলা তিনি কিভাবে সেই রাজকীয় জাঁকজমক

মেনে নিতে পারেন? অন্তিমকালের সেই মুহূর্তটুকুকেও তিনি নিজ আন্দোলনের শেষ উদ্যোগ বানিয়ে যান।

স্থলাভিষিক্ত নিযুক্তি ও দায়িত্ব বণ্টন

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর শেষ জীবনে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক এ দলের নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন তখন মাদরাসা পরিচালনা তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মী গঠন এবং কেন্দ্রীয় যাবতীয় ব্যবস্থাপনার কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে থাকেন। একজন সুযোগ্য স্থলাভিষিক্তের ওপর যে রকম আস্থা করা হয় হযরত শাহ সাহেব তার ওপর সে রকমের আস্থা ও নির্ভরতা রেখে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন[২৫০]।

এ কারণেই হযরত শাহ আবদুল আযীয যখন ইন্তেকাল করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই গোটা আন্দোলনের জিম্মাদার মনোনীত হন হযরত শাহ ইসহাক দেহলবী[২৫১]।

অন্যদিকে অপর যে দলটির ওপর ফৌজী আয়োজন ও বহির্বিভাগীয় দায়িত্ব অর্পিত ছিল সেটি হযরত সায়্যিদ আহমদ সাহেবের নেতৃত্বে যথারীতি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য অব্যাহত রাখে। বরং বলা চলে যে, তাদের মহাপরিচালকের ওফাতের পর পূর্বের তুলনায় আরও অধিক সক্রিয় হয়ে উঠে।

সার-সংক্ষেপ ও ফলাফল

উপরোক্ত কয়েক পৃষ্ঠার আলোচনা আমরা হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হযরত শাহ আবদুল আযীয, হযরত শাহ ইসমাঈল, তাদের সাথীবৃন্দ ও সাগরিদদের রচিত গ্রন্থাবলির আলোকে সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছি। এ আলোচনার দ্বারা তদানিন্তন গোটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিত্র, অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি ও দলের চিন্তা-চেতনা ও তাদের শ্রম সাধনার ইতিহাসও মোটামুটি ফুটে উঠেছে। পাঠক এ দীর্ঘ ইতিহাস পাঠে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছেন। বর্তমানে পূর্ণ আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিম্নোক্ত কয়েকটি বাক্যে লক্ষ্যণীয়। কারণ হযরত শাহ আবদুল আযীযের ওফাতের ওপর এখানে আলোচ্য ইতিহাসের প্রথমার্ধ শেষ হবে। তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসবে এ সকল আয়োজনকে কর্মে রূপদানের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কীয় আলোচনা।

সার-সংক্ষিপ্ত কথাগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক. আলিমদের এ সকল শ্রম সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা মোঘল রাজত্বকে টিকিয়ে রাখা বা সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ছিল না, অনুরূপে এ উদ্দেশ্যেও ছিল না যে, মুসলমানের নামে দেশে পুঁজিবাদ কায়েম করবে। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল অতিশয় উন্নত ও মহৎ। শুধু এতটুকু বলা যায় যে, যদি তাদের সে আন্দোলন জয়লাভ করত তাহলে জগতের মানুষ কাল মার্কস, এঙ্গেলস কিংবা লেনিনের কোন প্রয়োজনবোধ করত না।

দুই. তাদের সে আন্দোলন সফল হলে দেখা যেত যে, বর্তমান কালের কমিউনিজম মানুষের মধ্যে আর্থিক যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় তা আরও অধিকতর সুন্দর পদ্ধতি এবং অধিকতর ফলপ্রসু অবস্থায় বাস্তবায়ন লাভ করেছে। তবে ব্যতিক্রম এতটুকু হত যে, মানুষের সেই সমাজ তখন নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে অপরিচিত থাকত না। সেখানে উন্নত চরিত্র গুণ ও আধ্যাত্মিকতার সুন্দর মিশ্রণে এমন এক চমৎকার সমাজ গড়ে উঠত যদ্বারা গোটা দেশ বাস্তবিকভাবেই সুখ-শান্তি, আমান ও নিরাপত্তা এবং অনাবিল জীবন যাপনের উপযুক্ত এক বেহেশতে পরিণত হত। ন্যায়নীতি ও সাম্যের সেই সমাজে নিরীহ নির্যাতিত ও নিগৃহীত মানুষের জন্য সে সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকত যা বিগত কালের শত শত বছর যাবৎ আভিজাত্যের ঠিকাদারা দখলকারী আমীর, উমরা ও জায়গীরদার শ্রেণী ভোগ করে আসছিল।

তিন. ১৭৬৫ সালে কোড়া জাহানাবাদ চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে ইংরেজ বিদ্বেষী মুসলমানদের মনে ক্রমে মারাঠাদের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি লাভ করে। ১৭৭০ সালে নাজীবুদ্দৌলার ওফাতের পর হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হযরত শাহ আবদুল আযীযের সকল সাহায্য সহযোগিতা ইংরেজদের বিপরীতে একমাত্র মারাঠাদের জন্যই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

চার. ১৭৭০ থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছরকাল এভাবে অতিবাহিত হয়েছিল যে, এ পার্টির সমর্থকগণ ইংরেজদের বিরোধিতায় মারাঠাদের সাহায্য করে। তারা বিভিন্ন স্থানে মারাঠাদের সাথে মিলিত হয়ে ইংরেজের সাথে লড়াই করে। কিন্তু পরে মারাঠা শক্তি একের পর এক দমিত হয়ে গেলে তারা নিজেরাই পৃথক দল তৈরী করে আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

পাঁচ. বাহ্য কারণ হিসাবে যতটুকু দেখা যায় তা হল ইংরেজরা তাদের নীতি 'লড়াই লাগাও ও শাসন চালাও'-এর আলোকে মুসলমান ও মারাঠাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কায়েমের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। এতদুপলক্ষ্যে সম্রাট আলমগীর ও শীবাজীর মধ্যকার তিক্ত ঘটনাবলিকে ইংরেজরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করতে থাকে। ফলতঃ উভয় দলের মধ্যে পারস্পরিক অসন্তোষ ও আস্থাহীনতার উদ্রেক ঘটে।

ছয়. হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর স্থাপিত এ আন্দোলনের নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে আলিমদের হাতে ছিল। কিন্তু আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি ও আন্দোলনকে অগ্রসর করানোর ক্ষেত্রে নন-আলিম লোকেরাও যথারীতি শরিক ছিলেন। বরং নন-আলিমের সংখ্যা আলেমদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কাফেলায় যোগদানকারী সদস্যদের ছাড়াও আরও নন-আলিম ব্যক্তিবর্গ এমন ছিলেন যারা আন্তরিকভাবে সকল প্রকারের সাহায্য সহযোগিতা করে আসছেন। তন্মধ্যে এলাহাবাদের রঈস শায়খ গোলাম হোসাইন[২৫২], ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উকিল কলিকাতার শায়খ আমীনুদ্দীন, টুঙ্কের গভর্নর নওয়াব আমীর আলী খান-এর মত নওয়াব জমিদার ও সওদাগর শ্রেণীও অন্তর্ভূক্ত ছিল। এভাবে কাযী ফরজান্দ আলী ও মাওলানা ফতেহ আলী সাহেবের ন্যায় সম্পদশালী আলিমগণও শরিক ছিলেন। তারা আন্দোলনের জন্য প্রচুর আর্থিক সাহায্য করেন। তাদের পরবর্তী বংশধরও এ আন্দোলনের স্বার্থে সর্বপ্রকার সাহায্যদান অব্যাহত রাখেন।

টীকা

২২৯. শাহ ইলমুল্লাহ ঃ হযরত সায়্যিদ শাহ্ ইলমুল্লাহ হিজরী ১০৩৩ সালের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার নাসিরাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের প্রায় আড়াই মাস পূর্বে পিতা এবং দু'তিন বছর বয়সে মাতা ইন্তেকাল করেন। তাঁর মামা সায়্যিদ আবু মুহাম্মদ শাহ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের নিযুক্ত একজন আমীর। তাঁর হাতেই এই এতিম ভাগিনার লালন-পালন হয়। হযরত শাহ্ ইলমুল্লাহর প্রথম কালের শিক্ষক ছিলেন তাঁরই চাচাত ভ্রাতা দেওয়ান খাজা আহমদ সাহেব। যৌবনে পদার্পন করলে মামা তাকে সেনাবাহিনীর চাকুরী গ্রহণের জন্য ডেকে পাঠান। কিন্তু তিনি চাকুরীর প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করলেন না। বরং সেনা ছাউনিতে বসেই তার জীবনের গতি পরমাত্মার সন্ধানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তিনি নিজের জায়গা জমিন সবকিছু মানুষের সেবায় ওয়াকফ করে দেন এবং নিজে দু'বছর পর্যন্ত সৈনিকদের দূর্গে অবস্থান করে আত্মশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণ লাভের চেষ্টারত থাকেন। এ সময় তাকে অনেক কষ্টসাধ্য অনুশীলন পর্ব অতিক্রম করে যের্তে হয়েছিল। এটি ছিল সেই যুগের কথা যখন হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর বিশিষ্ট খলীফা হযরত সায়্যিদ আদম বিন্নৌরী (রহ)-এর হিদায়াত ও ইসলাহী তৎপরতা পূর্ণ যৌবনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত শাহ্ ইলমুল্লাহ সাহেব হযরত সায়্যিদ আহমদ (রহ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই আত্মশুদ্ধির সকল পর্যায় অতিক্রম করে নেন। এভাবে আধ্যাত্মিকভাবে সুগঠিত হওয়ার পর হযরত সায়্যিদ আদম বিন্নৌরী নিজ মস্তকের পাগড়ী এবং হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী থেকে প্রাপ্ত পাগড়ী তাকে প্রদান করে বাড়ির উদ্দেশ্যে বিদায় দেন। বিদায়ের মূহুর্তে শাহ্ সাহেব নিজ শায়খের কাছে আরজ করে বললেন, অযোধ্যায় স্থানীয় বহু উলামা ফুযালা ও মাশায়িখ বিদ্যমান। তাদের মধ্যে আমার আর কি গুরুত্ব হবে? সায়্যিদ আদম শাহ্ কথাটি শুনে কিছুক্ষণ মোরাকাবা করলেন। তারপর মথা তুলে বললেন, তোমার গুরুত্ব হবে অনেকগুলো চেরাগের মধ্যে একটি বড় ধরনের আলোকবর্তিকার ন্যায়। তারপর আবার কিছুক্ষণ মোরাকাবা করে বললেন, তোমার গুরুত্ব হবে নক্ষত্রের জগতে দীপ্তিমান সূর্যের ন্যায়। হযরত সায়্যিদ আদম বিন্নৌরী হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলে শায়খের সঙ্গে তিনিও হজ্জ যাত্রার প্রস্তুতি নেন। হযরত সায়্যিদ আদম তাকে হজ্জের অনুমতি দিয়েছেন বটে তবে সঙ্গে এ কথাও বলে দিলেন যে, ঠিক আছে। তবে পথিমধ্যে যদি কোন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি তোমাকে কোথাও থামাতে চায় তাহলে সেখানে থেমে যেও। সেমতে হযরত শাহ্ ইলমুল্লাহ নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে বরে হন এবং নাসীরাবাদ থেকে রায়বেরেলী পর্যন্ত এসে পৌঁছেন। এ সময় জনৈক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ হযরত শাহ্ আবদুশ শাকুর মাজযুব তাকে নিজ পীরের বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে রায়বেরেলীতে অবস্থানের জন্য জোরদারভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। কথিত বুযুর্গ তাকে 'সী' নদীর তীরে একটি জায়গাকে অবস্থানের জন্য দেখিয়ে দেন। শাহ্ সাহেব সেমতে ঐ জায়গাই নিজের স্থায়ী আবাস

স্থাপন করেন। তারপর হিজরী ১০৭৫ সালে হজ্জের কাজ সম্পন্ন হয়। ১০৮২ সালে পুনরায় হজ্জের জন্য তাশরীফ নিয়ে যান। প্রত্যাবর্তনের সময় পবিত্র কাবা শরীফের একটি নকশা ও একটি বিশুদ্ধ পরিমাপ সঙ্গে করে আনেন। ১০৯৬ সালে সেই নকশা ও পরিমাপ অনুসারে 'সী' নদীর তীরে অবস্থিত নিজ বাড়িতে নিজ সন্তানদের হাতে আল্লাহ পাকের একটি ঘর নির্মাণ করান। এ মসজিদের ভিত্তিগুলোর মধ্যে জমজমের পানিও ঢালা হয়েছিল। হিজরী ১০৯৬ সালে সম্রাট আলমগীরের শাসনামলে তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহ............। ইন্তেকালের রাতে স্বয়ং সম্রাট আলমগীর স্বপ্নে দেখলেন যে, জনাব রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত ঘটেছে। প্রত্যুষে আলিমদের কাছে এ খাবের ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তারা বললেন, আজ রাতে নিশ্চয় কোন সুন্নাতের অপার অনুরাগী আলিমের ইন্তেকাল হয়েছে। সরকারি দপ্তরের নথিপত্র থেকে বুঝা যায় যে, ঐ রাতে হযরত শাহ ইলমুল্লাহ ইন্তেকাল করেছিলেন। (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ খঃ১, পৃঃ ৪৯)।

২৩০. শাহ আবু সাঈদ ঃ সায়্যিদ সাহেবের মাতামহ হযরত সায়্যিদ শাহ আবু সাঈদ (ইবন হযরত সায়্যিদ মুহাম্মদ যিয়া ইবন হযরত সায়্যিদ আয়াতুল্লাহ ইবন হযরত শাহ ইলমুল্লাহ) (রহ) ছিলেন নিজ যুগের একজন উচ্চপদস্থ আলিম ও বিশিষ্ট বুযুর্গ। তিনি যৌবন বয়সে আপন চাচা হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ সাবির (রহ)-এর হাতে তরীকতের বাইআত গ্রহণ করেন। পূর্ব পুরুষের মধ্যে পূর্ব থেকেই পীর মুরীদীর কার্যক্রম চালু ছিল। সেমতে তিনি নিজ পিতার খলীফা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস সাহেবের নিকট থেকে খেলাফতও লাভ করেন। তারপর উপস্থিত হন দিল্লীতে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর দরবারে। এখানে আত্মশুদ্ধির অভিযাত্রা পরিপূর্ণ করেন এবং উচ্চমানের অনেক খোশ খবরীর দ্বারা সম্মানিত হন। তাকে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ)-এর একান্ত মানুষদের মধ্যে গণ্য করা হত। দানশীলতা, বদান্যতা, আতিথেয়তা ও গরীব-দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে তার কোন উপমা ছিল না। একবার তার কাছে এক লক্ষ টাকা হাদিয়া হিসাবে এসেছিল। তিনি সবগুলো টাকা ঘরের বাইরেই রেখে দেন এবং সেখানে বসেই টাকাগুলো অভাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। মাদ্রাজ ও শ্রীঙ্গাপটম অঞ্চলে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ৬৫)। সম্ভবত এই এক লক্ষ টাকা ছিল মহীসুরের সুলতান টিপুর পিতা নওয়াব হায়দার আলী খানের প্রদত্ত অনুদান। (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ)।

২৩১. শাহ আবুল লাইছ ঃ হযরত শাহ আবুল লাইছ সাহেব ছিলেন হযরত শাহ আবূ সাঈদ সাহেব (রহঃ)-এর প্রিয়পুত্র। তিনি জীনের অধিককাল মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারতে অবস্থান করেন সেখানেই তার ওফাত হয়। তিনি সুলতান টিপুর সমসাময়িক ছিলেন।

২৩২. সাওয়ানিহে আহমদী, মাখযানে আহমদী, সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ প্রভতি গ্রন্থ।

২৩৩. সাওয়ানিহে আহমদী, পৃঃ ১৮।

২৩৪. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ১১৯।

১৩৫. সাওয়ানিহে আহমদী পৃঃ ৪৮,৪৯।

১৩৬. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কী সিয়াসী তাহরীক, পৃঃ ৪৭।

১৩৭. (প্রসিদ্ধ শাগরিদ) হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবীর সঙ্গে পারিবারিকভাবেও তার সম্পর্ক ছিল। হযরত শাহ সাহেব সম্পর্কে তার ফুফা ছিলেন। পরবর্তীকালে তার শ্বশুরও হন।

১৩৮. কথিত আছে যে, মতি নামে দিল্লীতে উচ্চ পরিবারের জনৈক সম্পদশালীনী মহিলা ছিল। সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত না, উপরন্ত নানা রকমের খারাপ আসর জমিয়ে ফুর্তি করত। কোন উপলক্ষ্যে তার বাড়িতে আসরের আয়োজন করা হলে তাতে এ ধরনের অনেক পুরুষ ও মহিলা অংশগ্রহণ করে। শাহ সাহেব এ সংবাদ শোনার পর জামে মসজিদে গিয়ে ইশার নামাজ আদায় করেন। তারপর ফকীরের পোশাক পরিধান করে বেশ্যালয়ে অবস্থিত 'মতির' বাড়িতে গিয়ে উঠেন। দরজায় দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিলে ভিতর থেকে একটি বালিকা বেরিয়ে আসে। সে জিজ্ঞাসা করল আপনি কে? তিনি বললেন একজন ফকীর। বালিকাটি ভিতর বাড়ি গিয়ে বিবি সাহেবাকে সংবাদ দেয়। বিবি সাহেবা কয়েকটি পয়সা ভিক্ষা দিয়ে বালিকাকে দরজায় পাঠায়। বালিকা ফিরে এসে ফকীরকে পয়সাগুলো পৌঁছিয়ে দিতে চাইলে তিনি বললেন, তুমি তোমার বিবি সাহেবাকে গিয়ে বল যে, ফকীর বলছে যে, তার কিছু গান আছে। এ গান শোনানো ব্যতিরেকে সে কারুর কাছ থেকে কোন সাহায্য গ্রহণ করে না। কাজেই বিবি সাহেবাকে প্রথমতঃ আমার সেই গান শুনতে হবে। বালিকা ভিতরে গিয়ে এসব কথা শুনালে দুশ্চরিত্রা মতি মনে করল, আপত্তির কী আছে! ফকীরের গান আমাদের আমোদ-ফুর্তির জলসায় আরও অতিরিক্ত ফুর্তির সঞ্চার করবে। কাজেই সে ফকীরকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিল। ফকীর যেই ভিতরে প্রবেশ করল উপস্থিত সকলে তার চতুর্দিকে এসে জড়ো হয়ে গেল। এমতাবস্থায় এ ফকীর চক্ষু বন্ধ করে শুরু করে দিল তার গান। গান আর কি, মোলায়েম ও শুরেলা ধ্বনিতে সূরায়ে তীনের আকর্ষণীয় এক তাফসীর। সীমাহীন দরদ ও আন্তরিকতার অভিব্যক্তি যেন প্রতিটি কথার মধ্যে টপকিয়ে পড়ছিল। আর উপস্থিত শ্রোতাদের মন-মস্তিষ্ক পর্যন্ত সেই দরদ ও ব্যাথ্যা পৌঁছে যেতে লাগল। সামান্য কিছুক্ষণের এ বক্তব্য রীতিমত জাদুর মত কাজ করে। তাদের মনন জগতে সূচিত হয় এক অদ্ভুত বিপ্লব। শুরু হল চারদিকে কান্নাকাটি রোনাজারী ও তাওবা ইস্তেগফার। এ সময় কথিত মতি তার বান্ধবীদের অনেকে সহ লাগামহীন জীবন যাত্রা থেকে তাওবা করে নেয় এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অবশিষ্ট জীবন শালীনতা ও ভদ্রতার সাথে অতিবাহিত করে (সাওনেহে আহমদী, সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ ও আমীরুর রিযায়াত ইত্যাদি)।

২৩৯. একবার কতিপয় বদমাইশ প্রকৃতির লোকেরা হযরত শাহ সাহেবের ইসলাহী ও সংশোধনমূলক কাজকর্মকে ভেঙ্গাতে শুরু করে। বিষয়টি তার জনৈক বন্ধুর চোখে পড়লে তিনি খুবই মনক্ষুন্ন হন। বিশেষতঃ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর পৌত্র ও হযরত শাহ আবদুল আযীযের ভ্রাতষ্পুত্রকে এভাবে মুখ বাকিয়ে ভেঙ্গানো হবে এটি তিনি কিছুতেই

বরদাশত করতে পারলেন না। সাথে সাথে হযরত শাহ্ ইসমাঈলের প্রতিও তার গোস্যা হয়। কারণ তিনি কেন এ বদমাইশদেরকে ভেঙ্গানোর সুযোগ দিলেন? এই বন্ধু শাহ সাহেবকে তিরস্কার করে বললেন যে, আপনি একটি সম্মানী পরিবারের লোক। অথচ আপনি অনর্থকভাবে এসব বদমাইশদের কাছে যান তাদের সাথে তর্কবাহসে লিপ্ত হন। এ কাজ করার কি প্রয়োজন ছিল? শাহ্ সাহেব কথাগুলো শুনে বললেন, তাহ্লে তারা কি মানুষ নয়, তাদেরকে সংশোধন করার কি প্রয়োজন নেই? আপনিই বলুন এ লোকগুলো কি তায়িফের বখাটে লোকদের চেয়ে আরও নিম্নমানের?যদি সরওয়ারে কায়েনাত (সা) মক্কা ও তায়িফের বখাটে লোকদের হাতে রাজপথে প্রস্তরাঘাতে রক্তাক্ত হতে পারেন তা হলে ইসমাঈলের জন্য এগুলো কোনই অপমানের ব্যাপার নয়। আমার কাছে তো এটা গৌরবের বিষয় বলে বোধ হয় যে, আমার পক্ষ থেকে চলছে সমবেদনা ও কল্যাণকামীতা আর তাদের কাছ থেকে আসছে অপমান ও কষ্টদান।

بجرم عشق توام مے کشند ونمو نمائیست
تو نیز بر سربام اکه خوش نمما سائیست

২৪০. হযরত শাহ্ সাহেবের মনে মানুষের ইসলাহ ও সংশোধন এবং তাদেরকে ওয়াজ, নসীহত করার কত অপরিসীম প্রেরণা বিদ্যমান ছিল নিম্নের ছোট একটি উদাহরণ থেকে তা অনুমান করা যায়। একবার তিনি ওয়াজ করলেন। ওয়াজ শেষ করে বসতেই এক ব্যক্তি আসল। সে অনুতাপের সাথে জিজ্ঞাসা করল যে, ওয়াজ কি শেষ হয়ে গেছে? লোকেরা উত্তর দিল, হ্যাঁ, ওয়াজ শেষ হয়ে গেছে। সে আফসুস করে বলল, আহা আমি বাড়ি থেকে ওয়াজ শোনার জন্য এ পর্যন্ত এসেছিলাম। লোকটির কথা শুনে শাহ্ সাহেব বললেন, আক্ষেপ করো না, আমি তোমাকে এ ওয়াজ পুনরায় শুনিয়ে দিচ্ছি। এ কথা বলেই তিনি পূর্ণ ওয়াজটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করলেন। ইচ্ছা হল তবুও লোকটি হিদায়েতের আলো লাভ করুক (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ।

২৪১. হযরতের বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমা শক্তিশালী করানোর হীন উদ্দেশ্যে সম্রাট পুজারীরা একটি গণদরখাস্তও তৈরী করে। এ দরখাস্তে দেড় হাজারেরও বেশি মানুষ থেকে দস্তখত নেয়া হয়েছিল। আরজীতে বলা হয়েছে যে, শাহ্ সাহেবকে তার ওয়াজ করা থেকে বারণ করা হোক। একজন আলিম সাহেব এ সকল কারসাজির নেতৃত্ব দেন। তখন তার যৌবনকাল চলছিল। কিছুকাল ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতার জিহাদ ব্যাপক আকার ধারণ করলে এই আলিম সাহেব নিজেও সে সকল কাজকর্ম শুরু করেন যা ইতিপূর্বে হযরত মাহ ইসমাঈল শহীদ সম্পাদন করে আসছেন। পার্থক্য কেবল এতটুকু ছিল শাহ সাহেব বালাকোটের রণক্ষেত্রে শাহাদত বরণ করেন আর এই আলিম সাহেব আন্দামন দ্বীপে নির্বাসিতের জীবন কাটানো অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ পাক তাদের উভয়ের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

২৪২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন 'হায়াতে ওয়ালী'।

২৪৩. হযরত মাওলানা যুলফিকার আলী সাহেব ছিলেন দেওবন্দ এলাকার একজন প্রজ্ঞাবান, প্রসিদ্ধ আলিম ও স্থানীয়ভাবে প্রবাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন বুযুর্গ। তাঁরই ভাগ্যে এ গৌরব জুটেছিল যে, তার জ্যেষ্ঠপুত্র খ্রিস্টিয় বিংশ শতকে ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান নায়ক ও মুজাহিদ হিসাবে পরিচিতি অর্জন করেন। যাকে স্বদেশ প্রেমী জনতা 'শায়খুল হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেছে। আজও ইতিহাসের পাতায় তাকে স্মরণ করা হয় 'আছীরে মাল্টা বাণীয়ে তাহরীকে রেশমী রুমাল শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান' নামে। মাওলানা যুলফিকার আলী সাহেব অরবী ও ফার্সী ভাষার সুপন্ডিৎ ও সাহিত্যিক ছিলেন। তার রচিত সাহিত্য প্রাচ্যজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে মর্যাদা সম্পন্ন স্থান দখল করে আছে। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ এর প্রতিষ্ঠাদের একজন। কর্মজীবনের দীর্ঘকাল তিনি সাম্রাজের ইন্সপেক্টর হিসাবে কাজ করেন।

২৪৪. আরমাগানে আহবাব, সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ এর সূত্রমতে। প্রথম মুদ্রণ পৃঃ ৩৯৭।

২৪৫. জন্ম হিজরী ১১৫৯ মোতাবেক ১৭৪৬ খৃঃ মৃত্যু হিজরী ১২৩৯ মোতাবেক ১৮২৪ খৃঃ। চন্দ্র মাসের হিসাবে বয়স ৮০ বছর। তিনি ১৭ বছর বয়সে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তার রেখে যাওয়া ধর্মীয় ও সামাজিক কাজকর্মের তত্ত্বাবধান শুরু করেন। তখন থেকে দীর্ঘ ৩৩ বছর ধারাবাহিক গতিতে এ দায়িত্ব পালন করে যান। তিন কন্যা ব্যতিরেকে অন্য কোন সন্তান ছিল না। কন্যাগণও সন্তানের মা হয়ে তার জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন। বড় কন্যার বিবাহ হয় হযরত মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেবের পুত্র মাওলানা ঈসার সঙ্গে। দ্বিতীয় কন্যাকে বিবাহ করেন শায়খ মুহাম্মদ আফজল সাহেব। এ ঘরেই হযরত মাওলানা মুহামদ ইসহাক ও তদীয় ভ্রাতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব জন্ম লাভ করেন। সবচেয়ে কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ হয় হযরত মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের সাথে। যিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ)-এর একান্ত সহকর্মীদের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব।

২৪৬. সাকালাতে তরীকত, পৃঃ ৪০, কামালাতে আযীযী।

২৪৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০।

২৪৮. কামালাতে আযীযী, হায়াতে ওয়ালী, পৃঃ ৩৪৪।

২৪৯. নাজফ আলী খান যদিও তাঁর প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিল তবে পরবর্তীকালে নাজীবুদ্দৌলার আমলে পরিস্থিতির পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। স্বয়ং নাজীবুদ্দৌলা ও অপরাপর আমীরদের অবস্থা ছিল এমন যে, কখনো দূর থেকে শাহ সাহেবকে আসতে দেখলে তারা নিজ সওয়ারী থেকে নেমে যেত এবং শাহ সাহেবের কদমবুছি করত। একবার জামে মসজিদের সিড়িতে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেলে সম্রাট পেছনে সরে গিয়ে শাহ সাহেবকে সম্মুখে হাটার অনুরোধ করেন (মলফুযাত)।

২৫০. মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী লিখেছেন যে, হযরত শাহ আবদুল আযীয তার সকল কাজে মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবকে সঙ্গে রেখে মানুষকে এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তার নির্দেশ আমারই নির্দেশ (শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ) কী সিয়াসী তাহরীক)।

২৫১. মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী বলেন, ১২৩৯ হিজরীতে যখন ইমাম শাহ্ আবদুল আযীয ইন্তেকাল করেন তখন তিনি নিজের মাদ্রাসার কর্তৃত্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাকের উপর ন্যাস্ত করে যান। এটিই ছিল ওয়ালী উল্লাহী বাহিনীর সাধারণ নীতি। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের বাহিনী হজ্জের সফর করে ফিরে আসলে তারাও শাহ্ আবদুল আযীযের অনপুস্থিতিতে তার ইমামত ও নেতৃত্বকে সমর্থন করেন। একালে যদি জমিয়্যাতের কোন বৈঠক মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হত তাতে মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক সভাপতিত্ব করতেন আর সায়্যিদ আহমদ শহীদ সেই বৈঠকের একজন সদস্য হিসাবে যোগদান করতেন। আবার মাদ্রাসার বাইরে কোন মজলিস অনুষ্ঠিত হলে তাতে সভাপতি থাকতেন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ। আর সদস্য হিসাবে যোগদান করতেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক। কারণ হল যে, ওয়ালী উল্লাহী আন্দোলনের বুনিয়াদী নীতিমালার সংরক্ষণ এবং কর্মী ও অর্থ যোগাড়ের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ ইত্যাদি কাজকর্ম মাদ্রাসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে সৈন্য পরিচালনা ও মাঠের নেতৃত্বদানের বিষয়গুলো ছিল হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। (শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ কী সিয়াসী তাহরীক, পৃঃ ১৫৬) আরওয়াহে ছালাছার বর্ণনামতে)।

২৫২. সম্ভবত এখানে এলাহাবাদের রঈস শায়খ গোলাম আলীর কথা বলা হয়েছে। তবে ভুলক্রমে 'আলী'-এর স্থলে হোসাইন লেখা হয়েছে।

ওয়ালী উল্লাহী ফৌজের বিপ্লবী পদযাত্রা

জন্মভূমি পরিত্যাগ তারপর স্বাধীন অঞ্চলে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ) হজ্জের সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তার চিন্তাধারা কোন দিকে মোড় অবলম্বন করেছিল–এ প্রশ্নের জবাবে আমরা ডঃ হান্টার সাহেবের নিম্নোক্ত উদৃতি পাঠকের সামনে তুলে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন ঃ

> 'পূর্বে যে বিষয়টি তার কাছে স্বপ্ন ও ধারণার পর্যায়ে ছিল, বর্তমানে সেটি সুবাস্তব বলে দৃশ্যমান হতে লাগল। তিনি নিজকে বাস্তবভাবেই বোধ করতে লাগলেন যে, তিনি ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় ইসলামী পতাকা উত্তোলন করে যাচ্ছেন এবং ইংরেজদের ধর্মীয় প্রতীক ক্রশ চিহ্নকে তাদেরই শবদেহের তলে দাফন করে চলছেন।' (হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ ৮৯)।

ইমাম সাহেবের মন-মানসিকতায় তখন যে সব পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি নিজে এবং তার খোদাই ভালভাবে অবগত। তবে এতটুকু পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায় যে, তাঁর বাহ্য নিয়মনীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। বর্তমানে তার জীবনের উদ্দেশ্য কেবল মানুষকে মুরীদ বানানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আরও অনেকখানি উর্ধ্বে। আর সেই উর্ধ্বতন প্রকৃত উদ্দেশ্য সকলের জন্য মুরীদ বানানোর ব্যাপারটি নিতান্ত প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র।

বোম্বাইতে তিনি সর্বপ্রথম জাহাজ থেকে আবরতণ করেন। তখন তার কাছে মুরীদ হতে ইচ্ছুক কিংবা তার ওয়াজ নসীহতের ভক্ত বহু মানুষের সমাগম ঘটে। তাদের এত বিপুল সংখ্যকের উপস্থিতি তাকে দীর্ঘক্ষণ অবস্থানের জন্য বাধ্য করতে পারে নি। তারপরেও তিনি বহুস্থান সফর করেছেন। সব জায়গায়ই মক্কা শরীফ সফরের তুলনায় সঙ্গী মুরীদ ও ভক্তদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি এ সকল নিরাপদ জেলাসমূহে বসে ওয়াজ-নসীহত করাকে বড়ই তুচ্ছ নযরে দেখতেন। মনে হত তার দৃষ্টি

সর্বদা দূরে সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত যুদ্ধপ্রিয় অঞ্চলগুলোর ওপর নিবন্ধ হয়ে আছে (হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ ৯০)।

উপরোক্ত উদ্বৃতিটি ডঃ হান্টারের বক্তব্য থেকে নেয়া হয়েছে। এবার হযরত সায়্যিদ সাহেবের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও বিশিষ্ট পীর মুনশী মুহাম্মদ থানেশ্বরীর বক্তব্যও লক্ষ্যণীয় ঃ

'পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন করার পর কিছুদিন পর্যন্ত তিনি ঘরবাড়ি মেরামত করার কাজে অতিবাহিত করেন। কারণ দীর্ঘ অনুপস্থিতির দরুন এগুলো অনেক জায়গায় ভেঙ্গেচুরে গিয়েছিল। তারপরই তিনি পুনরায় জিহাদে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেন। হিজরত ও জিহাদের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ ও মাওলানা আবদুল হাই সাহেবকে ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দিকে পাঠিয়ে দেন। একালে সায়্যিদ সাহেবের বাড়িতে প্রচলিত মুরাকাবা মুশাহাদা ও তাওয়াজুহ দান ইত্যাদির পরিবর্তে হিজরত ও জিহাদ করার ফযীলত সম্পর্কীয় ওয়াজ-নসীহতই কেবল চলথে থাকে। খানকায় লোকজনকে দিয়ে তলোয়ার বন্দুক ইত্যাদির পরিচালনা ও ট্রেনিং এবং হাতসই করা ও ঘোড়া ছুটানোর অনুশীলন অব্যাহত থাকে। ফলে সমাগত লোকজন তথা কথিত সূফী ও দরবেশরূপে গড়ে উঠার বদলে প্রত্যেকেই এক একজন সৈনিকরূপে গড়ে উঠতে লাগল। তাদের হাতে তাসবীহের পরিবর্তে তীর তলোয়ার এবং জুব্বা আলখেল্লার পরিবর্তে সামরিক উর্দী ও শক্তভাবে পেচানো পাগড়ী শোভা পেতে লাগল।

যারা ইতিপূর্বে তাঁর মুরীদ ও অনুসারীদেরকে দরবেশের পোষাকে দেখেছে তারপর বর্তমানে সে লোকগুলোকেই দেখছে অস্ত্র সজ্জিত সৈনিকের পোষাকে তাদের কাছে ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়ের বলে অনুভূত হয়েছিল। তৎকালে তার খেদমতে যে সব হাদিয়া আসত তাও ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। হাদিয়া হিসাবে সাধারণতঃ কোন যুদ্ধাস্ত্র কিংবা যুদ্ধের ঘোড়াই পেশ করা হত। একালে গাযীপুর থেকে শায়খ ফরজান্দ আলী সাহেব হযরত সায়্যিদ সাহেবকে দু'টি উচ্চমানের ঘোড়া, অনেকগুলো উর্দী পোষাক এবং চল্লিশ জিলদ কুরআন শরীফের হাদিয়া পেশ করেন। সবচেয়ে চমৎকার যে হাদিয়া তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন সেটি হল 'আমজাদ'[২৫৩] নামক তার নিজেরই এক সন্তান। বয়সে সুঠাম দেহের এক যুবক। শায়খ ফরজান্দ আলী সাহেব হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর সুন্নাতের

অনুসরণে নিজের এ যুবক সন্তানকে হযরত সায়্যিদ সাহেবের হাতে ন্যাস্ত করে দেন। তারপর আরজ করলেন, আমার এ সন্তানকে আপনি নিজের সঙ্গে করে জিহাদে নিয়ে যান এবং খোদার শত্রুদের তরবারীর আঘাতে তাকে কুরবানী করে দিবেন (সাওয়ানিহে আহমদী, পৃঃ ৮৯)।

মোটকথা এভাবে সামরিক সকল প্রয়োজনীয় জিনিস ও সাথীদের পূর্ণ প্রশিক্ষণের কাজ সমাপ্ত হলে হিজরী ১২৪১ মোতাবেক ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং আযাদ কাবায়েলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। কিন্তু পাঞ্জাবের রাস্তা তার জন্য নিরাপদ ছিল না বিধায় তিনি রাজস্থানের পথ অবলম্বন করেন। প্রথমে রাজস্থান তারপর সিন্ধু কান্দাহার ও কাবুল হয়ে তিনি ভারতবর্ষের উত্তর-পিশ্চম সীমান্তে গিয়ে পৌঁছেন। তারপর সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রধান কেন্দ্র।

পাঞ্জাবের পরিবর্তে রাজস্থানের পথ

পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করা নিঃসন্দেহে তাঁর জন্য কষ্টকর ব্যাপার ছিল তবে রাজস্থানের পথটিও যে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক ছিল তাও নয়। সেখানে যেমন বিরুদ্ধাচারী সরকারের পক্ষ থেকে নানা রকমের আশংকা বিদ্যমান ছিল তেমনি এখানেও অন্ন পানিহীন উপত্যকা ও শুষ্ক বালুকাময় প্রান্তরের সরকার কম আশংকার ব্যাপার ছিল না।

আসল ব্যাপার হল কোন প্রকার আশংকাবোধের বাইরেও রাজস্থানের পথ অবলম্বনের পেছনে তার কাছে আরও একটি মৌলিক বিষয় বিবেচ্য ছিল। কারণ এ রাজস্থান অঞ্চল ছিল সেই প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত অঞ্চল যেখানে বহু রাজা মহারাজার ক্ষত-বিক্ষত শবদেহ বিদ্যমান। যেখানে তখনও স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটা প্রেরণা করুনভাবে ধড়ফড় করছিল।

কথিত আছে যে, সায়্যিদ সাহেব টুংকের গভর্নর নওয়াব আমীর আলী খানের বারংবার অনুরোধের কারণে প্রথমতঃ টুংক গমন করেন। তবে আল্লাহই ভাল জানেন যে, টুংকের পূর্ববর্তী মঞ্জিলের কথা কেন উল্লেখ করা হয় না। এ ব্যাপারে সাধারণভাবে মানুষের কাছে অনবহিতও একটা কারণ হতে পারে। তবে এ কথা সত্য যে, টুংক গমনের পূর্বে তিনি গোয়ালিয়ার মঞ্জিলে অবস্থান করেছিলেন। এখানে বিশিষ্ট মারাঠা নেতা দৌলত রাও সিন্ধিয়া প্রচণ্ড 'জলন্দর'

রোগে আক্রান্ত অবস্থায় জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলেন বটে তবে স্বদেশ মুক্তির মর্মপীড়া তখনও তার অন্তর থেকে উষ্ণশ্বাসের আকারে ডুকরে ডুকরে নির্গত হচ্ছিল। তিনি ছিলেন মারাঠাদের সর্বশেষ রাজ্য–যাকে শেষ অবধি বাধ্য হয়ে ইংরেজ কর্তৃত্বের সামনে আত্মসমর্পন করতে হয়। আত্মসমর্পনের পর নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে তার রাজা শাসনের সুযোগ দেয়া হয়েছে বটে তবে তিনি নিজে এই স্বাধীন রাজ্য শাসনকে বন্দী জীবন বলেই জ্ঞান করতেন।

তার পত্নী ও জীবন সঙ্গীনী মন-মানসিকভাবে ছিলেন তারই সমমনা ও সমরূপী। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতির মুখে আশা-নিরাশার নিরীহ·শিকারে পরিণত। স্বামী জীবনের অন্তিম মূহুর্তে পৌঁছে গেছেন বলে তিনি বেঁচে থাকার স্বাদ ভুলতে লেগেছেন।

এই মহারাণীর ভ্রাতা রাজা হিন্দুরাও রাজ্য ক্ষমতা ধরে রাখছিলেন। বলা আবশ্যক যে, ইনি ছিলেন সেই রাজা হিন্দুরাও যিনি দীর্ঘকাল থেকে হযরত সায়্যিদ সাহেবের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করে আসছিলেন। গোয়ালিয়র সরকারের অপর এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন 'গোলাম হায়াদর খান'। তিনি চাকুরী জীবন থেকেই হযরত সায়্যিদ সাহেবের একান্ত বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ সহচরের ভূমিকা পালন করে আসছেন। অতঃপর এক সময় যখন নওয়াব আমীর আলী খানের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা লন্ডভন্ড হয়ে যায় তখন চিন্তাধারা ও মনমানসিকতার সমদৃষ্টি তাকে গোয়ালিয়রের দিকে ঠেলে দেয়। এখানে মহারাজা তার ব্যক্তিত্বের উপযুক্ত কদর করেন এবং তাকে নিজ সরকারের উচ্চপদে নিযুক্ত করেন।

উপরোক্ত নানাবিধ সম্পর্কগুলোর উপস্থিতিতে হযরত সায়্যিদ সাহেবের পক্ষে কিরূপে সম্ভব যে, তিনি গোয়ালিয়রের মধ্য দিয়ে লশকর সহ পথ অতিক্রম করে যাবেন অথচ গোয়ালিয়রের ভূমি তার অবস্থান গ্রহণের বরকত থেকে বঞ্চিত থাকবে? বাস্তবে ঘটনা এমনই ঘটেছে। সায়্যিদ সাহেব তার যাত্রা পথে ডালমিউ, ফতেপুর, বুহয়া, দোসরমন্ড, জালালপুর প্রভৃতি স্থানে এক দু'দিন অবস্থান করেই অবশেষে গোয়ালিয়র গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তাকে অবস্থান করতে হয়েছে ফতেহ আলী খানের বাগানে। মহারাজার পক্ষ থেকে আতিথেয়ার পূর্ণ ব্যবস্থা

গ্রহণ করা হল। কয়েক বার রাজা হিন্দুরাও দাওয়াতও করেন। একবারের আমন্ত্রণ সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে বর্ণনাকারীরা বলেন ঃ

মারাঠা জাতীয় খাবার তৈরী করা হল। তৎসঙ্গে পরাটা, রুটি, সাদা পোলাও, লাল পোলাও, মিষ্টি জর্দা, লেবু মিশ্রিত জর্দা, কালিয়া, ফীর্নী, কাবাব, ভূনা মুরগী প্রভৃতি নানা রকমের আহারও তৈরি করে পেশ করা হয়। সায়্যিদ সাহেব ও তার কতিপয় উচ্চপদস্থ সঙ্গীদের হাত রাজা হিন্দুরাও নিজে ধুইয়ে দেন। আহারের শেষে যে পান সুপারী পেশ করা হয়েছিল তাও বড় অদ্ভূত ধরনের। এগুলো রৌপ্য নির্মিত পানদানে করে পেশ করেন। দস্তরখানা গুটানোর পূর্বে আরও নানা ধরনের হাদিয়া তোহফা উপস্থিত করা হয়। এ সবের মধ্যে অনেক দামী দামী মুক্তা এবং জরির দ্বারা অতিশয় সুন্দরভাবে কাজ করা একটি চৌগাও ছিল[২৫৪]।

মহারাজার সাথে সাক্ষাৎ

দৌলতরাও নিজে উপস্থিত হতে পারেন নি। নিজের অক্ষমতার ওজর পেশ করে তিনি সায়্যিদ সাহেবকে নিজ রাজ মহলে আমন্ত্রণ জানান। সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে যারা ছিলেন তাদেরকে রাজমহলের একটি বড় কক্ষে বসতে দেয়া হয়। তারপর রাজা হিন্দুরাও সায়্যিদ সাহেবের হাতে ধরে তাকে মহারাজার কক্ষে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হল। তবে এ আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় নি[২৫৫]।

মহারাণী পর্দার আড়ালে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, আপনি এক বছর পর্যন্ত গোয়ালিয়র অবস্থান করুন। আপনার সকল সঙ্গীদের মেহমানদারী আমাদের দায়িত্বে থাকবে। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব নিজের অপারগতা পেশ করেন। মহারাণী বললেন, তাহলে অন্তত সে পর্যন্ত অবস্থান করুন যে পর্যন্ত আপনার সৈন্যদের যাবতীয় উপকরণ জোগাড় করে দেয়া সম্ভব হবে। সায়্যিদ তাতেও অপরাগতা পেশ করলেন। ইতোমধ্যে আছরের নামাযের সময় হয়ে গেল। শায়খ বাকির আলী আযান দিলেন। রাজা হিন্দুরাওয়ের নির্দেশে তৎক্ষণাৎ পানি সরবাহের ব্যবস্থা হল। সকলে অযু করলেন। সেখানে সায়্যিদ সাহেব নামায পড়ালেন। তারপর মহারাজা থেকে বিদায় নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন[২৫৬]।

সৈনিক ও গাযীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্তি

গাযীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার খসড়া কাজ পথযাত্রার পূর্বাহ্নে রায়বেরেলী থাকাকালেই সম্পন্ন হয়েছিল। গোয়ালিয়র পৌঁছার পর এই শ্রেণী বিন্যাস চূড়ান্ত করা হয়। সৈনিকদের সাধারণ নিয়মানুসারে তাদেরকে মোট পাঁচটি দলে বিভক্ত করা হয়েছিল।

এক. প্রধান দল ঃ এ দলের কমান্ডার (সেনাধ্যক্ষ) ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ মুফতী সাহেব। অন্যান্য সকল দলের মধ্যে এ দলটিই একান্ত দল ও বিশেষ দল হিসাবে বিবেচিত ছিল। স্বয়ং সায়্যিদ সাহেব এ দলের সঙ্গে থাকতেন।

দুই. মুকাদ্দিমাতুল জাইশ ঃ এ দলের দায়িত্বশীল ছিলেন হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (রহ)।

তিন. মাইছারা ঃ এ দলের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন সায়্যিদ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র সায়্যিদ মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব। কিন্তু পরে তিনি একটি বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে টুংক প্রেরিত হলে তার স্থলাভিষিক্তরূপে শায়খ বদনকে দলের সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়।

চার. সাইমানা ঃ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন গাযনার বিশিষ্ট রঈস আমজাদ খান সাহেব।

পাঁচ. সাকাতুল জাইশ ঃ এ দলের দায়িত্বশীল ছিলেন আল্লাহ বখশ মোবাতুবী সাহেব।

হযরত সায়্যিদ সাহেব গোয়ালিয়রে দু'টি জুমুআ আদায় করেছেন। এর অর্থ হল অন্তত সেখানে তিনি দশদিন পর্যন্ত অবস্থান করেছেন। তারপর সেখান থেকে চলে গেলেন 'কোরোলী'। এখানে কাসমুন্ডীর রঈস জনাব জালালুদ্দীন সাহেবের জোরালো অনুরোধ তাকে এক রাতের জন্য অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করে। উক্ত রঈস তাঁর সঙ্গী সকল লশকরের আহারের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর খোশ হাল গড়, দাঁতুলী টাণ্ডারী ও জীলানী হয়ে তিনি টুংক চলে যান।

টুংক অবস্থানকালের বিস্তারিত বিবরণ এখানে পেশ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এতটুকু কথা লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন চিঠি পত্রের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট যে,

বিদায়ের মূহুর্তে সায়্যিদ সাহেব থেকে একটি ওয়াদা নেয়া হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয় যে, প্রয়োজনের মূহুর্তে যদি নওয়াব আমীর আলী খানকে অবগতি প্রদান না করা হয় তা হলে পুনঃসাক্ষাতে মিলিত হওয়ার কোন শর্ত থাকবে না।

টুংক থেকে বের হয়ে বিয়ায নদী অতিক্রম করে তিনি কুলো পৌঁছেন। তারপর জীলানায় অবস্থান করেন। ওয়াসায়া থেকে বুঝা যায় যে, টুংক থেকে বিদায় গ্রহণের মূহুর্তে নওয়াব আমীর আলী খান ও নওয়াব উজীরুদ্দৌলা হযরতের সঙ্গে চার ক্রোশ পর্যন্ত হেটে আসেন।

সেখান থেকে আজমীর হয়ে তিনি পৌঁছলেন পালিতে। এখানে চারদিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১৫ কিংবা ১৬ই রমজান এখান থেকে ফের রওয়ানা হন। এ সকল দূর দূরান্তের অঞ্চল যেগুলোকে বর্তমানের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা রেডিও পত্র পত্রিকা ইত্যাদির কালেও অনুন্নত ও বাস্তব পৃথিবী থেকে উদাসীন অঞ্চল জ্ঞান করা হয় সে সকল অঞ্চল হযরত সায়্যিদ সাহেবের এ আন্দোলনে এতখানি সচেতন ও সজাগ হয়ে উঠেছিল যে, দূর অদূর নির্বিশেষে হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে। প্রায় একশত মানুষের একটি দল রোযা অবস্থায় নিজ বাড়ি ঘর থেকে এ উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসে যে, তারা পরবর্তী মঞ্জিল পালিতে পৌঁছে বায়আত গ্রহণ করবে। সায়্যিদ সাহেব যথাসময়ে রওয়ানা দিয়ে চলে গেছেন। ফলে তারা পরবর্তী মঞ্জিল পালিতে পৌঁছে তার সাক্ষাৎ করে এবং মুরীদ হয়। এ অপেক্ষা আরও চমৎকার ঘটনা নিম্নে লক্ষ্য করুন।

জনৈক বৃদ্ধ নিজ গ্রাম থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পালি এসে পৌছলেন। কিন্তু সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হল না। কারণ ইতিপূর্বেই তিনি এখান থেকে রওয়ানা করে চলে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধ নিজের শিশু পৌত্রকে নিয়ে পেছনে পেছনে ছুটলেন। তারপর কাঠিয়াগড় এসে সাক্ষাৎ করেন এবং মুরীদ হন। বৃদ্ধ সৈন্যদের আহারের জন্য পকেট থেকে পঞ্চাশটি টাকা নগদ হাদিয়াও পেশ করেন[২৫৭]।

বিভিন্ন মঞ্জিলে অবস্থান অব্যাহত রেখে তিনি পালি থেকে সিন্দুর হায়দ্রাবাদে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে স্থানীয় আমীরদে পক্ষ থেকে সায়্যিদ সিবগাতুল্লাহ বেলায়েতী হযরতের[২৫৮] এস্তেকবাল করেন। হায়দ্রাবাদে দু'টি জুমুআ আদায়

হয়। সিন্ধু শাসকদের অনুরোধে জুমআর নামায কিল্লার ভেতরেই আদায় করেন। তাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, হযরত সায়্যিদ সাহেব আরও কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু যেহেতু শীত মৌসুম আগমনের সময় নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। আর এ মৌসুমে প্রচুর বরফ জমে যায় বলে রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। কাজেই তিনি বেশি দিন অবস্থান করার ওপর নিজের অপরাগতা পেশ করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি চলে যাবেন বলে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন তখন ঃ 'নগদ এক হাজার টাকা, একটি বন্দুক ও এক জোড়া পিস্তল হাদিয়া পেশ করা হয়[২৫৯]।

সিন্ধুর হায়দ্রাবাদ থেকে পীরকোট তারপর শিকারপুর পৌঁছলেন। এখানে এসে তিনি সঙ্গী সৈনিকদের জন্য মোটা খদ্দর কাপড়ের পোষাক তৈরী করে দেন। অর্থাৎ এ মোবারক ফৌজী দলের জন্য সামরিক উর্দী তৈরী করে দেয়া হল। সে সকল উর্দী তখন শোভা পেতে থাকে এমন মানুষদের শরীরে যারা তদানিন্তন যুগের শ্রেষ্ঠতম আলিম ও বিদ্যান এবং শীর্ষস্থানীয় বিত্তবান পরিবারের সদস্য মন্ডলী। শিকারপুর থেকে রওয়ানা করে জাগন, খানগড়, বাহাগ প্রভৃতি হয়ে তিনি গিয়ে উঠলেন ডাহরে। সেখান থেকেই শুরু হয় দারা বোলানের এলাকা। তিনি এ দারা বোলানের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কোয়েটায় গিয়ে পৌঁছলেন। এখানকার স্থানীয় গভর্নর হযরত সায়্যিদ সাহেবের প্রতি সীমাহীন আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন। তিনি কাফেলার আহারের জন্য প্রত্যহ উচ্চমানের খাদ্যদ্রব্য ও ফল ফলাদি পাঠান। নিজে হযরতের হাতে মুরীদও হয়ে কাফেলার সঙ্গে পদযাত্রায় অংশগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব বিভিন্ন দিকের কথা চিন্তা করে তাকে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ থেকে নিষেধ করেন।

কোয়েটা থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কান্দাহার, তারপর গযনী ও কাবুল হয়ে পেশোয়ার চলে যান। তিন দিন পেশোয়ারে অবস্থানের পর পৌঁছে গেলেন 'চারসুদে' এলাকায়। এখানেই তিনি নিজের চুড়ান্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অবস্থান গ্রহণ করেন। যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রায় দশমাস পূর্বে তিনি নিজের মাতৃর্ভমি ত্যাগ করে দুর্গম পথের যাত্রা অবলম্বন করেছিলেন[২৬০]। বলা আবশ্যক যে, এ দশ মাসের সফরে হযরত সায়্যিদ সহেব যেখানে যেখানে অবস্থান করে

আসছেন প্রত্যেক জায়গায় পরবর্তী সময়ে যারা তার কাছে আসতে চাইবে তাদের জন্য যাতায়াতের পূর্ণ বন্দোবস্ত করে আসছেন।

বিহার ও বঙ্গদেশের লোকজন ছিল এতদঞ্চলের জন্য একেবারেই নতুন আগুন্তক। তাছাড়া কাফেলার ওপর নানা ধরনের গোয়েন্দা দৃষ্টিও পতিত ছিল। কাজেই পথের মঞ্জিলগুলোতে এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসা হয়েছে যেন এখানে আসতে ইচ্ছুক লোকজনকে পথিমধ্যে কোন প্রকার বাধাগ্রস্থতার সম্মুখীন হতে না হয়। সকল মঞ্জিলে নির্ধারিত লোক নিযুক্ত করে আসছেন যেন তারা পরবর্তী সময়ে আগন্তুক সঙ্গীদেরকে গোয়েন্দাদের নাগাল মুক্ত রাখেন এবং তাদেরকে অবস্থানের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দিয়ে পরবর্তী যাত্রার আয়োজন করে দেন। যাত্রার মূহুর্তের পরবর্তী মঞ্জিল পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌছতে পারে এতটুকুর ব্যবস্থাও যেন করে দেয়া হয়।

হাজী গোলাম আলী সাহেব এলাহাবাদীর নিকট হাজী সাবির আলী সাহেবের মাধ্যমে প্রেরিত একটি চিঠির অনুলিপি[২৬১] থেকে সে পথ সম্পর্কে জানা যায়। চিঠির ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ

ہرکہ خواہد کہ بلشکر سید احمد رسد، ہمیں منازلہا اختیار کند انشاء اللہ تعالی بارام تمام خواہد رسید

اوّل منل قصبہ ٹونك - مالپورہ - بھمبولہ - کشن گڈہ - اجمیر- ریان- میرٹہ- کھوجانہ- ناگود- علی ازبکوشش بہ مکان چو بدار - بسنوکہ- بیکانیر بر مکان دیدار نجش - کانا سرو جلال سر- کیلتی- چھتر گڈہ- ولیل- بھوکرہ بمکان الھی بخش امیر گڈہ بمسجد- مرڈہ- جام سر- خیر پور- بھاول پور- از انجاڈیرہ غازی خاں- از انجا معلوم خاہد شد-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হযরত সায়্যিদ আহমদ সাহেবের সৈন্য বাহিনীতে যোগদানের জন্য যেতে ইচ্ছা করবে সে যেন নিম্নোক্ত মঞ্জিল সমূহ অবলম্বন করে। তাহলে ইনশাআল্লাহ নির্বিঘ্নে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে।

প্রথম মঞ্জিল হল টুংক এলাকা, তারপর মালপুরা, ভম্বুলা, কিশানগড়, আজমীর, রাইয়ান, মীরাঠ, খাজাওয়ানা, নাগৌর, আলা, আজবুকুশাশে চোবদারের বাড়ী, বসনুকা, বেকানীরে দীদার বখশের বাড়ি, কানাসার ও জালালসার, কীলতী, চুহাত্তরগড়, বিসলা, ভোকরায় এলাহী বখশের বাড়ী, আমীর গড়ের মসজিদ. মরডাহ জামসার, খায়রপুর, ভাওয়ালপুর, আযানজা ঢেড়া গাযী খান ইত্যাদি স্থান সমূহ থেকে সব কিছু জানা যাবে।

টুংক থেকে শেষ গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে সায়্যিদ সাহেবের সময় ব্যয় হয়েছিল মোট পৌনে সাত মাস। তবে টুংক পৌছার পূর্ববর্তী মঞ্জিল ছিল দিল্লী। অনুরূপে নিজ মাতৃভূমি থেকে দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছতে তাকে বহু মঞ্জিলে অবস্থান করতে হয়েছিল। এ সকল মঞ্জিলে তার কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা অনেকটা কষ্টসাধ্য বটে।

অস্থায়ী সরকার গঠন ঃ

কাফেলা তাদের আযাদ মারকাযে অবস্থান শুরু করার অব্যবহিত পর থেকেই পার্শ্ববর্তী শিখ সৈন্যদের সাথে তাদের সংঘর্ষ শুরু হল। কাজেই তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিতে নিজেদের নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিজিত অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বিধান করার স্বার্থে একটি নিয়ম তান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেমতে ১০ই জানুয়ারি ১৮২৭ খৃঃ মোতাবেক ১২ জুমাদাল উখরা ১২৪২ হিঃ এ অস্থায়ী সরকারের ঘোষণা দেয়া হয়।

সিভিল ও ফৌজী সদস্যদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগসহ সর্বত্র ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী একটি সরকার স্থাপন করা হয়। এ সরকারের মধ্যে অপর একটি বিভাগ এমন রয়েছে যেটি এ সরকারের দৃষ্টিতে সর্বাধিক জরুরী ও সর্বাধিক অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত সেটি হল 'ইহতিসাব' বিভাগ। এ বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল প্রজাদের নৈতিক চরিত্রের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা। তাদের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তাদেরকে বুনিয়াদীভাবে গড়ে তোলা।

বলা আবশ্যক যে, হযরত সায়্যিদ সাহেব উল্লেখিত অস্থায়ী সরকারের প্রধান তথা আমীর নিযুক্ত হন। কাফেলার অন্যান্য সকল সাথীগণ তার নেতৃত্বের প্রতি যথানিয়মে আনুগত্যের অঙ্গীকার (বায়আত) ব্যক্ত করেন[২৬২]। তাছাড়া স্থানীয় পাঠান সম্প্রদায়গুলোও কাফেলার সদস্যদের সঙ্গে নিজেদের আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রকাশ করে।

বিভিন্ন স্থানে অরগানাইজার ও প্রচারক নিয়োগ

১. হযরত সায়্যিদ সাহেবের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এই স্বাধীন সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানের জন্য দূত ও প্রচারক নিযুক্ত করা হল। সেমতে এ প্রচারক-গণ ইরান ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন। ভারতবর্ষ ছিল এ সরকারের জন্য অর্থ ও সামরিক যাবতীয় উপকরণ যোগানোর মূল কেন্দ্র। কাজেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়ও তদেরকে প্রেরণ করা হল। হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ও মাদ্রাজ অঞ্চলে ইতিপূর্বে কোন দলকে প্রেরণের সুযোগ হয়নি বিধায় সেখানকার জন্য উচ্চপদস্থ সদস্য ও প্রভাবশালী প্রচারক হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী সাহেব রামপুরীকে প্রেরণ করা হয়। তার সহযোগিতার জন্য সঙ্গে আরো তিন সদস্য প্রদান করা হয়। তাঁরা ছিলেন যথাক্রমে এনায়েত উল্লাহ খান, আবদুল্লাহ ও মুকীম খান। এ দলটির উপর নিয়মিত দায়িত্বের সঙ্গে অতিরিক্ত এ দায়িত্বও অর্পিত হল যে, তারা যেন গাযীদের যে সকল জামাআত জিহাদে অংশগ্রহণের আশায় এ সীমান্ত অঞ্চলে আসতে ইচ্ছুক হয় তাদেরকে গন্তব্য পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌঁছার যাবতীয় আয়োজন করে দেয়।

২. কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর দায়িত্ব বণ্টনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করা হয়। তখন মাওলানা বেলায়েত আলী সাহেব আজীমাবাদীর উপর কেবল হায়দ্রাবাদের দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয়। আর মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলীকে মাদ্রাজ চলে যাওয়ার নির্দেশ আসে। এখানে তার সংস্কার ও প্রচারাভিযান এক অদ্ভূত বিপ্লব সাধন করেছিল। মাওলানা বেলায়েত আলী সাহেবকে যখন হায়দ্রাবাদ পৌঁছার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তখন তিনি সাথীদের বিরহ যাতনা অসহ্যবোধ করছিলেন। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, মাওলানা আমি আপনাকে বীজ হিসাবে বপন করতে চাচ্ছি[২৬৩]।

কোন সন্দেহ নেই যে, এটি ছিল সেই শক্তিশালী বীজ যা তিনি যখন বপন করেন। আর এই বীজই তার শাহাদাত লাভের পর ক্রমে অংকুরিত ও পল্লবিত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মহা-আন্দোলনের বিশাল মহীরূহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী খন্ডে এ মহীরূহের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হবে। এ সময় তার সঙ্গেও আরো তিনজন সাথীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারা ছিলেন আবদুল কাদির, আবদুল ওয়াহিদ ও কিরামত উল্লাহ।

৩. মাওলানা এনায়েত আলী সাহেব আজীমাবাদীকে বঙ্গ এলাকার প্রচারক ও দূত নিযুক্ত করা হয়।

৪. মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম সাহেব পানিপথীকে বোম্বাই অঞ্চলের জন্য দূত নিযুক্ত করা হয়।

৫. মাওলানা সায়্যিদ আওলাদ হাসান কনৌজী (ভূপালের গভর্নর নওয়াব সিদ্দীক হাসান সাহেবের পিতা) এবং সায়্যিদ হামীদুদ্দীন সাহেব (সায়্যিদ সাহেবের ভগ্নিপতি)-কে ইউপির বিভিন্ন এলাকার জন্য প্রচারণা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়।

৬. মিয়া দীন মুহাম্মদ ও মিয়া পীর মুহাম্মদসহ আরো কতিপয় সঙ্গীদের দায়িত্ব ছিল হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানের সহিত পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। তারা এ সকল চিঠিপত্রের আদান প্রদানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যেতেন। এ সকল ব্যবস্থাপনা সায়্যিদ সাহেবের নেতৃত্বে সামরিক বিভাগ থেকে পরিচালিত হত।

৭. হযরত শাহ ইসহাক সাহেব (হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর স্থলাভিষিক্ত)-এর নেতৃত্বে তখন অস্থায়ী সরকারের জন্য দিল্লী মারকায থেকে সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা প্রেরণ শুরু হয়ে যায়। তাঁর এ সকল সাহায্য গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যমে হিসাবে খুব সম্ভব সেই পথগুলোই ব্যবহার হত যেগুলোর বিবরণ ইতিপূর্বে পেশ করা হয়েছে।

নবগঠিত এ অস্থায়ী সরকারে কতটুকু জনপ্রিয়তা ছিল এবং গণমানুষের কাছে এ সরকার কতটা সমর্থন পেয়েছিল নিম্নোক্ত পরিস্থিতি থেকে তার একটা অনুমান মেলে। স্বাধীন সরকার গঠিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সায়্যিদ সাহেবকে সীদূর যুদ্ধে উপস্থিত হতে হয়। এ যুদ্ধে তার সঙ্গে যে সৈন্য দল ছিল তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষের মত। বলা আবশ্যক যে, সীমান্তে তিনি প্রথমে অতি সামান্য সংখ্যক সঙ্গী নিয়েই উপস্থিত হয়েছিলেন[২৬৪]।

অস্থায়ী সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

হযত সায়্যিদ সাহেব যদিও এ সরকারের শীর্ষ দায়িত্বভার তথা নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সম্মত হয়েছেন তবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই তিনি আসল উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি পূর্বেই এ কথা জানিয়ে দেন যে, এ আন্দোলন

করার পেছনে তার লীডারশীপ অর্জন করা কিংবা সরকার প্রধান হওয়ার কোন অভিলাষ নেই। আর তিনি রাজাধিরাজ হতেও ইচ্ছুক নন। তবে এতসব আন্দোলন ও বিপ্লবের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঔপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য খতম করা এবং ন্যায্য অধিকারীদের অধিকার ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা করা। এ কারণেই তিনি হিরাতের সুলতান, কাবুলের গভর্নর, বুখারার শাহ, কিলাতের রঈস, আযাদ কাবায়েলের সর্দারবৃন্দ ও হিন্দুস্তানের উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দ এবং আলিমদের কাছে প্রেরিত তাঁর বিভিন্ন ফরমানের মধ্যে ও শিখ সরকারের কাছে দেয়া তার চিঠিগুলোতে তিনি বারংবার নিম্নোক্ত কথাটি উল্লেখ করে গেছেন।

আল্লাহ্ পাক সাক্ষ্য আছেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য কোন ধন রত্নের সংগ্রহ কিংবা নিজেদের কোন সরকার গঠন করা নয়। আমরা তো হলাম মহান আল্লাহ পাকের কতিপয় তুচ্ছ বান্দা। কাজেই আমরা আল্লাহর বান্দাদের উপর কোন প্রকার জোর জবরদস্তি প্রতিষ্ঠা করা কিংবা কারুর কাছ থেকে তারর ন্যায্য সরকার কেড়ে নেয়ার কোন প্রকার ক্ষীণ ধারণাও পোষণ করি না। আমাদের উদ্দেশ্য হল স্বদেশকে পরাধীনতার কবলমুক্ত করা। বাস এতটুকুই। আর এ দায়িত্ব আমরা এ কারণেই তুলে নিয়েছি যে, এটি আমাদের ধর্মীয় নির্দেশ ও নির্দেশকে যথার্থ পালন করাকে আমরা মহান আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় বলে জ্ঞান করি[২৬৫]।

হযরত মাওলানা সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ) লিখেছেন ঃ হযরত সায়্যিদ সাহেবের এ আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজদের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের নির্মূল সাধন করা। কেননা ইংরেজদের কারণে এদেশে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলকেই এক অস্থিরতার জীবন যাপন করতে হচ্ছে। আর এ কারণেই তিনি নিজের আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য হিন্দু নেতৃবৃন্দকেও আহবান করেছিলেন। তিনি তাদেরকেও পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল স্বদেশ থেকে বিদেশীদের অধিপত্য খতন করা। তারপর নেতৃত্ব কার থাকবে সেটি তার চিন্তার বিষয়বস্তু বলে মনে করেন নি। সেটি তো স্পষ্টই নিজেদের দেশ সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য যারা যোগ্য বিবেচিত হবেন– হিন্দু হোক কিংবা মুসলিম কিংবা উভয়ের সমষ্টি সেই দেশ পরিচালনা করবে। এ ব্যাপারে সীমান্ত থেকে গোয়ালিয়র সরকার প্রধান

মহারাজা দৌলত রাও সিন্ধিয়া ও তার মন্ত্রী রাজা হিন্দু রাওকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি[২৬৬] গভীর মনোযোগসহ অধ্যযন করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন ঃ

بر رائے عالی روشن دمبرہن است کہ بیگانگاں بعید الوطن ملوك نسیمن وزمان گریدہ وتاجران متاع فروش بپائیہ سلطنت رسیدہ امارت امرائے کبار و دیاست روساء عالی مقدار برباد نمودہ اند وعزّت واعتبار ایشاں بالکل ربودہ

অর্থাৎ আপনি সবিশেষ অবগত রয়েছেন যে, এই বিজাতি ও বহিরাগত শক্তি যারা আমাদের প্রিয় জন্মভূমির কাছে কিনারেরও বাসিন্দা নয় তারা আজ বিশ্বব্রমান্ডের সম্রাটের স্থান দখল করে নিয়েছে। যারা ছিল সামান্য জিনিসপত্রের দোকানদার তারা এখানে বাদশায় পরিণত হয়েছে। এদিকে প্রোথিত যশা স্থানীয় আমীরদের নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত সরকার প্রধানদের কর্তৃত্ব সব কিছু লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। এতকাল যাবৎ তাদের যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও নির্ভরযোগ্যতা ছিল সবই খতম করে দিয়েছে।

چوں اہل ریاست وسیاست در زاویہ خمول نشستہاند ناچار چندے ازاہل فقر ومسکنت کمر ہمت بستہ ایں جماعت ضعفاء ہر گزار دنیا داران جاہ طلب نیستند محض بنا بر خدمت دین رب زوالجلال بر خاستہ اند ، نہ بنابر طمع مال ومنال

যেহেতু সে সকল নেতৃবৃন্দ যারা সমাজ পরিচালনা ও সরকার গঠনের যোগ্যতা রাখেন তারা আজ নিরব আড়ালে গিয়ে বসে পড়ছেন সেহেতু বাধ্য হয়ে কতিপয় দুর্বল নিঃসম্বল ফকীরকে এ কাজের জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হল। দুর্বলদের এ দলটি একান্তই তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালনার্থে এ মহৎ কার্য-সম্পাদনের জন্য এসে দাঁড়িয়েছে। এরা নিজেদের নাম ডাক প্রতিষ্ঠাকারী

দুনিয়াদার নন। বরং একান্তই নিজেদের নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে এ বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছেন। তাদের মনে ধন-সম্পদ আহরণের কোনই আকাঙ্খা নেই।

وقتے کہ میدان ہندستان از بیگانگان دشمناں خالی گردیدہ وتیرسعی ایشاں بر ہدف مراد رسیدہ آئندہ مناصب ریاست وسیاست بطالبین آں مسلم باد بیخ شوکتِ وسطوت ایشاں محکم شود - ایں ضعفاء را از روساء کبار وعظماء عالی مقدار ہمیں قدر مطلوب است کہ خدمت اسلام بجان ودل کنند وبر مسند مملکت خود متمکن شوند

যে মূহুর্তে ভারতবর্ষের ভূখন্ড সব বিজাতীয় শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি পাবে এবং আমাদের সকল শ্রম সাধনার তীর লক্ষ্যস্থল ভেদ করতে সক্ষম হবে সে মূহুর্তে স্বদেশের পরিচালনার ভার স্বদেশী তাদেরই উপরই ন্যাস্ত করা হবে যারা এ কাজের জন্য যথোপযুক্ত হবেন। তারপর সকলে মিলে তাদেরই হস্তকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। আমাদের এ তুচ্ছ দলটির পক্ষ থেকে তখন দেশের বড় বড় নেতৃবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের কাছে কেবল এতটুকুই দাবী থাকবে যে, তারা যেন মুসলমানদের প্রতি সর্বদা সদয় থাকেন এবং তাদের রাজ প্রাসাদ যেন মুসলমানদের জন্য সর্বদা শুভ বলে বিবেচিত থাকে। গোয়ালিয়র সরকারের জনৈক পদস্থ মুসলিম গোলাম হায়দার খানের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন ঃ

دریں صورت مناسب وقت چناں مے نماید کہ ریاست پیراء سیاست اراء، عظمت نشاں راجہ ہند رائےرا ایں معنے بفہمانند کہ اکثر بلاد ہندوستان بدست بیگانگاں افتادہ و ایشاں ہر جاء بنیاد ظلم وجود نیادہ ریاست دوساء ہندوستان بر باد رفتہ کسے تاب مقاومت ایشاں نمے دارد بلکہ ہر کس ایشاں را آقاء خود مے شمارد

এ পরিস্থিতিতে সময়ের যথোপযুক্ত করণীয় হিসাবে এ কথাই উপলব্ধি হচ্ছে যে, আপনি নেতৃত্বদানে সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব রাজা হিন্দুরাওকে নিম্নোক্ত কথাটি বুঝাতে চেষ্টা করুন। কথাটি হল, ভারতবর্ষের বিশাল ভূভাগ বিজাতীয়দের করায়ত্বে চলে গেছে। ফলে তারা সর্বত্র গণমানুষের উপর জুলুম ও জবরদস্তির সরকার গঠন করে নিচ্ছে। এদিকে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যপূর্ণ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব বিপন্ন হচ্ছে। তাদের কেউই এখন তাদের মোকাবেলা করার সাহস পাচ্ছে না। বরং বলা চলে যে, এখন নেতৃবৃন্দের সকলে এই বিজাতীয়দেরকেই নিজেদের অভিভাবক বলে জ্ঞান করতে শুরু করেছে।

وچوں رؤساء کبا راز مقابله ایشاں شستند لاچار چند کس ازضعفاء بے مقدار کمر بستند- پس دریں صورت رؤساء عالی مقدار را لازم چنانکه بر مسند ریاست سالها متمکن مانده اند بالفعل دراعانت ضعفاء مذکورین مساعی بلیغه بجا آرند که آں را باعث است کار بنیان ریاست خود شمارند

যেহেতু উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার ইচ্ছাও পরিত্যাগ করে বসেছে সেহেতু অগত্যা কতিপয় দুর্বল লোকদেরকে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হল। কাজেই এ মূহুর্তে সেই উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দের উচিৎ তারা যেভাবে বিগত এক দীর্ঘকাল যাবৎ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন সেভাবে বর্তমানেও তারা যেন প্রাণ উৎসর্গী ত্যাগী ও দুর্বলদের এ দলটির সর্বাঙ্গীন সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। উপরন্তু দুর্বলদের এ উদ্যোগকে তারা যেন নিজেদের হৃত কর্তৃত্ব পুনঃ দৃঢ় করার একটি অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে নেন[২৬৭]।

তবে একান্ত পরিতাপের ব্যাপার হলেও এ কথা বাস্তব সত্য যে, এ অস্থায়ী সরকার ক্রমে একটি স্থায়ী সরকারে পরিণত হতে সক্ষম হয় নি। আর যদি এ অস্থায়ী সরকার তার চুড়ান্ত লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হত তাহলে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, উপমহাদেশে পুনরায় রাজতান্ত্রিকতার অভিশাপ ফিরে আসত না।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর এ দলটি যে সরকার প্রতিষ্ঠা করত সেটি তারই ঘোষিত নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠিত হত। শাহ সাহেব তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল বুদূরুল বাযিগা'-য়[২৬৮] একটি উন্নত ও প্রগতিশীল সরকারের জন্য আবশ্যকীয় উপকরণসমূহের যথার্থ বিচার বিশ্লেষণপূর্বক এ সরকারের বুনিয়াদী ব্যাপারগুলোকে মোট পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন। তারপর বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে এমন কতিপয় দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিত্বের সন্ধান করে নিতে বলেন যারা যোগ্যতার সাথে এ পঞ্চ বিভাগের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। তারপর তাদের সভাপতিত্ব ও প্রধান মন্ত্রীত্বের জন্য এমন একজনকে নির্বাচিত করে নিতে বলেন যিনি প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা রাখেন এবং প্রতিটি বিভাগ তত্ত্বাবধানে সুদক্ষ হবেন। শাহ সাহেবের ভাষায় এ পদের লোকটিই হবেন 'আল ইমামুল হাক্ক' অর্থাৎ সত্য নেতা ও সঠিক পদনির্দেশক। বলা আবশ্যক যে, এ বিশেষণের অধিকারী 'ইমামে হাক্ক' যদি ডিক্টেটর হয়েও কাজ করেন তাতেও কোন দোষ নেই। তবে চতুর্দিক থেকে এ পদের জন্য পূর্ণ উপযুক্ত এমন মানের লোক পাওয়া নিরেট কল্পনা মাত্র। খুব কমই পাওয়া যায় বরং পাওয়া যায় না বললেই চলে। কাজেই বাধ্য হয়ে তিনি আরেকটু নীচে নেমে বিকল্প প্রস্তাব করে বলেছেন ঃ

چند ارباب دانش، صاحب تجربہ، ماہرین، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر عوام کی مقبول اور منتخب جماعت (پارلیمنٹ اور کیبنٹ) حکومت کی ذمہ دار ہوگی

অর্থাৎ কতিপয় সচেতন বুদ্ধিজীবি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ সরকার গঠন করবেন। আর এতটুকুও সম্ভব না হলে গণমানুষ কর্তৃক নির্বাচিত ও মনোনীত (পার্লামেন্ট ও কেবিনেট) পরিষদ সরকারের দায়িত্বশীল বিবেচিত হবে[২৬৯]।

টীকা

২৫৩. এই আমজাদ সাহেব হযরত সায়্যিদ সাহেবের নেতৃত্বে বহু যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বহু যুদ্ধে তিনি এমন অনেক বিজয় ছিনিয়ে আনেন যা দেখে বিজয় [illegible] করতেও হৃদকম্পন শুরু হয়ে যেত। তিনি রীতিমত মৃত্যুর [illegible] ফিরে আসতেন। আর এ কারণেই সায়্যিদ সাহেবের দরবার থেকে তাকে 'জিন্দা শহীদ' অর্থাৎ জীবন্ত শহীদের [illegible] ভূষিত করা হয়েছিল (সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, খণ্ড ১, পৃঃ ২[illegible])।

২৫৪. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ২৮[illegible]।

২৫৫. প্রাগুক্ত।

২৫৬. সায়্যিদ সাহেবের এ লক্ষ্য অর্জিত হয় ১৮২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তিনি নিজ মারকায (সীমান্তে) পৌঁছার পর নিজের প্রশাসনিক আয়োজন পরিপূর্ণ করার পূর্বেই ১৮২৭ সালের মার্চ মাসে মৌলভী [illegible] পরবর্তী সময়ে সায়্যিদ সাহেবের চিঠিপত্র [illegible] প্রেরিত হতো। বিস্তারিত আলোচনা পরে উল্লেখ হবে।

২৫৭. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ২৯[illegible]।

২৫৮. ইনি সেই সিবগাতুল্লাহ যিনি 'হুর' নামক প্রসিদ্ধ দুর্ধর্ষ সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সংগঠনের প্রধান দায়িত্বশীলকে পীর পগাড় বলা হত। তখন থেকে প্রায় একশত বছর পর ১৯৪৩/৪৪ সালের দিকে ইংরেজরা সামরিক বাহিনীর দ্বারা সংগঠনটির ধ্বংস সাধন করে। তৎকালে সংগঠনের প্রধান দায়িত্বশীল ও আমীর যিনি ছিলেন তার নামও ছিল সিবগাতুলাহ। প্রতিষ্ঠাতা ও পরবর্তীকালীন আমীরের একই নাম হওয়ার কারণে পরবর্তীকালীন আমীরকে সিবগাতুল্লাহ ছানী বলা হত। ইংরেজ প্রতিপক্ষ ২য় সিবগাতুল্লাহকে ফাঁসি দেয়। তার স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ ক্রোক করে নিয়ে যায়। লুণ্ঠিত ধনরত্নের মধ্যে কয়েক মন স্বর্ণও ছিল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৯০।

২৫৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯৮।

২৬০. পথের বিভিন্ন মঞ্জিল সম্পর্কীয় বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : গোলাম রাসূল মেহের রচিত সায়্যিদ আহমদ শহীদ।

২৬১. এ চিঠিখানা মজলিসে আওকাফে দেহলীর তত্ত্বাবধায়ক সায়্যিদ মুহাম্মদ জাফরী সাহেবের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে প্রাপ্ত।

২৬২. এই বায়আতটি কোন ধরনের বায়আত ছিল ; তিনি কি জিহাদের বায়আত নিয়েছিলেন ; না তার নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের ? এ ব্যাপারে গোলাম রাসূল মেহের সাহেব বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তবে আমাদের উদ্দেশ্য এখানে কেবল এতটুকুই যে, সরকার গঠনের ন্যায় একটি ব্যবস্থাপনা দাঁড় করানোর কাজ ১০ই জানুয়ারি ১৮২৭ সালে সম্পাদন করা হয়েছিল (মুহাম্মদ মিয়া)।

২৬৩. সাওয়ানিহে আহমদী প্রমূখ গ্রন্থাবলী।

২৬৪. প্রাগুক্ত।

২৬৫. শাহ বুখারা ও মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের সামরিক সর্বাধিনায়ক সরদার বুদ্ধ সিংয়ের নামে প্রেরিত সায়্যিদ সাহেবের চিঠি দ্রষ্টব্য।

২৬৬. সম্ভবত এটি সে আমলের কথা যখন মহারাজা দৌলতরাও সিন্ধিয়া ১৮২৭ সালের মার্চ মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তখন কোম্পানীর সমর্থক লোকেরা জনৈক এগার বছর বয়স্ক বালককে তার পালক পুত্র সাব্যস্ত করে তাকে 'আলীজাহ মেহেন্দুজী রাও সিন্ধিয়া' উপাধি দিয়ে মসনদে উপবিষ্ট করিয়ে দেয়। ফলে রাজ ক্ষমতা ও এখতিয়ারসমূহের ব্যাপারে কোম্পানীর সমর্থক মহল ও দৌলতরাও সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী বীরাবাঈ-এর মধ্যে টানাপোড়ন শুরু হয়। এক সময়ে পরিস্থিতির নাজুকতা লক্ষ্য করে এই বীরাবাঈকে গোয়ালিয়র থেকে পালিয়ে জীবন রক্ষা করতে হয়েছিল। এমতাবস্থায় অসহায় হিন্দুরাওকে কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। (বিস্তারিতের জন্য দেখুন ; 'আহাদ নামাজাতে সরকার কোম্পানী ইংরেজ বাহাদুর' খঃ ২, ভ্য. ৪, সিন্ধিয়া রিয়াসত)।

২৬৭. মজমুআহ খুতুতে কলমী, পৃঃ ১৪, মুসলমানু কে তানাজ্জুল ছে দুনিয়া কো কিয়া নোকছান পৌঁহচা-গ্রন্থ পৃঃ ২৭৪-২৭৬ পর্যন্ত-এর সূত্রে।

২৬৮. পৃঃ ৭১ থেকে ৭৩ পর্যন্ত, মুদ্রণ মদীনা প্রেস বিজনৌর হিঃ ১২৫৪, প্রকাশক মজলিসে ইলমী ডাবিল।

২৬৯. আল বুদূরুল বাযিগা' পৃঃ ৭৩ ; হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ)-এর একটি উদ্বৃতির উল্লেখ করে বলেন আমরা বর্তমানের পরিভাষায় এই উদ্বৃতির অনুবাদ করছি নিম্নরূপ ঃ

পরিপূর্ণ অর্থের একজন ইমাম যিনি ডিক্টেটর হওয়ার যোগ্যতাও রাখেন-এমন ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব লাভ খুব সহজ ব্যাপার নয় কাজেই এমন ব্যক্তির অবর্তমানে দায়িত্বশীল বানানোর জন্য নিম্নোক্ত তিনটি বিকল্প থেকে কোন একটি গ্রহণ আবশ্যক।

এক. হাকিম ও দায়িত্বশীল হিসাবে একটি বোর্ডকে মনোনীত করা ;

দুই. যদি সীমাবদ্ধ সোসাইটি হয় তাহলে এ সোসাইটির প্রতিটি বিভাগ নিজস্ব আইন-কানুনের ক্ষেত্রে নিজেদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্যের ক্ষেত্রে কাওমী তথা জাতীয় আইন-কানুন মেনে চলবে। এ সময় সেই সোসাইটি সরকার গঠনের আদৌ প্রয়োজন পড়বে না। তাদের মধ্যে এমন ধরনের মতনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির অবকাশ থাকে না যে তারা নিজস্ব সরকার গঠনের চিন্তা করতে হবে।

তিন. বুদ্ধিজীবী কিংবা সর্বসাধারণের কাছে সমর্থিত পরিষদ অর্থাৎ পার্লামেন্ট-দায়িত্বশীল হিসাবে থাকবে।

অস্থায়ী সরকারের পরিচালনাধীন মুক্তি ফৌজের কৃতিত্ব

ইতোপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জিহাদের মূল কথা প্রতিপক্ষের নির্মূল সাধন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ; বরং নিজের অভ্যন্তরে যে আমিত্ব লুকিয়ে আছে তার নির্মূল সাধন করাকেই একজন মুজাহিদ তার জিহাদের আসল জিনিস বলে জ্ঞান করে। এ মানসিকতার আলোকে সেই মুজাহিদ ন্যায় ও ন্যায়ের বাণীকে সমুন্নত করতে গিয়ে নিজের সকল আশা-আকাঙ্খা. সমুদয় ইচ্ছা অভিলাষ, সব ধরনের আবেগ অনুভূতি ও নিজের বৈষয়িক যাবতীয় স্বার্থকে অকুণ্ঠ চিত্রে ত্যাগ করে থাকে। মানবীয় এ সকল কিছু তার কাছে তখন একান্ত একটি হাতিয়ার মাত্র। হক ও ন্যায়ের সংগ্রাম পথে কোথাও এ হাতিয়ারের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে ব্যক্তির ইঙ্গিত পেয়ে এগুলো ঝনঝন করে নেচে উঠে।

একজন মুজাহিদের মনে সবচেয়ে বড় যে আকাঙ্খাটি লালিত হয়ে থাকে সেটি হল যে সত্যের দাবী নেয়ে সে দাঁড়িয়েছে সেই সত্যকে বুলন্দ করার স্বার্থে তার নিজের সকল কিছু এমন কি নিজের জীবনটুকুও বিলীন করে দেওয়া।

আত্ম উৎসর্গের এহেন প্রেরণার কথা মনের গভীরে অবস্থিত পর্দাসমূহ ভেদ করে কখনও কখনও হযরত সায়্যিদ সাহেবের জবানেও ফুটে উঠত। বিশেষতঃ তিনি যখন নিম্নোক্ত কবিতা পড়তেন তখন। কবিতাটি হল[২৭০]ঃ

ائے انکه زنی دم از محبت * از ہستی خوشتن بہر ہیز

ہر خیزد به تیغ تیز نیشیں * یا از سر راه دوست بر خیز

হযরত সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গী মুজাহিদগণের মধ্যে জিহাদের এ প্রেরণা কতখানি কার্যকর ছিল তা অনুমান করার জন্য নিম্নের কয়েকটি ঘটনা লক্ষণীয় ঃ

আকুড়ার রণক্ষেত্রে গুপ্ত আক্রমণ পরিচালনার জন্য মুজাহিদদের তালিকা তৈরী হচ্ছিল। আবদুল মজীদ খান আফরীদী গ্রাম জাহানাবাদ, জেলা

রায়বেরেলীকে এ কারণে তালিকাভূক্ত করা হয়েছিল না যে, তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আবদুল মজীদ খানের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি খুবই বিচলিত হন। শেষ পর্যন্ত হযরত সায়্যিদ সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তিনি অসুস্থতা নিয়েই বিনীতভাবে আরজ করলেন, হযরত! আমি তো এত অসুস্থ নই যে, হাটতে পারি না। এটা মহান আল্লাহর নামে পরিচালিত প্রথম অভিযান। আমি কি প্রথম অভিযানের অগ্রণী সৈনিকদের মর্যাদা অর্জন থেকে বঞ্চিত থাকবো? হযরত সায়্যিদ সাহেব তাঁর আত্ম উৎসর্গের সীমাহীন প্রেরণা ও অস্থিরতা দেখে তাকেও তালিকাভূক্ত করে নেন। তারপর বললেন, আল্লাহ পাক তোমার হিম্মত ও মনোবল আরও বৃদ্ধি করুন। এর পর ঘটনা এমন দাঁড়াল যে, তিনি সে যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি নিজের অসুস্থতার ওপর শক্তিশালী চৌদ্দজন বৈরী সৈন্যকে হত্যা করার পর তার তরবারী খন্ডিত হয়। অতঃপর তিনি শত্রু সৈন্যদের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হন এবং নিজের আকণ্ঠ পিপাসার পরম শরবত শাহাদাতের পিয়ালা পান করে অন্তিম ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করেন।[২৬]

পাঞ্জনার যুদ্ধ চলাকালে শত্রু সৈন্যদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি চলছিল। জনৈক বর্ণনাকারী বলেন ঃ

সাথীদের সকলে প্রাণান্তকর উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলাচ্ছে এবং নিজেদের ভুলত্রুটির জন্য শেষবারের মত মার্জনা চেয়ে নিচ্ছে। জাগতিক সকল সম্পর্কের চিত্র তাদের হৃদয় পট থেকে বিস্মৃত। তারা একে অন্যকে শেষ অসীয়ত করছে, কিন্তু এ বাক্যে নয় যে, আমার সন্তান-সন্ততির প্রতি দৃষ্টি রেখো কিংবা ধন-সম্পত্তির যত্ন নিও কিংবা কোন আত্মীয়ের কাছে ছালাম পৌঁছিয়ে দিও—এর কোনটিই নয়। এই শুভ্র পবিত্র আত্মার লোকগুলো আল্লাহর প্রেমে বিগলিত হয়ে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, জগত ও জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে তাদের তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র সম্পর্কও অবশিষ্ট থাকে নি। সকলের মুখে কেবল একটি অসীয়ত, একটি পয়গাম ; ভায়েরা আমার! আমরা যুদ্ধে শহীদ হই কিংবা আঘাতে জর্জরিত অবস্থায় ভুতলে লুটিয়ে পড়ি তখন আমাদের শবদেহ কাঁধে তোলা বা আমাদেরকে সামাল দেওয়ার পেছনে তোমরা সময় ব্যয় করো না। পেছনের দিকে তাকানোর কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা সম্মুখের

দিকেই কেবল এগিয়ে চলবে। মনে রেখ সফলতা ও বিজয় অর্জনের এই একমাত্র পথ[২৭২]।

দেওবন্দের মুজাহিদগণের মধ্যে শায়খ বুলন্দ বখত ও তার ভ্রাতা শায়খ মুহাম্মদ আলীও ছিলেন। এক যুদ্ধে একজন শাহাদাত বরণ করেন। শায়খ বুলন্দ বখতের কানে যখন নিজ ভ্রাতার শহীদ হওয়ার সংবাদ পৌঁছল তখন তৎক্ষণাৎ তিনি বলে ফেললেন আলহামদু লিল্লাহ ভাইজান যে একক উদ্দেশ্যকে মনে লালন করে এ পর্যন্ত এসেছিলেন সেটি তার অর্জিত হল। আল্লাহপাক আমাদের সকলকেও এ নিয়ামত ও সৌভাগ্য প্রদান করে ধন্য করুন[২৭৩]।

অনুরূপে জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি প্রচণ্ড আঘাতে যখন ধরাশায়ী হয়ে গেলেন তখন অনিচ্ছায় মুখ থেকে তার বেরিয়ে আসল فزت ورب الكعبة কাবা গৃহের প্রভূর শপথ আমি সফলকাম।

ধৈর্য ও অবিচলতা

সিদূর যুদ্ধে মুজাহিদরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হতে বাধ্য হয়। তখন হযরত সায়্যিদ সাহেবকে চোঙ্গলাই নামক স্থানে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আনা হল। মুজাহিদরা সেখানে জড়ো হয়। এ স্থানের আবহাওয়া ছিল বড়ই প্রতিকূল অবস্থার। অধিকাংশ মুজাহিদ তাতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দৈনিক এক একজন কিংবা দুই দুইজন ইন্তেকাল করতে লাগলেন। অন্যদিকে রশদপত্রও নিঃশেষ হওয়ার পথে। হাজার হাজার সাথীর মধ্যে কেবল ছয় সাতজন মাত্র সুস্থ। অবশিষ্টদের সকলেই রোগগ্রস্থ। এই ছয় সাতজনই তখন দিনরাত সকল সাথীদের সেবা শুশ্রূষার গুরু দায়িত্ব পালন করে যান।

সায়্যিদ রুস্তম আলী জল গানুবী আকুড়ার যুদ্ধে আহত হন। দুই আড়াই মাস যাবৎ নওশহরে শয্যাশায়ী ছিলেন। চোঙ্গলাঈ পৌঁছেও তিনি পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন নি। অথচ এ দুর্বলতা নিয়েও তিনি একা চল্লিশজন অসুস্থ মুজাহিদের সেবা শুশ্রূষা করার দায়িত্ব নেন। আর এত সুন্দর ও দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন যে, কাউকেও কোন প্রকার কষ্টা কিংবা দুর্ভোগ পোহাতে হয় নি।

এতসব কিছু সত্ত্বেও আবার অভাব অনটন এত প্রচণ্ড আকার ধারন করেছিল যে, দৈনিকের জন্য একজনের ভাগে এক মুষ্ঠি জব পাওয়া যেত। সেবা শুশ্রূষার

দায়িত্বে নিয়োজিত সুস্থ সাথী সেই মুষ্ঠি পরিমাণ জব পিশে রুটি বানাতেন তারপর অসুস্থ সাথীর জন্য তা পানিতে সিদ্ধ করে 'জাও' বানিয়ে দিত। অভাব অনটনের এখানেই শেষ নয় ; শীঘ্রই এমন পরিস্থিতি এসে দাঁড়াল যে, সেই এক মুষ্ঠির জোগাড় করাও অসম্ভব হয়ে গেল। মুজাহিদরা অগত্যা বন জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন এবং বৃক্ষ লতার এমন ফলমুল ও পাতা সংগ্রহ করে ক্ষুধা নিবারণ করতে শুরু করলেন যেগুলো অন্তত বিস্বাদ নয় এবং পানিতে সিদ্ধ হয়। বড় বড় হান্ডির মধ্যে এগুলো সিদ্ধ করা হত তারপর সামান্য লবণের ছিটা দিয়ে নিজেরাও আহার করতেন আর অসুস্থ সাথীদেরকেও আহার করতে দিতেন।

এত সকল অভাব অনটন চলা সত্ত্বেও আনন্দের ব্যাপার ছিল যে, সকলে নিজ নিজ ভাগ্যের ওপর পূর্ণ সন্তুষ্ট-সুস্থির চিত্ত। প্রত্যেকেই নিজ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ওপর এতই অবিচল যেন পর্বতের এক একটা বিশাল প্রস্তর খণ্ড ; বিন্দুমাত্র হেলানোও সম্ভব নয়।

এ সময় যাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটে তাদের নিয়েও আরেক অদ্ভুত অবস্থা। কাফন পরানোর মত বস্ত্র কোথায় পাবে? শহীদের নিজের ব্যবহারের জন্য কোন চাদর যদি থাকত তা হলে সেটিকেই কাফন হিসাবে চালানো হত। আর নতুবা সস্তা মূল্যের ছাপান কাপড়েই কাফন দিয়ে সমাধিস্থ করা হত[২৭৪]।

বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের সৈনিকদের মধ্যে উপরোক্ত বিষয়ের কতিপয় শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এই গুপ্ত অভিযানেরই এটি ঘটনা, শিখ প্রহরী মুজাহিদদের তাকবীর ধ্বনি শোনামাত্রই গুলি ছুড়তে শুরু করল। গুলি মাওলানা বাকির আলী সাহেবের শরীরে এসে বিদ্ধ হর। জখম ভয়ানক আকার ধারন করে। তিনি মাটিতে বসে গেলেন এবং বললেন ;

ভায়েরা আমার, আমর উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেছে, এই নাও হাতিয়ার। এটি মহান আল্লাহর সম্পদ, এ কথা বলতেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন[২৭৫]।

অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে যে সকল কর ধার্য করা হয়েছিল এগুলোর পরিমাণ ছিল নামেমাত্র। উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ সরকারি কোষাগারে

জমা দিতে হত। পরিভাষায় এ করকে উশর বলা হত। এগুলো উসূল করার ক্ষেত্রে তাদের নীতি কেমন ছিল নিম্নের উদ্বৃতি থেকে তা অনুমেয়।

'সেনাধ্যক্ষ আবদুল মজীদ খানের নিয়ম ছিল যে, তিনি পরিদর্শনে বের হতেন। প্রত্যেক জনপদের আধা মাইল দূরের এক স্থানে এসে দাঁড়াতেন। তারপর গ্রামের সরদারদেরকে বাইরে ডেকে এনে পরিস্থিতি জেনে নিতেন। সেনাধ্যক্ষের তরফ থেকে সৈনিকদের প্রতি কোন জনপদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা কিংবা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কোন কিছু দাবী করার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল। একবার জনৈক অশ্বারোহী সৈনিক ডাগুয়ীর এক ব্যক্তির কাছে কিছু প্রার্থনা করেছিল। আবদুল মজীদ খানের কানে কথাটি পৌঁছলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন। গ্রামবাসীরা বললেন এটি অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তাতে কি আসে আর যায়? কিন্তু সেনাধ্যক্ষ তার সৈনিকটিকে কড়া ভাষায় তম্বীহ্ করলেন এবং পরিস্কার জানিয়ে দিলেন যে, আমাদের সঙ্গে থাকতে হলে নিয়মনীতি পালন করে চলতে হবে। অন্যথায় তুমি আমীরুল মুমিনের কাছে চলে যাও।

একদিন দু'জন অশ্বারোহী জনৈক ব্যক্তির কাছে চিনি যাঞ্চা করেছিল। লোকটি বলল আমার কাছে তো চিনি নেই তবে গুড় আছে। অশ্বারোহী তাতে রাগ করেছিলেন। পরে সেনাধ্যক্ষ এ ঘটনা শুনতে পেলে তাদের দু'জনকে বিশটি বিশটি বেত্রাঘাত দিয়ে শায়েস্তা করেন[২৭৬]।

অফিসিয়াল কাজে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের ভূমিকাও ছিল মুজাহিদদের ন্যায়। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। রণক্ষেত্রে তারা সাধারণ সৈনিকের ন্যায় কাজ করতেন। কলম ও কলমদানী তরবারীর ন্যায় কোমরে ঝুলিয়ে রাখতেন। যখন কোন কিছু লেখার প্রয়োজন হত তখন কোন আয়োজন বিহীন লিখে দিতেন।

সর্দার পাঁয়েন্দা খানের কেরানী মুহাম্মদ গাউস তার চাকুরী ত্যাগ করে হযরত সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিল। এ ব্যক্তি এখানে অফিসের জিনিসপত্র ও পূর্ণ অনাড়ম্বর অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সায়্যিদ জা'ফরী সাহেব নাকবীর কাছে মাত্র একটি বড় কলমদানী ও একটি পুরাতন কেঁচি ছিল। মুনশী মুহাম্মদ গাউস তাকে বললেন আমি আপনার জন্য একটি নতুন চাকু ও একটি নতুন কলমদানী যোগাড় করে দিচ্ছি। কিন্তু সায়্যিদ জাফর আলী নকবী

বললেন, কি দরকার ; আমার নতুন কোন চাকুর প্রয়োজন নেই। আপনি সম্ভব হলে দীনের কোন খেদমত করে দিন। তাতেই আমি সন্তুষ্ট। আমাকে আপনি দুনিয়ার সরকারদের কর্মচারীদের মত ভাববেন না। এখানে তো ঝাড়ুদার আর অফিসারের মধ্যে কোন মর্যাদা বিভক্তি নেই। যে জিনিসের প্রয়োজন সেটি হল পূর্ণ মাত্রার ইখলাস ও নিৎস্বার্থতা। এ কলমদানী আর এই পুরাতন কেঁচি দিয়ে যখন কাজ করা যাচ্ছে আবার প্রয়োজনের মূহুর্তে একজনের কাছ থেকে চাকু চেয়ে নিয়ে কলম বানানোও যাচ্ছে তখন আমার আর অতিরিক্ত জিনিসের কি প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকছে[২৭৭]।

সৈন্যরা মার্চ করা কালে পথিমধ্যের শষ্যক্ষেত্র নষ্ট করা তাদের অতি স্বাভাবিক নীতি। তারা গ্রাম থেকে যা মন চায় লুটে নেয়। কিন্তু সায়্যিদ সাহেবের বিশাল সৈনিকদল পেশোয়ার অভিযানের সময় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসে। তখন তাদের মধ্যে সাবধানতা অবলম্বনের দৃশ্য সম্পর্কে স্থানীয় লোকজনের রিপোর্ট হল ঃ

اے انکه زنی دم محبت * از ہستي خوستن به پرہیز

بر خیزد به تیغ نیز بنشیں * یا انه سر راه دوست بر خیز

এটি বড় আশ্চার্য সৈন্যদল, ছয় সাত হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিকদের বিশাল কাফেলা অথচ পথিমধ্যের একজন মানুষের উপরও কোন অবিচার করা হয় নি[২৭৮]।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে নকল মুদ্রা বানানোকে তো কোন দোষের বস্তুই মনে করা হয় না। যদি রাসায়নিক কোন পদ্ধতিতে তামাকে স্বর্ণে পরিণত করে বাজারে ছাড়া হত তাকেও দোষণীয় বলে জ্ঞান করা হত। হযরত সায়্যিদ সাহেবের মধ্যে সত্যতা ও দিয়ানতদারী এত প্রবল ছিল যে, তার সঙ্গী আবদুল গাফফার খান পেশোয়ারী মুদ্রা বানানোর কাজে সুদক্ষ ছিলেন। তিনি একাধিকবার মুদ্রা বানানোর জন্য অনুমতিও প্রার্থনা করেন। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব প্রত্যেক বারেই তাকে নিষেধ করেন। অবশেষে খুব পীড়াপীড়ি শুরু করলে তিনি পরিষ্কার বলে দেন যে, আমাদের সঙ্গে থাকতে হলে এভাবে পীড়াপীড়ি করা ছেড়ে দাও আর নতুবা আমাদেরকে ত্যাগ করে শিখদের এলাকায় চলে যাও[২৭৯]।

সমবেদনা ও অন্যের প্রতি দরদ

সাত্মা এলাকার লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক যেখানে যে মুজাহিদ ছিল তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করল। তখন হাফিজ আবদুল আলী সাহেব ও মৌলভী মুহাম্মদ রমজান সাহেব শিওয়ায়ে অবস্থানরত ছিলেন। সায়্যিদ আমীর আলী সাহেব বায়তুল মালের টাকা পয়সা নিয়ে পাঞ্জতার যাত্রা করেন। হাফিয আবদুল আলী সাহেব তাকে গ্রামের বহির্ভাগের আশংকা মুক্ত স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে একথা বলে ফিরে গেলেন যে, আমি এই নাজুক মূহুর্তে নিজের প্রাণপ্রিয় সাথীদেরকে ত্যাগ করে যেতে পারব না।

শিওয়ার রঈস মৌলভী মুহাম্মদ রমজান সাহেবকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও নিজ সাথীদেরকে ছেড়ে আসতে পছন্দ করলেন না। অগত্যা তাদের সঙ্গে থাকলেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন।

মিনয়া এলাকায় যে সকল মুজাহিদ সন্ত্রাসীদের ভয়াবহ আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন তাদের মধ্যে স্থানীয় নবীরের একজনও ছিলেন। সন্ত্রাসীরা বারবার তাকে চিৎকার দিয়ে বলল তুমি আমাদেরই একজন। কাজেই ভারতীয়দের কাছ থেকে পৃথক হয়ে আমাদের কাছে চলে আস। কিন্তু তিনি প্রতিবারেই উত্তর দিলেন যে, তোমাদের সঙ্গে গিয়ে বেঁচে থাকা অপেক্ষা মুজাহিদগণের সঙ্গে থেকে শহীদ হওয়া হাজার গুণ উত্তম।

অপরের স্বার্থ রক্ষায় নিজেদের ত্যাগ ও কুরবানী

এ ব্যাপারে প্রথমতঃ মুজাহিদদের প্রতি হযরত সায়্যিদ সাহেবের নির্দেশ লক্ষণীয়,

"মুসলমানদের জন্য উচিৎ তারা যেন সাধারণভাবে মানুষের কাছে লোভনীয় জিনিস তথা শীরনী, ফলফলাদি ইত্যাদি আহারের ক্ষেত্রে নিজেরা পেছনে থাকবে আর অন্যদেরকে অগ্রবর্তী করে দিবে। মনোগ্রাহী কোন জিনিসের ক্ষেত্রে তাদের জন্য মোটেও বৈধ হবে না যে, তারা অন্যদের তুলনায় অধিক পরিমাণ গ্রহণ করবে। বরং এ সকল স্থানে নিজের অংশের পরিমাণে কম রাখতে হবে। পক্ষান্তরে যখন কোন কষ্টকর ও দুঃসাধ্য কাজ সম্মুখে আসবে তখন নিজেরা অন্যদের তুলনায় অধিক অগ্রগামী থাকবে। নিজের সাথীর কোন কষ্ট না হউক কিংবা সাথীর কষ্ট কম হোক এদিকেই নজর রাখতে হবে[৮৩]।

বলা আবশ্যক যে, হযরত সায়্যিদ সাহেব নিজের গোটা জীবন তিনি এ নীতির ওপরই অতিবাহিত করে আসছিলেন। শৈশব থেকে পরোপকারের প্রতি তার মনে ছিল প্রবল আগ্রহ। ভোরে ভোরে তিনি সকলের ঘর হয়ে আসতেন। ইচ্ছা হল তাদের কোন প্রয়োজনীয় কাজ থাকতে তিনি তা নির্বাহ করে দেবেন। রুজি রোজগারের সন্ধানে একবার যখন বাড়ি থেকে রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরে যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে সঙ্গীদের সকল সামানপত্রের বোঝা নিজ মাথায় তুলে নেন। লক্ষ্ণৌ অবস্থানকালে নিজের জন্য প্রেরিত আহার তিনি বন্ধুদেরকে আগে খেতে দিতেন। তারপর অবশিষ্ট কিছু থাকলে সেটি নিজের জন্য গ্রহণ করতেন। নওয়াব আমীর আলী সাহেবের সৈন্যদের মধ্যে থাকাকালে তিনি নিজ হাতে সঙ্গীদের জামা কাপড় ধুয়ে দিতেন। সৈনিকদের কোথাও অবস্থান কিংবা রাত যাপনের দরকার হলে সায়্যিদ সাহেব তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর কাজকর্ম নিজ দায়িত্বে অর্পিত রাখতেন। একবার হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদকে সায়্যিদ সাহেব একটি ঘোড়া দান করেন। শাহ সাহেব হাদিয়া কবুল করেছেন কিন্তু কখনও তাতে আরোহণ করতেন না। সফরকালে ঘোড়াটি সঙ্গে সঙ্গে হেটে যেত। শাহ সাহেব তাতে অন্য কাউকে বসিয়ে দিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে চলতেন।

ক্ষমা পরায়ণতা ও মন্দের প্রতিবাদে সদাচার

সিদূর যুদ্ধের এক নাজুক মুহূর্তে হযরত সায়্যিদ সাহেবের আহারে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনা নিঃসন্দেহে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, নৈতিক ও সামাজিক আইন-কানুন মোট কথা সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই সীমাহীন লজ্জাস্কর ও অতি মারাত্মক। যারা বিষ প্রয়োগের সাথে জড়িত তাদেরকে যে শাস্তিই প্রদান করা হোক না কেন, দেওয়ার অবকাশ বিদ্যমান। কিন্তু হযরত সায়্যিদ সাহেবের ক্ষমাশীলতা ও অন্যের দোষত্রুটি উপেক্ষার নীতি এ অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। আসামী নযর মুহাম্মদ ও ওয়ালী মুহাম্মদ উভয়েই ছিল ইয়ার মুহাম্মদ খানের খানসামা। তাদেরই ওপর সেই আহার সরবরাহের দায়িত্ব ছিল। এক পর্যায়ে মুজাহিদগণ যখন তাদেরকে পাকড়াও করে ফেলে এবং তাদেরকে উপযুক্ত শায়েস্তা করতে উদ্বৃত হয় তখন সায়্যিদ সাহেব নিজেই তাদেরকে বাচাঁনোর চেষ্টা করতে থাকেন। বিষয়টি যেহেতু হযরত সায়্যিদ সাহেবের নিজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল তাই তিনি একক বিচারে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেন। তারা নিজ নিজ বাড়ির

দিকে চলে গেল। পথিমধ্যে পাঠানরা তাদেরকে পুনরায় গ্রেফতার করে। তাদের হাত পা রশি দিয়ে বেঁধে তাদেরকে একটি ঝুপড়ীতে বন্দী করে রাখে। সিদ্ধান্ত দিল যে, তাদের সর্দারকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি এসে পৌঁছলেই তাদের শিরচ্ছেদ করা হবে।

ঘটনাক্রমে হযরত সায়্যিদ সাহেব ঐ পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তাই তাকেও জানানো হল যে, যে লোকগুলো আপনার আহারে বিষ প্রয়োগ করেছিল আমরা তাদেরকে পাকড়াও করে ফেলেছি। তারপর আমাদের খান সাহেবকেও তাদের শাস্তি বিধানের জন্য সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছ। ইত্যবসরে খান সাহেব নিজেও পৌঁছে গেলেন। তারা সায়্যিদ সাহেবকে বলল আপনি দয়া করে এখান থেকে চলে যান। আপনি উপস্থিত থাকলে তাদের সম্পর্কে উচিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা হতে পারে। তারপর আমরা বিবেচনা করব তাদের শাস্তি কি হবে? সায়্যিদ সাহেব ইতিপূর্বে অবশ্য একক ফয়সালায় তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এবার তাঁকে ফয়সালাকারীদের ভেতরই রাখা হচ্ছে না। কাজেই তিনি পাঠানদেরকে নরম ভাষায় খুব বুঝালেন। অবশেষে তাদের শান্ত করে তিনি আসামীদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। ততক্ষণে রাত হয়ে গিয়েছিল। তিনি রাতের আধারেই তাদেরকে বাইরে নিরাপদ স্থানে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেন।

লক্ষণীয় যে আমীর ও দলপতির চরিত্র যেখানে এরূপ যে নিজের জীবনের ওপর আক্রমণকারীদেরকে শুধু ক্ষমা নয় বরং গ্রেফতারকারীদের হাত থেকে কোমলভাবে বুঝিয়ে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন সেখানে এই দলপতির অধীনস্থ সৈনিকদের মাঝে সেই চরিত্রে সুপ্রভাব কি করে অবর্তমান থাকতে পারে? দেখা যায় বিশাল দলের সদস্যদের মধ্যে মানবীয় কারণে কখনও কখনও বিবাদের সুচনা হয়ে যেত। দুই মুজাহিদের মধ্যে ঝগড়া ঘটে যেত কিন্তু কি চমৎকার! ঝগড়ার উপসংহারে একজন অন্যজনকে গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করছে। যিনি মজলুম তিনিই তার জালেম ভাইকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন। আর জুলুমকারী নিজে লজ্জায় খুন হয়ে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَن

আয়াতে এরই শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। এরই সুন্দর পরিণাম হল ঃ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

এ আয়াতের শিক্ষা হল যে, তুমি অপর ভাইয়ের মন্দ আচরণের প্রতিবাদে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ গ্রহণ কর। তুমি এমন পদ্ধতি অবলম্বন কর যদ্বারা তোমার ক্ষোভ নিবারণ হবে তা নয় ; বরঞ্চ সে যেন তোমার সদাচারে লজ্জা কাতর হয়ে একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হতে পারে সে পথ অবলম্বন কর।

বিশিষ্ট মুজাহিদ মাওলানা হাফিজ আবদুল ওয়াহহাব ছিলেন দুর্বল গড়নের লোক। সৈনিকদের রসদ বণ্টনের দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত ছিল। তিনি কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। কেউ রসদ নিতে আসলে তাকে রসদ দিয়ে দিতেন। কখনও ভীড় হয়ে গেলে শৃঙ্খলা মত যে আগে আসছে তাকে আগে আর যে পরে আসছে তাকে পরে এ নীতিতে বণ্টন করতেন। নীতির অন্যথা করতে কখনই পছন্দ করতেন না। জনৈক নাবগাত সৈনিক মৌলভী ইমাম আলী আজীমাবাদী তার রসদ আনতে গেলেন। তিনি ছিলেন লাইনের পেছনে। অথচ সবার আগেই রসদ নিতে চাচ্ছেন। আবদুল ওয়াহহাব সাহেব বললেন, লাইনে আপনার পালা আসতে দিন তখন রসদ দেওয়া হবে। মৌলভী ইমাম আলী সবল ও সুঠাম দেহের পুরুষ আর মৌলভী আবদুল ওয়াহহাব দুর্বল শরীর। ইমাম আলী সাহেব আবদুল ওয়াহহাব সাহেবকে ধাক্কা দিয়ে বসলেন। ফলে তিনি হুমরী খেয়ে পড়ে গেলেন আটার বস্তার ওপর। কান্দাহারী কতিপয় সৈনিক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করছিল। তারা প্রতিশোধের জন্য এগিয়ে আসলেন। কিন্তু আবদুল ওয়াহহাব সাহেব তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ইমাম আলী আমার ভাই। ধাক্কা দিয়েছে তো আমাকে দিয়েছে। আপনারা তাতে রেগে যাচ্ছেন কেন?

ঘুরে ঘুরে এ সংবাদ পৌঁছল হযরত সায়্যিদ সাহেবের কানে। তিনি মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব সাহেবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। মাওলানা বললেন, ইমাম আলী একজন ভাল মানুষ। ঘটনাক্রমে রাগ উঠে গিয়েছিল। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। বাস ঘটনা এখানেই শেষ। মাওলানার এহেন জবাবের কথা ইমাম আলী সাহেব হযরত সায়্যিদ সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের অন্যায় স্বীকার করেন। তারপর অনুরোধ করে বললেন মাওলানার কাছ থেকে আমার অন্যায় মাফ করিয়ে দিন।

وان تعفوا وتصفحوا ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور .

এ ধরনের আরেক চমৎকার ঘটনা ঘটেছিল এনায়েত উল্লাহ সাহেব ও জনৈক ঘোড়ার রাখালের মধ্যে। রাখাল লোকটি মূলতঃ গাজীপুরের বাসিন্দা তবে লাহোরী নামে কথিত ছিল। সে কাজী মাদানী বাঙ্গালীর ঘরে চাকুরী করত। চেহারা ও শরীরের গড়ন ততটুকু সুশ্রী ছিল না। তবে আচার-আচরণ ছিল অতিশয় উন্নত। এনায়েত উল্লাহ সাহেব হযরত সায়্যিদ সাহেবের একান্ত প্রহরীদের একজন ছিলেন। সায়্যিদ সাহেবের শয্যাপাশে অধিকাংশ সময় পাহারার দায়িত্ব তারই ওপর ন্যাস্ত থাকত। একটি তশতরী অনুমতিবিহীন তুলে নেওয়া প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির সূচনা হয়। তর্কের এক মূহুর্তে এনায়েত উল্লাহ সাহেব লাহোরী বেচারার মুখে দুই ঘুষি বসিয়ে দেন।

লাহোরী সাহেব নিয়মমত অভিযোগ উত্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত ঘটনা কাজী সাহেবের বিচারালয় পর্যন্ত গিয়ে উঠে। কাজী সাহেব পরামর্শ সুলভ বললেন, আপোষ করার দ্বারা বিষয়টি চুকিয়ে নেওয়া ভাল হবে। কিন্তু লাহোরী সাহেব উপযুক্ত বিচারের দাবীতে অটল। কাজী সাহেব সিদ্ধান্ত দিলেন, শরীয়তের আইন অনুযায়ী ফায়সালা হল, আপনিও তাকে এ মানের দুটি ঘুষি বসিয়ে দিবেন।

লাহোরী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আপনারা যারা উপস্থিত আছেন তারা সাক্ষী, কাজী সাহেব আমার প্রাপ্য আদায়ের সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আমি এ প্রাপ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে পরিত্যাগ করলাম।

কথাগুলো বলতে বলতে তিনি এগিয়ে যান। ঘুষির পরিবর্তে এনায়েত উল্লাহ সাহেবের গলা জড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে থাকেন[২৮১]।

একবার আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ আহার গ্রহণের জন্য বসছেন। গোশতের মধ্যে পুড়ে যাওয়ার গন্ধ আসছিল। কারণ পাচকের অসাবধানতায় আগুনের দাগ লেগে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে ব্যাপারটি সায়্যিদ সাহেবের কাছে খুবই অপছন্দ হল। অনিচ্ছায় তার মুখ দিয়ে বাবুর্চি আবদুল্লাহর

ব্যাপারে 'মরদুদ' শব্দটি বেরিয়ে আসল। তিনি বলেছিলেন, এ মরদুদ খবরটুকুও রাখে নি। পাতিল জ্বলে গিয়েছে। গোশত খাওয়ার উপযুক্তই থাকল না।

কতিপয় সাথীবৃন্দের যারা উপস্থিত ছিলেন তাৎক্ষণিক কিছুই বললেন না। পরে নিজেদের মধ্যে কথাটি আলোচিত হলে তারা বললেন, সায়্যিদ সাহেবের মুখ থেকে এ কথাটি শোভনীয় হয় নি। সায়্যিদ সাহেবকে আমাদের কথাটি বলে দেওয়া উচিৎ। সেমতে মিয়াজী নিযামুদ্দীন চিশতী, কাজী আলাউদ্দীন, মৌলভী ওয়ারিস আলী, মৌলভী ইমামুদ্দীন, হাফিজ সাবির প্রমুখ সায়্যিদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কথাটি শুনে তিনি খুবই বিচলিত হন। বাবুর্চি আবদুল্লাকে ডেকে এনে নিজের কাছে বসান এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন[২৮২]।

চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা

নিম্নে এ ব্যাপারে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল। ঘটনাগুলো লক্ষ্য করুন এবং বর্তমানকালীন সেনাবাহিনীর চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে তুলনামূলক বিবেচনা করুন।

মোল্লা আখন্দ যাদাহ বলেন, গ্রামের মহিলারা পরস্পর বলাবলি করছে যে, হযরত সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গীরা কি যৌন অনুভূতিহীন লোক, না সম্পূর্ণ দুনিয়া ত্যাগ দরবেশ? পানি চাক্কির এখানে তারা আটা পিশাতে আসেন। সেখানে কত মহিলারাও থাকে। অথচ কি আশ্চর্যের কথা! আজ পর্যনত কোন একজন গাজীকে কোন মহিলার প্রতি চোখ তুলে তাকাতে দেখা যায় নি[২৮৩]।

ওয়াকায়িয়ে আহমদী গ্রন্থে সে সব মুজাহিদগণের যে চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার সার-সংক্ষেপ হল ঃ

তাদের জীবন থেকে অহংকার আত্মম্ভরিতা কিংবা আপন বড়াই প্রকাশের ব্যাধি নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। পারস্পরিক সমবেদনা ও দরদ এতখানি উন্নত পর্যায় লাভ করে যে, প্রত্যেকেই অন্যের সাহায্য করার কাজে অগ্রণী থাকতে সচেষ্ট। আটা পিশা, কাঠ কাটা, ঘাষ তোলা, ঘোড়ার সেবা যত্ন করা থেকে নিয়ে কাপড় রিপু করা, ধুইয়ে দেওয়া প্রভৃতি কাজকর্ম পর্যন্ত পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাফেলার সিপাহী নিজেরাই আঞ্জামদ দিতেন। বড় ছোট সকলেই ছিল সমান। বরং সবচেয়ে যিনি বড় তিনি সবচেয়ে তুচ্ছ কাজটি করার জন্য সবার আগে এসে উপস্থিত হতে চাইতেন।

নামাজ আদায়ের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু এখানে ছিল অনেক কংকর পাথর। সায়্যিদ নিজে কয়েকজন সাথীকে নিয়ে ঘাষ তুলে আনেন। তারপর সে জায়গায় ঘাষগুলো বিছিয়ে দিয়ে সমতল ও মোলায়েম বানিয়ে দেন। খিমাগুলোর ওপর রোদ্রতাপ প্রচণ্ডভাবে লাগছিল বলে সাথীদের কষ্ট হচ্ছিল। সায়্যিদ সাহেব নিজে কতিপয় সঙ্গীকে নিয়ে ঘাষ কেটে আনেন। এগুলোকে তাবুর ওপর বিছিয়ে তাপের প্রখরতা হ্রাসের ব্যবস্থা নেন।

নিজেদের মধ্যে কোনরূপ গাল-মন্দ, কদর্যভাষা, হিংসাবিদ্বেষ ইত্যাদি সমূলে খতম হয়ে গিয়েছিল। সৈনিক জীবনযাত্রার পাশাপাশি আল্লাহ পাকের যিকর ফিকরের সিলসিলা অব্যাহত। দিবসে বড় মুজাহিদ ও শক্তিশালী যোদ্ধা আর রজনীতে তারা জগৎ থেকে নির্লিপ্ত যাহিদ ও দরবেশ। মনে হত আসমানের ফেরেশতারা যেন জমিনে নেমে আসছেন। কিংবা মুসলমানরা যেন আবার তাদের প্রথম যুগে ফিরে গিয়েছেন[২৮৪]।

এটি একটি অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণালয়ের কোন পরিবেশে ক্রমাগত দশ বারটি বছর অবস্থানের ফলে কাফেলার প্রতিটি সদস্য নৈতিক গুণাবলীর শীর্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন। চারিত্রিক নির্মলতায় তারা অনুপম আদর্শের মর্যাদা অর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে নওয়াব উজিরুদ্দৌলা আরও বলেন ঃ

به رحمت خضرت جہاں پناہ وجل زکرہ آں سپاہ تقوی ودستگاہ را اخلاص فی العمل بان مرتبہ بود کہ اگر مجاہد للّٰہی یك یك سپاہی ازاں لشکر ظفر انتباہی بہ قلم اید دفترے باید غیر متناہی کہ رقمش بانجام رسد

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে এই তাকওয়া সমৃদ্ধ সৈন্যবাহিনীর ইখলাস ও নিঃস্বার্থতা এতখানি উচ্চ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, যদি এক এক জন সিপাহীর ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের প্রশংসা করা হয় তাহলে তা পূর্ণ করার জন্য অসীম মানের কোন গ্রন্থ আবশ্যক[২৮৫]।

তাদের মধ্যে যে কয়জন কোনক্রমে সীমান্ত এলাকা থেকে জীবিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তারাও শেষে যে এলাকায় গিয়েছেন সেখানকার সমাজেও সৃষ্টি করেন মহাবিপ্লব। পুরাতন বয়স্ক লোকদের মুখে আজো তাদের সেসব ইতিহাসের চর্চা বিদ্যমান। তাদের সেই নির্মল নৈতিকতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বলা যায় যে,ইংরেজ প্রপাগান্ডার পূর্ণ মিশন তাদেরকে দুর্নাম করার কাজে দীর্ঘকাল থেকে লিপ্ত থাকার পরেও প্রায় ত্রিশ বছর পর ১৮৫৭ সালে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক আসে তখন মুজাহিদদের অনুগামী লোকেরাই জিহাদের জন্য দ্রুত চুটে আসে।'ওহাবী আন্দোলন যা সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও বিশ্বস্ততার অনুপম আদর্শের মর্যাদা রাখে, যেটি ১৮৫৮ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত গ্রেট বৃটেনের শীর্ষ ক্ষমতাধর গোষ্ঠিকেও অস্থির করে রেখেছিল–সেই মহাআন্দোলন বস্তুতঃ তাদেরই একটি কীর্তি। এটি ছিল সেই তাকওয়া সমৃদ্ধ সৈন্যবাহিনীর অবশিষ্ট কতিপয় সিপাহী তথা হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কতিপয় নক্ষত্রের।'এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী খন্ডে আসবে ইনশাআল্লাহ।

টীকা

২৭০. হযরত সায়্যিদ সাহেব এ অনুভূতিকে তার একটি চিঠির মধ্যে এভাবে ব্যক্ত করেন।

بندہ کہ در مقابلہ اعداء مولائے خود غیرت وحمیت نمی دارد فی الحقیقت بندہ نیست، ومحبت کہ جان ومال وعزت وابروئے خود را در تحصیل رضائے محبوب خود نگاہ دارد فی الحقیقت محبوب نے

মজমুআ মাকাতীবে শাহ্ ইসমাঈল শহীদ, হস্তলিপি, পৃঃ ১০৯, জামাআতে মুজাহিদীন গ্রন্থ পৃঃ ৭১-এর অনুসরণে।

২৭১. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ২৪৮।

২৭২. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৮।

২৭৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১।

২৭৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪১০,৪১১,৪৩৭।

২৭৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৫।

২৭৬. জামাআতুল মুজাহিদীন, পৃঃ ৪২।

২৭৭. প্রাগুক্ত সীরাতে সায়্যিদ-এর অনুসরণে, পৃঃ ৫০।

২৭৮. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ৮৮।

২৭৯. জামাআতুল মুজহিদীন, পৃঃ ৮৯।

২৮০. তাঁর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

مسلمان رامی باید کہ در مقام خواہش نفسانی ومشتہلات آں متل طعام لزید وشیرنی و انواع فوگہ دیگراں را بر نفس خود تقدیم دہد، وخود را از انہار مود خر شود، وروا ندارد کہ زیادہ از آں بہ خظوظ نفسانی محظوظ گردد، بلکہ دریں امر کمی بجانب خویش پسند نماید ودر مقام رنج وتکلیف نفس خود را بر دیگراں مقدم سازند وآمدن بلا وکلیف برانہا پسند بحوالہ جماعت مجاهدین ص ۷۲

২৮১. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ১৯৪।

২৮২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬।

২৮৩. প্রাগুক্ত, খঃ ২, পৃঃ ৩৮।

২৮৪. প্রাগুক্ত, ১ম মূদ্রণ, পৃঃ ১৭৫-১৭৬।

২৮৫. ওয়াছায়া, খঃ ২, পৃঃ ৫৯, জামাআতে মুজাহিদীন পৃঃ ৭১।

অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারী দল ও তাদের বিরুদ্ধাচরণের কারণ

বলা আবশ্যক যে, হযরত সায়্যিদ সাহেবের মূল প্রতিপক্ষ ছিল সাম্রাজ্যবাদ। সেমতে হযরতের উত্থানের সাথে সাথে এ সাম্রাজ্যবাদের স্বপক্ষ শক্তিগুলো মোকাবেলার জন্য বুক টান করে সামনে এসে যায়। এগুলো তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। এক শিখ শ্রেণী, দুই সম্রাট পুজারী মুসলমান তিন ইংরেজ।

সায়্যিদ সাহেব প্রথমোক্ত দু'টি দলের মোকাবেলা পরম সফলতার সঙ্গে করে যান। কিন্তু তৃতীয় দলটির প্রকৃতি ছিল একটু ব্যক্তিক্রমধর্মীয়। এরা সম্মুখ সমরে এগিয়ে আসলে তাদের জন্যও পরাজয় অনিবার্য ছিল। কিন্তু তারা সম্মুখ সমর এড়িয়ে পথ বেছে নেয় ষড়যন্ত্র ও কূটনীতির। ফলে এর জবাবে সায়্যিদ সাহেবের জন্য পরাজয় ও শাহাদাত বরণের পথ অবলম্বন ব্যতীত আর কিছুই করার মত ছিল না। বস্তুত এ ইতিহাস এক ঘৃণিত ও লজ্জাস্কর ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। সীমান্তের পাঠানদেরকে নিয়ে সায়্যিদ সাহেবের অস্থায়ী সরকার নিজ লক্ষ্য তথা পূর্ণ বিজয় অর্জনের চুড়ান্ত সম্ভাবনা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। এ মূহুর্তে সেই পাঠানদেরকেই তার প্রতি বিদ্বেষী করে দেয়া হল। তার প্রচন্ড শত্রুতে পরিণত করে পদতল থেকে মাটি সরিয়ে দেয়া হল। নিম্নে সেই ইতিহাস কিছু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

শিখ শ্রেণী ঃ শিখদের জন্য অপরিসীম সৌভাগ্য লাভের ব্যাপার ছিল যদি তারা যথাসময়ে ইংরেজ বেনিয়াকে চিনে নিতে পারত। তখন সায়্যিদ সাহেবের সহযোগিতা পেয়ে তাদের পক্ষে নিজেদের সরকারকে স্থায়িত্ব দানের মহা সুযোগ ছিল। কিন্তু তারা সে পথ অবলম্ব করে নি। ফলে সায়্যিদ সাহেবের শক্তি নির্মূল হওয়ার দশ পনের বছরের ভিতরই তাদেরকে মহা পরিতাপের দিন বরণ করতে হল। জীবনের জন্য নিজেদের রাজত্ব খুইয়ে বসল। নীতিগতভাবে শিখরা যে ভুল করেছিল তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

এক. মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের সকল বিজয়ী অভিযান বৈদেশিক শক্তি ইংরেজদের দিক থেকে সরে গিয়ে স্বদেশী পাঠানদের বিরুদ্ধে এসে পুঞ্জিভূত হয়েছিল। তিন বছরের মধ্যেই ১৮২৪ সালে মহারাজা পেশোয়ার জয় করে নেন এবং সর্দার ইয়ার মুহাম্মদ খানকে বাৎসরিক কর আদায়ের শর্তে গভর্নর নিযুক্ত করেন[২৮৬]। তারপর সর্দার ইউসুফ যুযীর অঞ্চল যেখানে সায়্যিদ সাহেবের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল–মহারাজা রণজিতের দৃষ্টি সে দিকেই নিবদ্ধিত ছিল।

দুই. নীতির ব্যাপারেও সায়্যিদ সাহেবের বাহিনী ও মহারাজার সাথে একটা সাংঘর্ষিক অবস্থা বিরাজিত ছিল। সায়্যিদ সাহেবের সৈন্যবাহিনী স্বদেশে স্বদেশী শক্তির প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক। পক্ষান্তরে রণজিৎ সিং পরদেশী ইংরেজকে সুবিধা দানে আগ্রহী। বিষয়টি তখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যখন মারাঠা সর্দার মহারাজা জশোবন্ত রাও হোলকার ও সর্দার আমীর আলী খান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় মহারাজা রণজিৎ সিং ও শিখ সর্দারদের কাছে অমৃতসর পৌঁছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। তখন শুধু তাদেরকে ব্যর্থ মনোরথ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাই নয়[২৮৭] বরং 'লেবেল গ্রীফনের' বর্ণনা মতে মহারাজা রণজিৎ সিং ইংরেজদের সহিত এমন চুক্তিও করে নিয়েছিল যে, তিনি হোলকারকে অমৃতস্বর থেকে ত্রিশ ক্রোশ দূরে হটিয়ে দিবেন। ভবিষ্যতে আর তাদের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখবেন না[২৮৮]।

তিন. হযরত সায়্যিদ সাহেবের চিন্তা-ভাবনা শুধুমাত্র হিন্দুস্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বস্তুত ইউরোপের মোকাবেলায় সমগ্র এশিয়াকে সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে মহারাজা রণজিৎ সিং সমগ্র ভারতবর্ষ তো নয়ই শিখদের দল উপদলগুলোর সম্মিলিত রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষেও ছিলেন না। আর এ নীতির ভিত্তিতেই তিনি 'সতলজ' তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ তথা পটয়ালা, নাভা, জেন্দ, কাপুরথলা প্রভৃতির মধ্যে ইংরেজদের কর্তৃত্ব সমর্থন করে যান।

চার. যদি মেজর বসুর এ আপত্তি সঠিক হয়ে থাকে যে, 'ইংরেজরা শিখদেরকে সম্মুখের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল যেন তারা সিন্ধিয়ার মোকাবেলা করতে পারে। আর এ কারণেই মহারাজা রণজিৎ সর্বদা ইংরেজদের সাথে মিল বজায় রেখে চলেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা সুলভ ভূমিকা অব্যাহত রাখেন।'

তা হলে সায়্যিদ সাহেব ও রণজিৎ সিংয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সেই পার্থক্য ও বৈপরীত্য বিদ্যমান যা মহারাজা সিন্ধিয়া ও ইংরেজদের মধ্যে ছিল। সম্ভবত এ কারণেই হযরত সায়্যিদ সাহেব মহারাজা দৌলত রাওকে বিশেষভাবে এ আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

পাঁচ. দুর্ভাগ্যক্রমে হযরত সায়্যিদ সাহেব ও সীমান্তের পাঠান সর্দার ইয়ার মুহাম্মদ খান প্রমুখের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও ছিল বিরাট তফাৎ। সায়্যিদ সাহেব সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড বিদ্বেষী আর ইয়ার মুহাম্মদ খান তার সম্পূর্ণ বিপরীত এ দৃষ্টিকোণ থেকে এমন উক্তি করা ভুল হবে না যে, ইয়ার মুহাম্মদ ধর্মীয়ভাবে ভিন্নতা সত্ত্বেও হযরত সায়্যিদ সাহেবের তুলনায় মহারাজা রণজিৎ সিংয়েরই অধিকতর ঘনিষ্ঠ চিন্তাভাবনার লোক ছিলেন।

সেমতে সিদুর যুদ্ধ চলাকালে যখন মুজাহিদদের শক্তি শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত উন্নীত হল, পেশোয়ারের সর্দারবৃন্দ সাম্মা সর্দারদের সৈন্যবাহিনী ও মুজাহিদগণের সম্মিলিত সৈন্য সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে তখন পেশোয়ারী সর্দারদের টনক নড়ে উঠে। ফলে তারা প্রথমতঃ সায়্যিদ সাহেবকে বিষ খাওয়ানোর ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু হযরতের বেহুশী সত্ত্বেও যখন দেখা গেল যুদ্ধের গতি অটল অবস্থায় রয়েছে, বরং মুজাহিদগণ ক্রমে আরও শক্তিশালী হচ্ছে তখন এই পেশোয়ারী সর্দারবৃন্দ নিজেদের সৈন্য সামন্ত নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। পরিশেষে যুদ্ধ চালনার পূর্ণ দায়ভার এসে পড়ল একা মুজাহিদদের ওপর। ফল দাঁড়াল এই যে, মুজাহিদদের হাজার হাজার সদস্যকে শাহাদাতবরণ করতে হল। তারপর সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ গ্রন্থকারের মতে ঃ

'তখন থেকে মুসলিম মুজাহিদদের ভবিষ্যত দাঁড়াল দু'টি বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবেলা করা। একটি শিখ আর অপরটি হল পেশোয়ারী সর্দারবৃন্দ। খাবিখানের[২৮৯] দৃষ্টিভঙ্গিও গ্রামের[২৯০] ঐ ঘটনার পর পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। উপরন্তু সে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ তালাশ করছিল। এভাবে তারা হযরত সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গী মুজাহিদদের জন্য শক্র বরং প্রকাশ্য প্রতিপক্ষে পরিণত হল।

ছয়. এই দুই প্রতিপক্ষ ছাড়া তৃতীয় আরেকটি প্রতিপক্ষও ছিল। সেটি ছিল সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং সর্বাধিক চালাক। এটি কূটকৌশল প্রয়োগে কেবল

সুদক্ষই নয় বরং প্রতিষ্ঠাতা বটে। ক্ষুদ্র প্রতিপক্ষদ্বয় কামান গোলা ও সৈন্য সমান্ত দিয়েও সেই সফলতা অর্জন করতে পারে নি যা সে অতি সামান্য একটি 'শব্দ' (ওহাবী) চালু করার ফলে অর্জন করে নিয়েছিল। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলো লক্ষণীয়।

ইংরেজ সাহেবদের কর্মনীতি

উপমহাদেশীয় লোকেরা ইংরেজ জাতিকে খুবই ইজ্জত ও সম্মানের সঙ্গে বরণ করেছিল। এতদঞ্চলীয় ভাষা ও সভ্যতার সম্মান প্রদর্শনের অভিব্যক্তি 'সাহেব' (বন্ধু, আপনজন) তারা একমাত্র ইংরেজদের জন্যই ব্যবহার করত। কিন্তু উপমহাদেশীয়দের ব্যাপারে ইংরেজ নীতি গোড়া থেকেই ছিল ব্যতিক্রম। তারা এ দেশ ও এ মাটিকে কখনও আপন বা নিজের বলে মেনে নেয় নি। বরং সর্বদাই ভেবে আসছে শত্রু হিসাবে, পরদেশ হিসাবে। এ শত্রুদেরকে পদানত করণার্থে শান্ত মাথা ও সচেতন মস্তিষ্ক নিয়ে আজীবন তারা যে নীতির ওপর অব্যাহত ছিল সেটি ছিল ; এ শত্রুকে পদানত করতে হবে তবে এমন কৌশলে যেন নিজেদের শক্তি খুব বেশি ব্যয় না হয় এবং অর্থও যথাসম্ভব কম খরচ হয়। তাদের মস্তিষ্ক সদা সর্বদা এমন কৌশল উদ্ভাবনের পেছনে নিয়োজিত থাকত যেন সুক্ষভাবে নিজের মতলবটুকু পরিপূর্ণ হাসিল হয় আর এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খাটিয়ে যে, নিজে সবই করব তবে কোন দুর্নাম ঘটার পথ যেন না থাকতে পারে।

উপমহাদেশের এই সুবিশাল আয়তনের ভূখন্ডে বহু গোত্র বহু বংশ এবং বহু সভ্যতা সংস্কৃতির লোকেরা বাস করে আসছে। এখানে ছোটখাট বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ থাকা খুবই স্বাভাবিক। এহেন কারণে যারা এ ভূখন্ডের কল্যাণকামী ছিলেন তাদের কর্মনীতি ছিল[২৯১] সকল সম্প্রদায়ের চিন্তাধারাকে এমন একটা ভারসাম্য পূর্ণ অবস্থায় রাখতে চেষ্টা করতেন যেন কোনক্রমে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধি স্থান করতে না পারে। পক্ষান্তরে ইংরেজরা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের পর তাদের সার্বক্ষণিক চেষ্ট ছিল এ দূর্বল বিন্দুতে ক্রমাগত আঘাত হানা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছোবলকে পূর্ণ উৎসাহিত করে নিজেরা সস্তায় হীনস্বার্থ হাতড়িয়ে নেওয়া। সম্রাট বাবর তার নিজ পুত্র সম্রাট হুমায়ুনকে অসীয়ত করে বলেছিলেন যে, মানুষের দেহে মেযন চারটি বিপরীত উপাদান আছে আর সবগুলো মিলেমিশে সুন্দরভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষ তদ্রূপ

একটি মানবীয় বিশাল দেহ। এখানে বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র ও সম্প্রদায়ের বসবাস। কাজেই তাদের মধ্যে সর্বদা ঐক্য ও সহনশীলতা বজায় রাখবে তাহলে এ বিশাল সামাজ্যের দেহ কখনও ব্যাধিগ্রস্থ হবে না। নিরাপদ থাকতে পারবে[২৯২]।

ইংরেজ আমলে তদানিন্তন কর্তা ব্যক্তিদের চিন্তাধারা

'ভারতবর্ষে অবস্থিত আমাদের সরকারের প্রতি বিভাগ সেটি আর্ন্তদেশীয় কিংবা বৈদেশিক সম্পর্ক কিংবা আইন-শৃঙ্খলা বিধান কিংবা প্রতিরক্ষা মোট কথা সকল বিভাগের কর্মনীতি সর্বদা এমন হতে হবে যে, 'পারস্পরিক সংঘর্ষ বাধাও এবং নিজেরা নিরাপদ মোড়লের সরকার পরিচালনা কর'[২৯৩]।

আলোচ্য আন্দোলনের ব্যাপারেও ইংরেজদের যে নীতি ছিল সেটি তাদের কূটকৌশল ও খলচাতুরীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে আছে।

যতদিন পর্যন্ত হযরত সায়্যিদ সাহেবের এ আন্দোলন ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে কেবল এতটুকু কাজের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল যে তারা নতুন সিপাহী ও সমর্থক ভর্তি করতেন আর ফান্ড তৈরী করতেন ততদিন পর্যন্ত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি কোন গভীর দৃষ্টি আরোপ করেন নি। বরঞ্চ কোথাও কোথাও তাদের কেউ কেউ আন্দোলনের পক্ষে সহযোগিতাও প্রদর্শন করেছেন। যেমন সায়্যিদ সাহেবের কাফেলাকে যারা দাওয়াত করেছিলেন তাদের তালিকায় মুসলিম ও হিন্দু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জনৈক ইংরেজ কর্তাব্যক্তির নামও পাওয়া যায়। তিনি গোটা কাফেলার আহারের জন্য তাদের নৌযানে খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে হজ্জের সফরে এ কাফেলা ডিলমিউ থেকে এলাহাবাদের উদ্দেশ্যে গঙ্গা পাড়ি দেওয়ার সময় এবং কলিকাতা অবস্থানকালেও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের ওয়াজ-নসীহতের মজলিসে মুসলিম ও হিন্দু শ্রোতাদের মধ্যে বহু ইংরেজ সাহেবরাও স্বপত্নীক উপস্থিত থাকতেন[২৯৪]। সাওয়ানিহে আহমদী গ্রন্থের লেখক মুনশী মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী আরও বিস্তারিত করে এ কথাও বলেন যে, জিহাদে রওয়ানার পূর্ব মূহুর্তে হযরত সায়্যিদ সাহেব দূরদর্শিতা সুলভ এলাহাবাদের রঈস শায়খ গোলাম আলী সাহেবের মাধ্যমে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহের ল্যাফটেনেন্ট গভর্নর নওয়াব বাহাদুরকে নিজের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন তিনি উত্তরপত্রে

জানিয়েছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে কোন বিশৃঙ্খলা সূচিত হওয়ার আশংকা না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ ধরনের কোন প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতিবন্ধক হব না[২৯৫]।

ডাঃ হান্টার আরও অগ্রসর হয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন ঃ

> জনৈক ইংরেজ বর্ণিত যিনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কোন সুবায় তেলের ব্যবসা করতেন তিনি আমাকে বলেছেন যে, তার অধীনে বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান চাকুরী করে। এদের মধ্যে একটা সাধারণ নিয়ম চালু আছে যে, তারা নিজেদের উপার্জন থেকে একটা নির্ধারিত অংশ পৃথক করে রাখে এবং এ অংশটি সিতানা দূর্গের জন্য সাহায্য হিসাবে পাঠিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে আবার কতিপয় আছে খুবই আবেগ-প্রবণ ও সাহসী। তারা কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে নিজেদের ইমামের অধীনে খিদমতের উদ্দেশ্যে চলে যায়। অন্যান্য হিন্দু কর্মচারীরা যেমন নিজেদের পিতামাতার মৃত্যু বার্ষিকী পালনের জন্য ছুটি নিত তদ্রূপ ১৮৩০ থেকে ১৮৪৬ সালে মুসলিম কর্মচারীরাও ধর্মীয় কারণ দেখিয়ে এক দুই মাসের ছুটি নিয়ে যেত। তারা বলত এ সময়ে আমাদেরকে ধর্মীয় আহবানে সাড়া দিতে হচ্ছে এবং আমাদেরকে হেলালী ফৌজে ভর্তি হতে হচ্ছে কাজেই ছুটি নিতে হয়[২৯৬]।

ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মুসলিম লিডার স্যার সৈয়দ আহমদ খান যার খ্যাতি ও কৃতিত্বই ছিল যে, তিনি মুসলিম ও ইংরেজদের মধ্যকার তিক্ততা ও দূরত্ব হ্রাস করার চেষ্টা চালিয়ে আসেন। তারপর মুসলিম জাতিকে ইংরেজদের কাছে কেবল বিশ্বস্ত হওয়ার চেষ্টাই নয় বরং মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠকে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ বলে প্রমাণও করেছেন। একস্থানে তিনিও লিখেছেন ঃ

> সে কালে মুসলমানরা তাদের সর্বসাধারণকে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাতেন। শিখদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগদানের জন্য হাজার হাজার সশস্ত্র মুজাহিদ ও অসংখ্য যুদ্ধ সামগ্রীর স্তুপ জমা হয়। স্থানীয় কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট এ ব্যাপারে তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে স্পষ্ট উত্তর দেওয়া হল 'এ ব্যাপারে তোমরা কোনই হস্তক্ষেপের দিকে যেও না। দিল্লী শহরের জনৈক মহাজন মুজাহিদদের কিছু টাকা আত্মসাত করেছিল। স্থানীয় কমিশনার উইলিয়াম ফ্রীসার পর্যন্ত বিষয়টি গড়িয়ে গেলে

তিনি টাকা উসুল করে দেন এবং এটি সীমান্তে প্রেরিত হয়[২৯৭]।

এখন প্রশ্ন হল তাহলে ইংরেজরা নীতি অবলম্বন করেছিল কেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে ডঃ হান্টার তার অভিমত প্রকাশ করে লিখেছেন ঃ

> ১৮২২ সাল পর্যন্ত হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের প্রচারাভিযানের দিকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কোনই কর্ণপাত করে নি। তিনি নিজের আত্মত্যাগী মুরীদবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের অধিকৃত সুবাগুলোর সফর করেন। হাজার হাজার মানুষ তার কাছে মুরীদ হয়। এভাবে তাদের উদ্যোগে একটি যথানিয়মের সিংহাসন, ধর্মীয় ট্যাক্স ও সরকার গড়ে উঠে। এ সময়গুলোতে আমাদের অফিসারগণ নিজেদের আশপাশের বড় বড় ধর্মীয় আন্দোলনের পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন অবস্থায় কেবল অর্থ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকেন। তারা বিচার বিভাগের জন্য আদালত প্রতিষ্ঠা ও ফৌজদেরকে প্যারেড করানোর কাজেই সর্বদা নিয়োজিত থাকলেন। ফলে ১৮৩১ সালে নিজেদের পূর্ব উদাসীনতার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ নির্মমভাবে তাদের টনক নড়ে উঠেছিল[২৯৮]।

এই লেখক অন্যত্র 'ওহাবী মুবভম্যান্ট' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, এ আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তিনটি ঃ

এক. উচ্চমানের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা,

দুই. গোপনীয়তা রক্ষা,

তিন. বিশ্বস্ততা।

মোট কথা ডঃ হান্টার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত নীতি গ্রহণের কারণ হিসাবে দু'টি বিষয়কে চিহ্নিত করেন। এক. আন্দোলনের পরিণতি সম্পর্কে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, অবহেলা ও অনবগতি। দুই. আন্দোলনের মধ্যে সীমাহীন মাত্রায় গোপনীয়তা রক্ষিত রাখা।

কিন্তু বাস্তব ইতিহাস এমন নয়। অনবগতি অবহেলা কিংবা উদাসীনতার কারণে তারা উপরোক্ত নীতি গ্রহণ করে নি। অতিশয় ঠান্ডা মাথায় সুস্থির মস্তিষ্ক নিয়ে সুচিন্তিত পলিসি হিসাবেই তারা নীতিটি গ্রহণ করেছিল। কারণ এ আন্দোলনের জন্য পথকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হলে ঃ

এক. একটি বলিষ্ঠ বিরুদ্ধ শক্তি ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল থেকে বের হয়ে চলে যাচেছ।

দুই. আন্দোলনকারীরা নিজেদের যে মারকায নির্ধারণ করেছে সেটি ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল থেকে বহু দূরের এক জায়গায় অবস্থিত। যেখান থেকে বিপরীত কোন কিছুর আশংকা করা যায় না।

তিন. পূর্ব থেকেই তারা সম্ভাব্য করে রেখেছিল যে, তাদের মধ্যে কোন মীর জাফর কিংবা কোন মীর সাদিককে সৃষ্টি করে দিবে। সে সুবাদে উদীয়মান শক্তিটি নিজ গৃহের অভ্যন্তরেই প্রতিবন্ধী হয়ে পড়বে।

চার. এও হতে পারে যে, যামান শাহর ন্যায় সায়্যিদ সাহেবের শক্তিতেও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দ্বারা তারা নির্মুল করার সম্ভাবনা পোষণ করছিল।

পাঁচ. তাছাড়া সীমান্ত থেকে ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে কোন আক্রমণ চালাতে হলে মধ্যখানে প্রতিবন্ধক হিসাবে দন্ডায়মান ছিল শিখ রাজত্ব। কাজেই যেভাবে তারা শুজাউদ্দৌলার মাধ্যমে রোহিলা পাঠানদের শক্তিকে এবং হায়দ্রাবাদের নিযাম ও মারাঠাদের মাধ্যমে সুলতান ফতেহ আলী টিপুকে পরাজিত করেছিল সে নীতিতে শিখদেরকে অবলম্বন করে সায়্যিদ সাহেবের শক্তিকেও নির্মুল করা যাবে বলে ধরে নিয়েছিল।

কাজেই এতগুলো সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় এটিকে একান্ত অনবগতি ও অপরিমাণ দর্শিতা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরং তখনকার প্রেক্ষিতে ইংরেজ সুচিন্তিতভাবেই এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল যে তাদের অধিকৃত অঞ্চলে এ আন্দোলনের ব্যাপারে আদৌ কোন কর্ণপাত করা হবে না। যাতে করে সাধারণ ভাবে তাদের সদ্ভাব ও প্রশস্ত চিত্ততার প্রকাশ ঘটে, দেশের অভ্যন্তরেও কোন বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয় আর এভাবে নিজেদের কোন শক্তি ক্ষয় করা ব্যতিরেকে শত্রুরা দেশের সীমানা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যায়।

কোন সন্দেহ নেই যে, এ নীতির আলোকেই ইংরেজরা 'ওহাবী' অপবাদের জন্ম দেয় এবং এ অপবাদ প্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদের এতখানি ক্ষতি সাধন করে যা শিখদের ঝাকালো বাহিনী কিংবা ইয়ার মুহাম্মদ খান প্রমুখ পাঠান নেতাদের সশস্ত্র ফৌজের দ্বারাও কোন কালে সম্ভব হওয়ার মত ছিল না। অপবাদ প্রচারমূলক ষড়যন্ত্রের ফলে স্বয়ং মুসলিম ফৌজের হাতে হযরত সায়্যিদ

সাহেবের সঙ্গী মুজাহিদ গাযীদের বিরাট অংশ এক রাতেই খুন হয়। বলা আবশ্যক যে, 'ওহাবী' শব্দটি কি, তার অর্থ ও হাকীকত কতটুকু–এ সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুর অধিপতি মহারাজা রণজিৎ সিং কিংবা পাঠান সর্দার ইয়ার মুহাম্মদ খানের আদৌ জানা থাকার কথা নয়। এ শব্দটি সম্পর্কে সম্যক ধারনা ছিল একমাত্র ইংরেজদের। ১৮০৯ সালে তাদেরই একটি মালবাহী জাহাজ পারস্য উপসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় ওহাবীদের কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। তখন থেকে তারা ওহাবীদেরকে চেনে এবং নিজেদের কূটনীতির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে তাকে। তারপর এদের দ্বারা এই ইংরেজ মধ্যপাচ্য, আফ্রিকা ও ইরান অঞ্চল কি কি ঘৃণিত অপকর্মের সাধন করেছিল সে হিসাব একমাত্র তারাই ভালভাবে বলতে পারেন।

টীকা

২৮৬. মহারাজা রণজিৎ সিং, অধ্যাপক সীতারাম কুহেলী, এম.এ.গভঃ কলেজ, লাহোর, পৃঃ ২০৪।

২৮৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮-১০০, সিয়াসী তারীখে হিন্দ, মেজর জেনারেল স্যার জন মিল্কম, লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসনামল।

২৮৮. তারীখে রাজগানে পাঞ্জাব, লেবেল গ্রীকন।

২৮৯. খাবি খান ছিলেন হেন্ড দুর্গের সর্দার। এ দূর্গটি পুরাতন আমলের একটি দূর্গ, আবাসীন নদীর তীরে মনোরোম প্রকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রাচীন রাজকীয় জাঁকজমকের স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খাবী খান প্রথম দিকে হযরত সায়্যিদ সাহেব ও তার সকল সঙ্গীকে নিজ দূর্গে আমন্ত্রণ করে। উপরন্তু কাফেলা যেন তার এ দূর্গেই অবস্থান করে তজ্জন্যও দারুন পীড়াপীড়ি করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এক সময় হযরত সায়্যিদ সাহেবের একটি সিদ্ধান্ত তার সন্তুষ্টি মোতাবেক না হওয়ায় সে বিগড়ে যায় এবং সায়্যিদ সাহেবের পরম শত্রুতে পরিণত হয়।

২৯০. গ্রামটির নাম মানপুরী। এখানকার ভূমি মালিক ও চাষীদের দু'টি কলহলিপ্ত দল ছিল। ইতিপূর্বে প্রায় এক শতাব্দী কাল থেকে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসে। বহুবার মারামারি ও খুনাখুনির পর্বও তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়। সাওয়ানিহে আহমদী গ্রন্থকারের মতে উভয় দলের প্রায় চার হাজার মানুষ এ দ্বন্দ্বে প্রাণ হারিয়েছিল। হযরত সায়্যিদ সাহেব এতদঞ্চলে আগমনের পর এখানে তারই প্রবর্তিত আইন কানুন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বিধি মোতাবেক কলহের এ ব্যাপারটিও উত্থিত হয় সায়্যিদ সাহেবের আদালতে। তিনি যথাসাধ্য চুলচেরা উদঘাটন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ভূমি মালিকদের দাবীকে বৈধ ও সঠিক বলে ফয়সালা দেন এবং দ্বিতীয় দল থেকে তাদের ভূমি উদ্ধার করিয়ে দেন। খাবি খান দ্বিতীয় দলের সমর্থক ছিলেন। কাজেই তিনি সায়্যিদ সাহেবের সিদ্ধান্ত সহজভাবে মেনে নিতে পারলেন না। অবশেষে আত্মপুজারী ও স্বার্থপর লোকদের যে নীতি সাধারণতঃ হয়ে থাকে সে নীতিতে খাবি খান শুধু আদালতের রায় অমান্য নয়, উপরন্তু হযরত সায়্যিদ সাহেবের গোটা আন্দোলন ও ব্যবস্থাপনার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠেন।

২৯১. সাওয়ানিহে আহমদী ও সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ ইত্যাদি গ্রন্থের 'কলিকাতায় অবস্থান' অধ্যায়।

২৯২. বর্ণিত অসিয়তটি রামরাজ্য কলেজ কুলহারপুর-এর অধ্যক্ষ ডঃ বলকৃষ্ণ রচিত একটি পাণ্ডুলিপির উদ্বৃতি দিয়ে বোম্বাইর 'আখবারে খেলাফত' পত্রিকা ১৯শে আগস্ট ১৯২৬ সালে প্রকাশ করে।

২৯৩. হুকুমতে খোদ ইখতিয়ারী, পৃঃ ৫১-৫২।

২৯৪. সাওয়ানিহে আহমদী, পৃঃ ৮৯।

২৯৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯।

২৯৬. হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ ৩৩।

২৯৭. ইন্সটিটিউট গেজেট, ৮ই ডিসেম্বর ১৮৭১ খৃঃ রওশন মুস্তাকবিল, পৃঃ ১১২-এর অনুসরণে।

২৯৮. হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, দ্বিতীয় অধ্যায়, ডাঃ হান্টার পৃঃ ৬৭।

বিভিন্ন দিকের যুদ্ধাভিযান ও ফলাফল

হযরত সায়্যিদ সাহেবের সর্ব প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় ২০শে[২৯৯] জুমাদাল উলা ১২৪২ হিঃ মোতাবেক ২১শে[৩০০] ডিসেম্বর ১৮২৬ সালে। এ যুদ্ধে ৩৭জন মুহাজির[৩০১] শহীদ হন এবং ৩৫ জন আহত হন। ফলাফরের দিক থেকে এ অভিযান সম্পূর্ণভাবে সফল বিবেচিত হয়। কারণ যারা হযরত সায়্যিদ সাহেবের বিরোধিতা পোষণ করত তাদের মনে মুজাহিদগণের শৌর্য-বীর্য, শাক্তি ও বীরত্ব গভীরভাবে রেখাপাত করে। নিকটস্থ ও দূরে অবস্থিত খানদের মধ্যেও দারুন প্রভাব বিস্তার করে। 'হিন্ড' দূর্গের রঈস খাবি খান রীতিমত পূর্ণ ভক্তিসহ হযরতের দরবারে উপস্থিত হন। মুজাহিদগণের তালিকায় নিজের নামও অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি হযরত সায়্যিদ সাহেব ও তার সকল সঙ্গীকে এই হিন্ড দূর্গে নিয়ে যান। খুবই আন্তরিকতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধাসহ তাদের আতিথ্য করেন। কাবি খানের একান্ত বাসনা ছিল হযরত সায়্যিদ সাহেব যেন তার এই হিন্ড দূর্গকেই নিজের কেন্দ্রস্থল রূপে বরণ করে নেন। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব তাতে সম্মত হলেন না। অবশেষে অপরাগতা প্রদর্শন করে কয়েকদিন পর আপন ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করেন।

তারপর থেকে উভয়ের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া অব্যাহত থাকে। তাতে অধিক সংখ্যক ক্ষেত্রে মুজাহিদগণ জয়লাভ করেন। স্থানীয় পাঠান যুবকরাও হযরতের সৈন্য দলে ভর্তি হতে থাকে। এভাবে ১২ই জুমাদাল উখরা ১২৪২ হিঃ মোতাবেক ১০ই জানুয়ারি ১৮২৭ সালে তিনি যখন একটি নিয়মতান্ত্রিক নেতৃত্ব ও সরকার পরিচালনার ঘোষণা দেন তখন মুরীদ হওয়ার জন্য বাইয়াত প্রার্থনাকারীদের মধ্যে সুওয়াত সাম্মাহ ও বনীর অঞ্চলের খানগণও শামিল ছিলেন। হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদের মতে এ খানদের সকলেই নিজস্ব ফৌজ, সৈন্য সামন্ত ও তোপ-কামানের অধিকারী ছিলেন[৩০২]।

ইয়ার মুহাম্মদ খান যিনি মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের পক্ষ থেকে পেশোয়ারের গভর্নর নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ও তাঁর ভ্রাতা সুলতান মুহাম্মদ খান, পীর মুহাম্মদ

খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দও পত্রের মাধ্যমে হযরত সায়্যিদ সাহেবের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের স্বীকারোক্তি প্রেরণ করেন।

শিখ সরকারের তরফ থেকে আবেদন করা হল যে, আবাসীন নদীর অপর তীরকে মহারাজার পক্ষ থেকে যেন 'এনাম' বলে মনে করা হয়। আর ভবিষ্যতে যেন এ সীমানা থেকে অগ্রসরের ইচ্ছা পরিহার করা হয়[৩০৩]। কিন্তু হযরত সায়্যিদ সাহেব তো না দেশ ও সামাজ্য লোভী আর না তিনি নিজের কোন নেতৃত্ব বা সরকার গঠনের প্রত্যাশী। তবে তিনি যে মহৎ উদ্দেশ্য বুকে ধারন করে আপন জীবনকে উৎসর্গীত করেছিলেন সেটি এ ধরনের তুচ্ছ উপঢৌকনকে নিজের জন্য অবমাননাবোধ করেন। কাজেই তিনি শিখ সরকারের আবেদন রক্ষা করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ফলে মহারাজার পক্ষ থেকেও যথারীতি যুদ্ধ পরিচালনা ও অভিযান প্রেরণের সকল আয়োজন শুরু হতে থাকে।

সিদূর ময়দান ছিল উভয় পক্ষের শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্র। শিখ সৈন্যরা অস্ত্রসস্ত্র ও পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেল। এদিকে সায়্যিদ সাহেবের সৈন্যবাহিনীও পূর্ণ মোকাবেলার জন্য খিমা তৈরী করে নেয়। কথিত আছে এ যুদ্ধে হযরত সায়্যিদ সাহেবের নেতৃত্বাধীনে প্রায় এক লক্ষ সৈনিক জমায়েত হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও এ বিশাল বাহিনী ছিল অন্তঃসারশূন্য। কারণ হল ঃ

এক. এ বিশাল জমায়েতের মধ্যে সেসব লোকেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিল যাদের সুখ-স্বপ্ন ও আস্তম্ভরিতা ইহতিসাব বিভাগের সাম্য নীতির কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সায়্যিদ সাহেবের সরকার পদ্ধতির মধ্যে ইহতিসাব বিভাগ নামে একটি বিভাগ ছিল। এ বিভাগ গণমানুষের নীতি ও চরিত্রের সংশোধন এবং তাদের আমল ও আখলাকের উৎকৃষ্ট সাধন ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করত। নীতিগতভাবে এ বিভাগের দৃষ্টিতে সকলেই ছিল সমান। এখানে ছোট বড়, আমীর গরীব, খান পাঠানের ব্যবধান করার কোন অবকাশ নেই আর বাস্তবেও কোন ব্যবধান করা হয় নি। এহেন সাম্য নীতি এক শ্রেণীর মানুষ যাদের মস্তিষ্কে আপন শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাধি অনুপ্রবিষ্ট ছিল তারা আন্তরিকভাবে পছন্দ করতে পারে নি।

দুই. খাবি খান যিনি খুবই আন্তরিকতা ও ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন তিনিও বিচার বিভাগের ন্যায়দৃষ্টির সামনে আহত হন। মানপুরী গ্রামের ঘটনায়

তিনি যে পক্ষকে সমর্থন করে আসছিলেন আদালতের ফয়সালা তাদের বিপরীতে চলে যায়। এমন কি সেই ফয়সালা কার্যকরীও করে দেয়া হয়।

তিন. পেশোয়ারের সর্দারবৃন্দ এ জমায়েতে রয়েছেন। তারা যদিও সায়্যিদ সাহেবের নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিল তবুও বস্তুত তাদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল মহারাজা রণজিৎ সিং। কাজেই এ সর্দারদের সম্রাট পুজারী মনোভাব ও চিন্তাধারা রণজিৎ সিংকেই সাহায্য করেছিল।

উপরোক্ত অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাসমূহের ফলে ঠিক ঐ রাত্রে যার প্রত্যুষ সময়ে চুড়ান্ত লড়াই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা–হযরত সায়্যিদ সাহেবের আহারে বিষ মিশিয়ে দেয়া হল। ভোরে মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব খিমায় প্রবেশ করে দেখলেন হযরত সায়্যিদ সাহেবের অবস্থা ভিন্ন রকমের। বার বার বমি করছেন আর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছেন। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ সাহেব যথেষ্ট সাবধানতার সহিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত রাখার চেষ্টা করেন। স্বয়ং সায়্যিদ সাহেবও নিজের অসুস্থতার কথা গোপন রাখতে চেষ্টা করে যান। এভাবেই তাকে একটি হাতির পিঠে বসিয়ে রণক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দেওয়া হল।

রণক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ উত্তপ্ত। মুজাহিদদের পক্ষ দেখতে সুবিশাল দেখাচ্ছিল। এ সময় শিখ খালসা বাহিনী ও পেশোয়ার সর্দারদের মধ্যে গোপন আঁতাত ও চিঠিপত্রের বিনিময় ঘটে। তৎক্ষণাৎ দেখা গেল যে, পেশোয়ারী সর্দাররা নিজেদের সৈন্য সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্রসহ রণক্ষেত্র থেকে সরে পড়ল। যুদ্ধের চিত্র ভিন্নরূপ ধারন করে। সাম্মার সর্দারবৃন্দ ও তাদের সৈন্যবাহিনীর লোকের মনোবল হারিয়ে নিস্তেজ দাঁড়িয়ে যায়। ফলে লড়াইয়ের সমস্ত ভার এসে পড়ে হিন্দুস্তান থেকে হিজরতকারী মুজাহিদগণের ওপর। তারা পশ্চাদপদতা কিংবা স্থবিরতার শিকার হয় নি। তারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে প্রাণপনে যুদ্ধে লিপ্ত হল। কিন্তু সামান্য সংখ্যকের এ দলটি শত্রুদের হাতে এমনভাবে বেষ্টিত হয়ে পড়ল যে বিজয়ের কোন সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকল না। কাজেই নিজেদের অবশিষ্ট শক্তিকে সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে প্রত্যেকে কাতার ত্যাগ করে বাইরে চলে আসার চেষ্টা করল। এ মুহূর্তে আরেক ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছিল যে, ইয়ার মুহাম্মদ খানের পেশকৃত হাতি যেখানে হযরত সায়্যিদ সাহেব আরোহিত ছিলেন সেটি খোড়া পদে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হযরতকে তৎক্ষণাৎ আরেকটি ঘোড়ার ওপর সওয়ার

করিয়ে ময়দানের বাইরে একটি গ্রামের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এখানে তিনি এক সপ্তাহ পর সুস্থতা লাভ করেন।

মোট কথা এ যুদ্ধে মুজাহিদগণকে শুধু পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল তাই নয় ; বাস্তব কতগুলো সত্যও প্রতিভাত হয়ে গিয়েছিল। এ কথা তখন পরিষ্কার হল যে, সম্রাট পুজারী শ্রেণী ধর্মীয়ভাবে যাই থাকুক না কেন রণক্ষেত্রে তারা এক ও অভিন্ন মেরুর লোক। তা ছাড়া আরও জানা গেল যে, ইয়ার মুহাম্মদ খান ও খাবি খানের মত লোকেরাও সে সকল কাজ করতে পারে যা শের সিং (রাজকুমার) ও বুদ্ধ সিং (সেনাধ্যক্ষ)-এর চিন্তাধারা ও মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

তারপর থেকে পুনরায় শুরু হয় অব্যাহত লড়াই। এ সকল লড়াইয়ে বিপরীত দলে পেশোয়ারী সর্দারবৃন্দ অগ্রে অবস্থান করছে আর তাদেরই পেছনে যোগান দিয়ে চলছে শিখ সর্দার ও খালসা বাহিনীর লোকেরা। কিন্তু তাদের সম্মিলিত শক্তিগুলোর মোকাবেলায় হযরত সায়্যিদ সাহেব বিজয় অর্জন করে চললেন।

এভাবে শেষ অবধি ১০ই সফর ১২৪৫ হিজরী মোতাবেক ১১ই আগষ্ট ১৮২৯ সালে 'হিন্ড' দূর্গের ওপর আক্রমন চালান হল। খাবিখান মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হয়ে নিহত হয়। দূর্গ মুজাহিদগণের দখলে চলে আসে। খাবি খানের ভ্রাতা আমীর খান আপন ভ্রাতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ইয়ার মুহাম্মদ খানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। সেমতে ইয়ার মুহাম্মদ খান হিন্ড দূর্গের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। ১৫ই রবিউল আউয়াল হিজরী ১২৪৫ মোতাবেক ১৪ই ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে যীদার প্রান্তরে মুজাহিদদের সঙ্গে তাদের মোকাবেলা হয়। যুদ্ধে ইয়ার মুহাম্মদ খান মারা গেল। তার সৈন্যরা রণক্ষেত্র থেকে পলায়ণ করল। তারপর খাবি খানের ভাই আমীর খানও নিহত হল।

মুজাহিদ বাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। ১৮২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে তারা কোন প্রকার বাধাহীন অবস্থায় পেশোয়ার অধিকার করে। নগরবাসীরা অতিশয় আন্তরিকতা ও ভালবাসার সহিত তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে ছিল। হযরত সায়্যিদ সাহেব নগরে প্রবেশ করেই নিরাপত্তার ঘোষণা প্রদান করেন। দোকানপাট যথারীতি খোলা হল। নগরবাসীরাও নিশ্চিন্ত মনে কাজকর্ম

শুরু করল। তবে বাজারী পতিতারা গা ঢাকা দেয়। বেশ্যালয়ে বড় বড় তালা ঝুলতে থাকে। মদ্যশালা জনমানবহীন অবস্থায় নিরব হয়ে পড়ে। নিয়ম মত মানুষের মধ্যে আমল আখলাকের সংশোধনী বিভাগের কাজকর্ম চালু করা হল। তাদের মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য আদালত কায়েম করা হল। ইয়ার মুহাম্মদ খানের অপর ভ্রাতা সুলতান মুহাম্মদ খান যখন দেখলেন দেশের গোটা কায়া পরিবর্তিত হয়ে গেছে তখন তিনি 'ফয়জুল্লাহ খান ও অন্যান্য প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন লোকদেরকে সুপারিশ ধরলেন। তাদের মাধ্যমে তিনি হযরত সায়্যিদ সাহেবের কাছে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং পেশোয়ারের কর্তৃত্ব পুনঃলাভের আবেদন করেন। সায়্যিদ সাহেবের কতিপয় দূরদর্শী সঙ্গী তাকে এ আবেদন মঞ্জুর করতে অমত পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তখন হযরত সায়্যিদ সাহেব ও তার অন্যান্য সঙ্গীদের মনে এশিয়ার জন্মগত প্রকৃতি প্রভাবশালী ছিল।

در عفو لذتیست که در انتقام نیست

অর্থাৎ কাউকে ক্ষমা করার মধ্যে এমন স্বাধ নিহিত রয়েছে যা প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্যে কখনও কল্পনা করা যায় না। তাছাড়া তখন তিনি মহান আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত বাণীকে সম্মুখে রেখেছিলেন।

وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اللّٰه

বলা বাহুল্য অমুসলিম দলের ব্যাপারে যেখানে আল্লাহ পাকের এ বিধান সেখানে মুসলিম প্রতিপক্ষ এই সুবিধা ভোগের আরও বেশি উপযুক্ত। এ কারণেই সুলতান মুহাম্মদ খানের আবেদন মঞ্জুর করা হল। তাকে পেশোয়ারের হাকিম (নাযির) নিযুক্ত করা হল। এদিকে মাওলানা সায়্যিদ মাজহার আলী সাহেবকে বিচার বিভাগের জজ নিযুক্ত করা হল। এ সকল ব্যবস্থাপনার কাজকর্ম সমাধা করে হযরত সায়্যিদ সাহেব ও তার সৈন্যবাহিনী পেশোয়ার থেকে প্রত্যাবর্তন করে পাশ্চাত্যের ক্যাম্পে এসে অবস্থান করতে থাকে।

পেশোয়ার বিজয়ের প্রতিক্রিয়া

এক. হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ কর্তৃক পেশোয়ার বিজয় মহারাজ রণজিৎ সিং সরকারের পক্ষে চরম অবাঞ্ছিত একটি দুর্ঘটনারূপে বিবেচিত ছিল।

দুই. ইংরেজরা যামান শাহের আমল (১৭৯৯ খৃঃ) থেকে ইরান ও কাবুলের রাজনীতির মধ্যে হস্তক্ষেপ করে আসছিল। ১৮০৮ সালে লর্ড মিন্টুর শাসনামলে মিষ্টার এ্যালফিসিষ্টনের নেতৃত্বে বৃটিশ দূতাবাস কাবুলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করে। তাদের জন্যও পেশোয়ারের ব্যাপারটি রণজিৎ সিং অপেক্ষা কোন অংশে কম ঝুঁকিপূর্ণ ছিল না। কারণ ছিল মহারাজা রণজিৎ সিং পেশোয়ারের প্রতিবেশী হিসাবে আশংকাগ্রস্থ ছিলেন বটে তবে ইংরেজরা অস্থির ছিল এ জন্য যে, এই পেশোয়ার বিজয়ী মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণকারীদের জাল সমগ্র উত্তর ভারত ও বঙ্গদেশের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তারা একদিকে উত্তর পশ্চিমাংশে হযরত সায়্যিদ সাহেবের নেতৃত্বে পেশোয়ারে নিজস্ব সরকার গঠন করে নেয়। আর অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব অংশে সায়্যিদ সাহেবের অপর বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগী সায়্যিদ নিছার আলী তিতুমীর বঙ্গদেশেও অনুরূপ আন্দোলনের সূচনা করেন। যে আন্দোলন সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই একটি সুশৃঙ্খল বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

তিন. উপরোক্ত দুই মহাশক্তি ছাড়াও সুলতান মুহাম্মদ খান যার ওপর পেশোয়ারের কর্তৃত্ব ন্যাস্ত করা হয়েছিল তিনি সম্রাট সেবা কর্মে আপন নিহত ভ্রাতার তুলনায় কোনদিকে পিছিয়ে ছিলেন না। তিনি সীমাহীন খোশামোদ করে সায়্যিদ সাহেব থেকে সরকারের নেতৃত্ব হাসিল করেন আর অন্যদিকে রণজিৎ সিংয়ের সহিত পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ক পাকাপোক্ত করে নেন। লায়লা নামে তার কাছে একটি সুন্দর মাদী ঘোড়া ছিল। মহারাজা রণজিৎ সিং এটিকে খুবই পছন্দ করতেন। বারবার ফরমায়েশ সত্ত্বেও ঘোড়াটি তাকে দেওয়া হয় নি। পরিস্থিতি যখন এ পর্যায়ে নেমে আসে তখন সুলতান মুহাম্মদ খান নিজে মহারাজার দরবারে উপঢৌকন হিসাবে সেই মাদী ঘোড়াটি নিয়ে উপস্থিত হন। তৎসঙ্গে অন্যান্য নজর নিয়াজ তো আছেই[৩০৪]।

শিখদের নীতি অনুসারে উপঢৌকন হিসাবে মাদী ঘোড়া পেশ করা আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সর্বোচ্চ প্রতীক হিসাবে গণ্য হত। উপরন্তু মহারাজার অনেক দিনের পছন্দ ও আকাঙ্খার সেই ঘোড়া ও তৎসঙ্গে অন্যান্য নযর নিয়াজ পেশোয়ার সরকারের চরম বিনয় ও খোশামোদ বলে বিবেচিত হল।

সাম্রাজ্য অভিলাষী এহেন শক্তিগুলোর চড়াই উৎরায়ের মধ্যে একটি চালু শব্দ 'ওয়াহী'[৩০৫] কথাটির অপপ্রচার শুরু হলে মুসলিম সর্বসাধারণের মধ্যে তা যাদুর মত কাজ করে। সীমান্তের পাঠান সমাজে বহু অনৈসলামিক প্রথা রুসুম ইত্যাদি চালু ছিল। হযরত সায়্যিদ সাহেব সে সকল কুপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তার সংস্কার ও ইসলাহী কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। বিরুদ্ধবাদীরা এ সকল সংস্কারমূলক তৎপরতাকে তার 'ওহাবী' হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে থাকে। তারপর সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতির ষড়যন্ত্র দ্বারা গোপনে গোটা এলাকাকে হযরত সায়্যিদ সাহেব ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে।

এভাবে যখন মুসলমান, শিখ ও খ্রিস্ট্রান ধর্মের লোকের সম্মিলিতভাবে (আন্তর্জাতিক ঐক্য গঠনপূর্বক) সায়্যিদ সাহেবকে 'ওহাবী' হওয়ার ফতওয়া দিতে থাকল তখন অসহায় সায়্যিদ সাহেব ও গুটিকতেক সঙ্গীদের জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলার কিছুই থাকল না।

মুজাহিদীনকে ব্যাপকভাবে গণহত্যা!

সুলতান মুহাম্মদ খান সর্বপ্রথমে আঘাত হানে বিচার বিভাগের দায়িত্বশীল কাযী মাযহার আলী সাহেবের ওপর। উন্মুক্ত রাজ দরবারে তাকে এ অভিযোগের পর খুন করা হয়েছিল এজন্য যে, তারই নির্দেশে সুলতানের আপন ভ্রাতা ইয়ার মুহাম্মদ খান নিহত হয়েছিল।

সুলতান মুহাম্মদ খানের ওপর পরম অনুগ্রহকারী আরবাবে ফয়জুল্লা খান যার প্রচেষ্টা ও সুপারিশের দ্বারা সুলতানের অপরাধ মার্জনা পেয়েছিল এবং পেশোয়ারের রাজত্ব পুনঃঅর্জিত হয়েছিল–তিনি কাযী সাহেবকে অন্যায়ভাবে খুন করার প্রতিবাদ জানান। তদুত্তরে তাকেও রক্তস্নাত মৃত্যুবরণ করতে হল।

তারপর এই সুলতানের দৃষ্টি হযরত সায়্যিদ সাহেবের নিয়োজিত কর্মীদের ওপর পড়ে। হাজার হাজার কর্মীরা[৩০৬] ওশর আদায়ের কাজে সাম্মাহ অঞ্চলে নিয়োজিত ছিল। স্থানীয় লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান তাদের সকলকে এক রাতের মধ্যে খুন করে।

সন্ধ্যা বেলায় এসব কর্মীরা দেখল জনপদে প্রচুর শোরগোল চলছে। লোকেরা ঢোল পিটিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। পাহাড়ের চূড়া ও উচ্চ স্থানগুলোতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হচ্ছে। তারা কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলা হল পাঠান সমাজ এ

সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, রাতে ছুরি ও অস্ত্রসস্ত্র ধারালো হবে যেন সকালেই ইসলামী সরকারের ট্যাক্স আদায়ের কাজ সহজে সম্পন্ন করা যায়। এই হিন্দুস্তানী মুহাজির মুজাহিদগণ পাঠানদের নীতি প্রকৃতি তাদের সভ্যতা ও পরিভাষা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। তারা ভাবছেন ফসল উত্তোলনের সুবিধা করার লক্ষ্যেই তাদের এই প্রয়াস। কিন্তু রাতের অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসল তখন চকচকে খঞ্জর তাদের গ্রীবাদেশ স্পর্শ করতে শুরু করলে তারা বুঝতে পারলেন ফসল উত্তোলন ঘোষণার মর্মকথা কি ছিল।

সায়্যিদ সাহেবের মধ্যে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া

বছরের পর বছর আপ্রাণ শ্রম সাধনা ব্যয় করে তিনি ক্ষুদ্র পরিসরের একটি বাগান তৈরী করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ঘুর্নাবর্ত সে বাগানের কেবল ধ্বংস সাধনই নয় বরং মানবতার ইতিহাসে মর্মাঘাতী এক পাশবিক অধ্যায়ের রচনাও করে গিয়েছে। রাজন্যবর্গের সাধারণ নীতি অনুসারে এ অবাঞ্ছিত ঘটনার প্রতি উত্তর ছিল ইট নিক্ষেপের প্রতিবাদে পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত করা। অবশিষ্ট মুজাহিদদের শক্তি পুনঃ সংঘঠিত করে পেশোয়ার ও গোটা সাম্মাহ্ অঞ্চল নাস্তনাবুদ করে দিলেও আপত্তির কিছু থাকত না। তবে সায়্যিদ সাহেব তার শাহাদাত বরণকারী সাথীদের চেয়ে নিজেও শাহাদাতের সুরা পানে কোন অংশে কম আগ্রহী ছিলেন না। এ উদ্দেশ্যেই তার বিগত জীবন লালিত হয়ে আসছিল। তিনি সে মূহুর্তে কোন প্রকার গৃহ যুদ্ধ কিংবা নিরপরাধ লোকদের হয়রানীকে পছন্দ করলেন না। পাশ্চাত্যের ও অন্যান্য অনুগত অঞ্চলের মুজাহিদবৃন্দ তাকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি কোনই সাড়া দেন নি। উপরন্তু তিনি এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র কোথাও নিজের নতুন মারকায তৈরীর চিন্তাকেই ভাল মনে করলেন।

তার একান্ত লোকদের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে যে, তিনি সিন্ধু চলে যাবেন এবং সেখানে নিজের নতুন কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু করবেন বলে মনস্থ করেন। যাই হোক, পেশোয়ার বিজয়ের ১৬ মাস পর এবং অস্থায়ী সরকার গঠনের চার বছর চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর হিজরী ১২৪৬ সালের রজব মাসে তিনি এতদঞ্চল ত্যাগ করে চললেন। তোপ কামানগুলো একটি নিরাপদ স্থানে ভূগর্ভস্থ করেন এবং বহু যুদ্ধাস্ত্র সাজ-সরঞ্জাম স্থানীয় লোকজনকে দিয়ে

দেন। সঙ্গীদেরকে পূর্ণ অনুমতি দিয়েদিলেন যে, যার ইচ্ছা নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে। তবে সঙ্গীদের কেউ হযরত সায়্যিদ সাহেবকে ছেড়ে যাওয়া পছন্দ করে নি।

হযরত সায়্যিদ সাহেবের বাহিনী স্থান ত্যাগের পর খালসা বাহিনী পেশোয়ার ও সাম্মাহ্ অঞ্চল অধিকার করে নেয়। অধিকন্ত এই খালসা বাহিনী সায়্যিদ সাহেবের গতিরোধের জন্য তাদের পেছনে ছুটতে থাকে। কিন্তু গতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। পদে পদে খালসা বাহিনীর পরাজয় ঘটে। এভাবে মুজাহিদগণ গিয়ে পৌঁছেন বালাকোট প্রান্তরে।

প্রচণ্ড তুষারপাতের দরুন মুজাহিদ বাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হতে কষ্ট হচ্ছিল বিধায় স্থানীয় একটি নিরাপদ ময়দান তারা বেছে নেন। এখানেই অবস্থানের জন্য তাবু ফেলেন। ইত্যবসরে মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের পুত্র শের সিং সৈন্যবাহিনীসহ এখানে পৌঁছে গেল। শের সিং প্রায় ২০ হাজার সৈন্যের বিশাল দল নিয়ে কয়েক মাইলের ব্যবধানে একটি স্থানে অবস্থান করে। কিন্তু সায়্যিদ সাহেবের সৈন্যগণ পর্বতমালার এমন একটি স্থানে অবস্থান করছিলেন যেখানে আক্রমণকারীরা পৌঁছার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। আর তাদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভবও ছিল না।

এভাবে আসে মে মাস। তুষারপাত স্থগিত হল। সৈন্যদের মধ্যেও দেখা দিল স্পন্দন। শের সিং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আক্রমণের ইচ্ছা করলেও তার সৈনিকরা অগ্রসরের পথ খুঁজে পেল না। অগত্যা প্রত্যাবর্তন করতে হল। ইত্যবসরে কতিপয় গাদ্দার লোকেরা তাদেরকে একান্ত গোপন ও সরু পথটির সন্ধান দিয়ে দেয়। ফলে শের সিং আর খালসা বাহিনী নয় সাম্রাজ্যবাদের জন্য পরম বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। সায়্যিদ সাহেব ও তার বাহিনী অনুমান করার অবকাশও পান নি এভাবে খালসা বাহিনী সেখানে ঢুকে পড়ে এবং পাহারায় নিয়োজিত মুজাহিদগণকে শহীদ করে মূল সেনা ছাউনীর খুব কাছে চলে যায়। এতদসত্ত্বেও মুজাহিদদের হিম্মত অটুট। হযরত সায়্যিদ সাহেব ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈলসহ সকলে মুখোমুখী লড়াই আরম্ভ করেন। শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অত্যধিকহেতু তাদের পূর্ণ সাহসিকতা ও বীরত্ব শেষ অবধি কোন কুল করতে পারে নি। ফলে হযরত সায়্যিদ সাহেব ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হযরত

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈলসহ হাজার হাজার সৈনিক শাহাদাত বরণ করেন। আর যারা অবশিষ্ট ছিলেন তারা এভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন যে, শহীদদের কাফন-দাফন করানোর মতও কেউ ছিলেন না।

কিন্তু শের সিং সেই শহীদগণের প্রতি পূর্ণ সম্মান দেখালেন। হযরত সায়্যিদ সাহেবের মৃতদেহকে একটি মূল্যবান চাদরে আবৃত করা হল। শিখ ফৌজের মধ্যে যে সকল মুসলিম সৈনিক ছিলেন তাদের মাধ্যমে জানাযার নামায সম্পন্ন করা হল। তারপর সৈনিকতার মর্যাদায় তাদেরকে সমাধিস্থ করা হল[৩০৭]।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এ মর্মান্তিক ঘটনা ২৪শে যীকাদা হিঃ ১২৪২ মোতাবেক ১৮৩১ সালে ৭ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

শাহাদাত উত্তরকালে

এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা হযরত মাওলানা আবদুল হাই সাহেব ইন্তেকাল করলে আন্দোলন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তারপর হযরত সায়্যিদ সাহেব ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব শাহাদাত বরণের দরুন কতখানি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল তা পরিমাপ করা দুষ্কর এতদসত্ত্বেও সেই আন্দোলনের অবশিষ্ট প্রাণশক্তি সম্পর্কে ডঃ হান্টার বলেন ঃ

এ আন্দোলন তার কোন নেতা বেঁচে থাকা কিংবা শহীদ হওয়ার ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছে। স্বয়ং সায়্যিদ সাহেবের ওফাতের ঘটনাকেও আন্দোলনের কর্মীরা নিজেদের ধর্মীয় প্রচার কার্যের একটি পবিত্র উপকরণে পরিণত করেছে[৩০৮]।

তারপর সায়্যিদ সাহেবের পরিবার-পরিজন ও মুহাজিদগণের কতিপয় টুংক সরকারের গভর্নর নওয়াব উযীরুদ্দৌলার আমন্ত্রণে টুংক গমন করেন। তাদের অবশিষ্ট জীবন সেখানেই অতিবাহিত হয়। সংগ্রামী যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একমাত্র আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীতে তারা পরবর্তী জীবন মশগুল থাকেন। আর অবশিষ্ট মুজাহিদগণ পুনরায় সংঘঠিত হয়ে সিতানার সীমান্ত অঞ্চলে নিজেদের মারকায তৈরি করেন। তারা হযরত সায়্যিদ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা নাসীরুদ্দীন সাহেবকে নিজেদের নেতা নির্বাচনপূর্বক পুরাতন আন্দোলনকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন[৩০৯]। খালসা বাহিনীর সরকার তো পরবর্তী কয়েক বছরের মাথায় বিশ্ব মানচিত্র থেকে হারিয়ে যায়। তবে তাদের প্রভূ ইংরেজ সরকারের জন্য সিতানা কেন্দ্রিক এ আন্দোলন পরবর্তী

অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত মাথা ব্যথার কারণ হয়ে অবশিষ্ট থাকে। বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ পরবর্তী খন্ডে পেশ করা হবে।

পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গন

সায়্যিদ মাওলানা নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের বিদ্রোহ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলীয় রণাঙ্গন সম্পর্কীয় ঘটনা প্রবাহের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করেন সরাসরিভাবে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ। কিন্তু বঙ্গদেশের কয়েকটি অঞ্চল যেখানে সায়্যিদ সাহেব তার হজ্জ সফরে এবং হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে দীর্ঘ দুই মাস অবস্থানপূর্বক স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন সেগুলো এ কালে ঘুমিয়ে থাকতে পারে নি। হযরতের বপনকৃত বীজ যথাসময়ে অংকুরিত হল। সেমতে যেকালে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে তিনি ক্রম অগ্রসর হতে থাকলেন সেকালে ভারতবর্ষের অপর প্রান্তে সায়্যিদ নিসার আলী তিতুমীর কলিকাতা জেলার উত্তর পশ্চিম দিক থেকে সফর শুরু করেন। তারপর বিশেষ যে মূহুর্তে সায়্যিদ সাহেব পেশোয়ার জয় করেছিলেন সে মূহুর্তে মাওলানা নিসার আলী বঙ্গদেশে জিহাদের পতাকা উড্ডীন করেন। সায়্যিদ নিসার আলী সাহেব ও তার দক্ষিণহস্ত মিসকিন শাহ কয়েক মাস পর্যন্ত পূর্ণ সফলতার সহিত অভিযান চালিয়ে গেলেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে স্থানীয় সকল কৃষকও চাষীরা তাকে সহযোগিতা করে। গোটা ফরিদপুর অঞ্চলে তিনি নিজের সরকারও প্রতিষ্ঠা করে নেন। কিন্তু ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে তিতুমীরকে ইংরেজ সাঁজোয়া বাহিনীর মোকাবেলা করতে হল। ফলে তিনি শহীদ হন। তার সহযোগী মিসকিন শাহকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। এভাবে অবশিষ্ট শক্তি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

দূর্ভাগ্যক্রমে জমিদার শ্রেণীর লোকেরা তার সাহায্য করা থেকে বিরত ছিল। বিশেষতঃ স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ। এমন কি তাদের একজন তো সেসব মানুষের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে দিয়েছিল যারা সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। অধিকন্তু এ নতুন ট্যাক্সকে দাঁড়ি রাখার কারণে আরোপিত ট্যাক্স নামকরণ করে[৩১০] ব্যাপারটিকে আরও অধিক মাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়েছিল। ইংরেজ জাতি এ কূটকৌশল প্রয়োগ দ্বারা নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণের উত্তম

সুযোগ পেয়ে গেল। তারা অতি সহজেই বলেছিল যে, তিতুমীরের বিদ্রোহ ঘোষণার মূল কারণ হল কতিপয় হিন্দু জমিদারদের[৩১১] অনর্থক বাড়াবাড়ি। তারা সাধারণ কৃষক শ্রেণীর ওপর এ বাড়াবাড়িমূলক ট্যাক্স আরোপ করেছিল[৩১২]।

সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি তুচ্ছ কোন সুযোগকেও ইংরেজরা অবহেলা করতে চাইত না। নিসার আলী সাহেবের লোকেরা যদি নিজেদের একান্ত আহারের প্রয়োজনে কোথাও গরু যবাই করেছিল সেটি নিয়েও প্রপাগাণ্ডা করা হত যে, এ যবাইয়ের উদ্দেশ্য হল প্রতিবেশী হিন্দু শ্রেণীকে অপমানিত করা[৩১৩]।

মোট কথা স্থানীয় জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ ইংরেজদের উদ্দেশ্য সাধনের পথকে কণ্টকমুক্ত করে দেয়। এভাবে পশ্চিম সীমান্তে হযরত সায়্যিদ সাহেবের শাহাদাত বরণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব সীমান্তের এ আন্দোলনও ভূগর্ভে দাফন হয়ে যায়।

টীকা

২৯৯. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ।

৩০০. রওশন মুস্তাকবিল।

৩০১. জনাব গোলাম রাসূল মিহির সাহেব তার সায়্যিদ আহমদ শহীদ গ্রন্থে তাদের নামগুলোও উল্লেখ করেছেন।

৩০২. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ।

৩০৩. আদ দূররুল মানসুর ফী আহওয়ালি সাদিকপুর।

৩০৪. সাওয়ানিহে আহমদী।

৩০৫. শায়খ আবদুল ওয়াহহাব নজদী-এর অনুসারীদেরকে ওহাবী বলা হত। এ দলের কতিপয় লোক যেহেতু মুসলিম সমাজের সাধারণ শ্রদ্ধানুভূতির বিপরীতে মদীনা শরীফে কিছু বেয়াদবীমূলক আচরণ করেছিল। ফলে তাদের গোটা দলের দুর্নাম ঘটে এবং মুসলিম দেশগুলোতে তাদের প্রতি ঘৃণাবোধ ছড়িয়ে পড়ে।

৩০৬. কথিত আছে তাদের সংখ্যা ছিল চার হাজারের মত। মোট কথা সংখ্যা নির্ধারণে কিছু কম বেশি হতে পারে। তবে কোন সন্দেহ নেই যে, তদের সকলেই ছিলেন পরম বীরত্ব ও সাহসিকতার অধিকারী। নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে তারা ছিলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ ধরনের একজন সৈনিকও সাধারণ হাজার সংখ্যক অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

৩০৭. সাওয়ানিহে আহমদী, পৃঃ ১৭৯, বিস্তারিত জানার জন্য গোলাম রাসূল মেহের প্রণীত সায়্যিদ আহমদ শহীদ গ্রন্থ লক্ষণীয়।

৩০৮. হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ ৩৪।

৩০৯. সাওয়ানিহে আহমদী পৃঃ ১৮০। ভিন্নমতে তখন মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম পানিপথীকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল। অতঃপর হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেলভীর জামাতা মাওলানা নাসীরুদ্দীন দেহলভী দিল্লী থেকে পরবর্তীকালে সিতানা গিয়ে পৌঁছলে তাকেই তখন আমীর নিযুক্ত করা হয়।

৩১০. তদন্ত কর্মকর্তা মিষ্টার জেমস আউক্যানলী বলেন, ১৮৩১ সালের জুন মাসের ঘটনা। বুরনা গ্রামের কৃষ্ণরায় জমিদারের নির্যাতনমূলক আচরণের দরুন এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। তিনি তার ওহাবী নামে কথিত মুসলিম প্রজাদের উপর আড়াই টাকার একটি কর আরোপ করেন। পরিস্থিতি আরও অধিক উত্তপ্ত করার উদ্দেশ্যে এটিকে দাঁড়ি রাখার কর নামে অভিহিত করেন। নিজস্ব এলাকায় তার এ কর আদায়ে কোন বিঘ্নতার সম্মুখীন হতে হয় নি। কিন্তু তার পাইক-পেয়াদারা পার্শ্ববর্তী মৌজা সারফরাজপুর গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে সেখানে সায়্যিদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের ভক্তরা উপস্থিত ছিলেন। তারা এ সকল কর আদায়কারী পাইক-পেয়াদাদেরকে গ্রেফতার করেন। জমিদার কৃষ্ণ রায়ের কানে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি দু'তিন শত মানুষের একটি বিরাট দল পাঠিয়ে দেন। মুসলমানদের সাথে তাদের মোকাবেলা হল। তারা এ মুসলমানদের মাল সামানা লুটে নেয়, তাদের বাড়ি ঘর ভেঙ্গেচুরে ফেলে মসজিদগুলো জ্বালিয়ে দেয়। থানা কর্তৃপক্ষ

ইংরেজদের ওপর বিষয়টির তদন্ত করার দায়িত্ব অর্পিত হলে তারা উল্টো মুসলমানদেরকে অভিযুক্ত করে বলেন যে, তারা নিজেরাই নিজেদের বাড়িঘর ও মসজিদসমূহে আগুন লাগিয়েছিল। উভয় পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাবী উত্থিত হল। থানা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সুরাহা ব্যতিরেকে এভাবেই ফেলে রাখে। অবশেষে মামলা খারিজ করে দেয়। (অর্থাৎ উভয় পক্ষের লোকেরা নিজেদের মধ্যে আপোষ করে নিলে মামলা পরিচালনার কেউ অবশিষ্ট থাকে নি বিধায় বিষয়টি নিজ থেকে খারিজ হয়ে গেল)। কিন্তু মুসলমানরা দারোগার আচরণে দারুন ক্ষুব্ধ হন। ফলে এক সময় তাকে হত্যা করেন। এরপর কৃষ্ণরায় জমিদার সুযোগ মত নিজের অবশিষ্ট মুসলিম প্রজাদের উপর ভারী অংকের কর আরোপসহ তা শক্ত হাতে উসুল করতে থাকেন। বহু মুসলমানকে তিনি ধরিয়ে গ্রেফতারও করিয়ে দেন। নিরীহ মুসলমানরা আপীল করার জন্য কলিকাতা গেল কিন্তু সেখানে জজ সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। (কলিকাতা রিভিউ, ১৮৭০, খঃ ১৫, পৃ ১৭৯ জুলাই ১৮৭০ খৃঃ, রওশন মস্তাকবিল, পৃঃ ১১৭-এর অনুসরণে।

৩১১. অথচ এ ঘটনার সাথে হিন্দু-মুসলিমের কোন প্রশ্ন আদৌ ছিল না। মুসলমান জমিদারদের পক্ষ থেকেও এ ধরনের আচরণ ঘটত। যেমন জনৈক মুসলিম জমিদার হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের এক ভক্তকে নিজের প্রাইভেট কারাগারে বন্দী করেছিল। কারণ ছিল যে, লোকটি এক তাজিয়্যার অবমাননা করেছিল। (হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ ৬৮)।

৩১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮।

৩১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।

ওহাবী শব্দের মর্মকথা ও এ প্রপাগাণ্ডার উৎস

হিন্দুস্থানে প্রচলিত ভাষাসমূহের কোন অভিধানে 'ওহাবী' শব্দটির অস্তিত্ব ইতিপূর্বে ছিল না। খ্রিস্টিয় উনবিংশ শতাব্দীতে এ শব্দটি অভিধানের অন্তর্ভূক্ত হয়। তারপর এই একটি ধর্মীয় শব্দের প্রচলন দ্বারা এত বিশাল রাজনৈতিক হীন স্বার্থ চরিতার্থ করা হয়েছিল যা লক্ষ নয় বরং কোটি কোটি টাকা ও সৈন্য সামন্ত ব্যয় করার দ্বারাও অর্জিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা হল মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের অনুসারীবৃন্দ। কিন্তু এ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব কে ছিলেন ? তার অনুসারীদের কি অপরাধ ছিল সেটি জানার জন্য কিছু বিস্তারিত বক্তব্য লক্ষণীয়।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব[৩১৪]

তিনি ছিলেন আরবের নজদ অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট আলিম[৩১৫]। তার ইখলাস ও নিঃস্বার্থতার ওপর কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করা দুষ্কর ব্যাপার। তবে তার দাওয়াত ও কর্মনীতির মধ্যে কঠোরতা ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। আর এ কঠোরতা রক্ষা করতে গিয়ে তিনি চতুর্দিকের ভারসাম্য রক্ষায় কিছুটা ত্রুটি করে ফেলেছিলেন। নজদের জনৈক আমীর অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে সাউদ তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করে এবং তাঁর সংস্কার ও ইসলাহী আন্দোলনের সর্বাত্মক সহযোগিতায় বরং দক্ষিণ হস্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

নজদ অঞ্চলের অনুন্নত সুবাগুলো নানা রকম রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার এক আবর্তনস্থল হিসাবে পরিণত ছিল। এক একটি গ্রাম কিংবা জনপদের জন্য এক একজন শাসক বরং কোথাও এক গ্রামের জন্য একাধিক শাসকবৃন্দ ছিলেন। আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব যিনি তদানিন্তন যুগের প্রেক্ষিত অনুসারী অতি প্রয়োজনীয় এক সর্বাত্মক সংস্কার আন্দোলনের দাবী নিয়ে দন্ডায়মান হয়েছিলেন। তিনি আপন আন্দোলনের সফলতা বিধানের স্বার্থে সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে নিজকে সংযুক্ত রাখার প্রয়োজনবোধ করেন। তার ইচ্ছা ছিল স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকারগুলোকে একই গ্রন্থির মধ্যে সাজিয়ে একটি

শক্তিশালী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সমগ্র দেশের ওপর সুষ্ঠু নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা। যেন তার ইসলাহ ও সংস্কার আন্দোলন সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। কিন্তু রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি তার সংস্কারের মূল আন্দোলনেও অস্থিরতার উদ্রেক করে দেয়।

কথিত মুহাম্মদ ইবনে সাউদ ছিলেন নজদের উত্তরাঞ্চলীয় ক্ষুদ্র একটি জনপদের আমীর। দাওয়াত ও ইসলাহী কর্মতৎপরতার প্রেরণা তার সুবিশাল ও সৎসাহসী হৃদয়ে এক নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি করে। ফলে ক্ষুদ্র পরিসরের সীমানা ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি গিয়ে পতিত হয় প্রতিবেশী সরকারগুলোর সুবিস্তৃত পরিমন্ডলে।

সেমতে শায়খের মুরীদ ও ভক্তদের অনেকেই আমীর মুহাম্মদ ইবনে সাউদের পতাকাতলে জমায়েত হল। তাদের কারণে আমীরের জনবল প্রতিবেশী অন্যান্য রঈসদের তুলনায় অনেকগুণে বেড়ে যায়। কর্তৃত্ব পরিচালনা করেন ইবন সাউদ কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তাধারা ইত্যাদির পথ নির্দেশ দানের মহান দায়িত্বে থাকলেন তাঁর পীর শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব। উভয়ের ঐক্যবদ্ধ চিন্তা-চেতনা ও সমন্বিত কর্মতৎপরতার বরকত তথা সুন্দর সুফল খুব দ্রুত প্রকাশিত হতে থাকে। প্রতিবেশী অঞ্চলগুলো চিন্তাধারা, রীতি-নীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'দারিয়ার' রঙ্গে রঙ্গিন হতে শুরু করে। অবশেষে হিজরী ১১৫৯ সাল মোতাবেক ১৭৪৬ খ্রিঃ শায়খের এ অনুসারীগণ নাজদের কেন্দ্রীয় ভূখন্ড রিয়াদ জয় করেন। রাজকীয় প্রাসাদের ওপর ইবনে সাউদের পতাকা উড়তে থাকে। এভাবে এক কালের অনুন্নত নজদের রাজশক্তি এতখানি বলিষ্ঠতা অর্জন করে যে, উন্নত তুর্কী সুবাগুলোর ওপরও তাদের অভিযান অব্যাহত থাকে।

হিজাযে রয়েছে মক্কা ও মদীনার পবিত্র ভূখন্ড। মুসলিম বিশ্বের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র। ওহাবীগণও এ ভূখন্ডদ্বয়কে নিজেদের কেন্দ্রস্থল বলে জ্ঞান করে থাকে। কাজেই এ হিজায তাদের প্রতিবেশী হওয়ার কারণে এবং পবিত্র স্থানদ্বয়ের কেন্দ্রীয় মর্যাদার কারণে আন্দোলনের কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তবে হারাম শরীফে অবস্থিত অলিমগণ তাদেরকে সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। উপরন্তু আলিমগণ মক্কার তদানিন্তন গভর্নরের সরকারি কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তার সাথে আলোচনা করেন। ফলে হিজরী ১১৬২ মোতাবেক ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে

গভর্নর নজদীদেরকে পবিত্র মক্কায় প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেন। এভাবে নজদীরা হজ্জের ফরজ হুকুম আদায়ে বঞ্চিত হয়ে গেল।

নজদী কূটনৈতিক নেতৃবৃন্দ হিজাযে গমনের অধিকার পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইরাকের রাস্তায় এসে জমায়েত হল। ইরাকের পথে হিজাযে গননেচ্ছুক কাফেলা-গুলোর ওপর মারপিট ও লুণ্ঠন চালিয়ে হিজায কর্তৃপক্ষের ওপর অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থতা চালানোর চেষ্টা করে। তারা হারাম শরীফের খেদমতে জড়িত কর্তৃপক্ষের ওপর অস্ত্রের আঘাত করাকে উচিৎ না মনে করে অর্থনৈতিকভাবে আক্রমণের পথ বেছে নেয়। তাদের এ কর্মকাণ্ডের দরুন বাস্তবভাবেও হিজায কর্তৃপক্ষ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবে নজদীগণ নিজেরাও খুব সফলতা অর্জন করেছিল তা নয়। কারণ তাদের এ কার্যকলাপের দরুন ইরাক তাদের মোকা-বেলায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হল। উভয়ের মধ্যে শুরু হয় শক্তি পরীক্ষা। পরিণামে নজদীগণই বিজয় লাভ করেন। তারা শক্তির জবাবে শক্তি প্রদর্শন করেন।

মুহাম্মদ ইবনে সাউদের ওফাত ও আবদুল আযীযের নেতৃত্ব লাভ

মুহাম্মদ ইবনে সাউদের পুত্র 'আবদুল আযীয' তার পিতার চেয়েও শায়খের প্রতি বেশি ভক্তিশীল ছিলেন। শায়খের কোমল তত্বাবধানেই তিনি শৈশব থেকে পরিণত জীবনে পৌঁছেছেন। ১১৭৯/১৭৬৫ সালে পিতা মুহাম্মদ ইবনে সাউদ ইন্তেকাল করলে দক্ষ ও সুযোগ্য পুত্র আবদুল আযীযের ওপর দেশের কর্তৃত্বভার অর্পিত হল। তিনি দেশ বিজয়ের ক্ষেত্রে যেমন পিতার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিলেন তেমনি শায়খের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণেও ছিলেন অধিক অগ্রগামী। শায়খের নির্দেশের বাইরে তিনি একটি কদম কিংবা একটি পয়সা ব্যয় করতেন না। হিজাযের সঙ্গে তিনি সন্ধি সুলভ আচরণে এগিয়ে যান। মক্কার গভর্নরের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ পূর্বক নজদীদের হিজাযে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। গভর্নরের সহিত হেরেমে অবস্থিত আলেমদের বহু তর্ক বাহাস চলে। অবশেষে ফলাফল নজদীদের পক্ষে ঘোষিত হয়। এভাবে তারা পুনরায় পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ ও হজ্জ পালনের অনুমতি অর্জন করে।

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের ওয়াত

প্রায় ৯০ বছর বয়সে ১২০৬/১৭৯২ সালে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ইন্তেকাল করেন। তার এ ৫০ বছর যাবৎ দাওয়াত ও তাবলীগের

আন্দোলন অব্যাহত রাখার দ্বারা তার চিন্তা-চেতনা তখন সাউদ সরকারের চিন্তা-চেতনায় পর্যবসিত হয়। তখন সাউদ পরিবারের সরকার ও ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের চিন্তাধারা অভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে দু'টি বাহু হিসাবে বিবেচিত হল। আবদুল আযীযের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সচেতনতা এবং নিজ শায়খের প্রতি তার সীমাহীন ভক্তিশ্রদ্ধা শায়খের চিন্তাধারাকে সুশোভিত করে তুলল।

হিজাযের উপত্যকায় বাসী খাবার পুনরায় তিক্ততার উদ্রেক করে। নজদীদের কঠোর নীতির দরুন আলিমগণ পুনরায় হিজাযের গভর্নরের স্মরণাপন্ন হলে তিনি তাদের প্রবেশাধিকারের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করলেন। এদিকে তাদের কাছে সরকারকে অর্থনৈতিকভাবে সংকটগ্রস্থ করার পদ্ধতি ইতিপূর্বেই রপ্ত করা ছিল.। তারা পূর্বের পাঠ আবার নতুনভাবে কার্যকরী করতে শুরু করল। অর্থাৎ ইরাক ও ইরানের পথে আগত কাফেলার ওপর নির্যাতন শুরু হল। তবে এবারে তাদের বিপর্যয়ের এ অত্যাচার মধ্য ইরাক থেকে ইরানের ভূখন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত আকার ধারন করে। ১২১৬/১৮০৬ সালে কারবালায়ে মুআল্লা, নজফে আশরাফ, বালাদুল হোসাইন প্রভৃতি স্থানের ওপর তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গোলযোগ চালায়। স্থানীয় লোকজনকে মারপিট ও লুটপাট করে। তাদের সমূদয় কোষাগার লুণ্ঠন করে নিজেদের সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়। এমনকি স্থানীয় পবিত্র কবর সমূহেরও অবমাননা করেছিল।

নজদী যোদ্ধাদের যে দলটি ইরাক থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল সেটি নতুনভাবে হিজাযের অভিমুখে যাত্রা করে। ১২১৭/১৮০৩ সালের শেষ দিকে আবদুল আযীযের উত্তরসূরী সাউদ ইবনে আবদুল আযীয নজদীদের শক্তিশালী একটি বাহিনী নিয়ে পবিত্র মক্কার খুব কাছাকাছি পর্যন্ত অগ্রসর হয়। যুদ্ধে মক্কা শরীফের গভর্নর যদিও জয়লাভ করেছিলেন তবে নামে মাত্র। বাধ্য হয়ে তাকে পলায়ন করে তায়িফ গিয়ে আশ্রয় নিতে হল। তারপর সেখান থেকে জেদ্দা গিয়ে তুর্কী বাহিনীর নিরাপত্তাধীনে আশ্রয় নেন।

৮ই মুহাররম ১৩১৮ হিজরী মোতাবেক ৩০শে এপ্রিল ১৮০৩ সালে ইবনে আবদুল আযীয মক্কা শরীফ জয় করেন। পবিত্র কাবা শরীফের অভ্যন্তরে রক্ষিত যাবতীয় হীরা মনি-মুক্তা জাওহারের ভান্ডার বের করে আনে এবং সবগুলো নিজ সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করে দেয়। গুম্বুজগুলোকে মিসমার করে দেওয়া হল,

মাযারগুলোর অবমাননা করা হল। তবে নিরীহ বাসিন্দাদের কোন ক্ষতি করা হয় নি। তাদের সাথে নজদীগণ ভদ্রজনচিৎ ব্যবহার বজায় রাভে। সেমতে পরবর্তী দিবসে হাট বাজার যথারীতি চালু হয়। লোকজন নিজ নিজ কাজকর্মে যোগদান করে।

পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১২১৯/১৮০৪ সালে মদীনা শরীফ বিজিত হয়। এখানেও তারা মক্কা শরীফের ন্যায় আচরণ করে যায়। মদীনার রওজা শরীফ খুলে স্বর্ণ-রৌপ্য ও নগদ অর্থ কড়ির সব কিছু লশকরদের মধ্যে বণ্টন করে। গড়ে উঠা অন্যান্য মাযারগুলোকে ধ্বংস করে দেয়।

আবদুল আযীযের ওয়াত

মদীনা বিজয়ের কয়েক মাস আগে আবদুল আযীয ইন্তেকাল করেন। ১৮ই রজব ১২১৮ হিঃ মোতাবেক ৪ঠা নভেম্বর ১৮০৩ খৃঃ তারিখে আবদুল আযীয অভ্যাসমত মসজিদে আছরের নামাযের ইমামত করছিলেন। ইত্যবসরে দরবেশ আকৃতির জনৈক ব্যক্তি যে আবদুল আযীযের গৃহে অতিথি হিসাবে এসেছিল সে পেছনের দিক থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে খঞ্জরের আঘাত হানে। ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এ দরবেশ আকৃতির লোকটি ছিল ইরানের জনৈক শিয়াপন্থী লোক। তার কয়েকজন পুত্র নজদীদের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। অবশেষে আবদুল আযীযের ধড়ফড়কৃত শবদেহ তার ক্রোধ নিবারণ করেছিল।

আবদুল আযীযের শাহাদাতের পর তার পুত্র সাউদ সিংহাসনে আরোহন করেন। পিতার মৃত্যুর পূর্বেই তার হাতে বাইয়াত গ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

সাউদ তার পূর্ব পুরুষদের উপযুক্ত উত্তরসূরী ছিলেন। ধর্মীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে অটল ও অনড় ছিলেন তেমনি রাজনৈতিক উচ্চ প্রজ্ঞা প্রদর্শনেও তিনি সচেষ্ট ও সফল ছিলেন। তার পুত্র ছিল আবদুল্লাহ। আমীরের সহযোগী হিসাবে তিনি অভিযান বিষয়ক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। এভাবে তারা সমগ্র হিজাযকে করতল করে খায়বার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অপরদিকে বাহরাইন, আম্মান ও রাসুল খিমা পর্যন্ত তাদের রাজত্ব বিস্তার লাভ করে।

ঘৃনাবোধের উদ্রেক

বলা আবশ্যক যে, কারবালায়ে মুআল্লা, নজফে আশরাফ ও বালাদুল হোসাইন শহরে নজদীগণ যে সব কর্মকান্ড চালিয়ে ছিল তাতে শীয়া জগত তাদের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠে। আর মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের ওপর পরিচালিত আচরণ তাদেরকে অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বের নজরেও হেয় করে দেয়। সকলের মনে তখন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের অনুসারীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের আগুন তীব্রভাবে জ্বলে উঠে।

কাটা ঘায়ের ওপর লবণের ছিটার ন্যায় আরও ঘটনা ঘটেছিল যে, সে কালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গেও নজদীরা এক পর্যায়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কারণ ছিল যে, পারস্য উপসাগরের জাওয়াযিম গোত্রীয় লোকেরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর আক্রমণ করেছিল। এলাকাটি ছিল সাউদী সরকারের শাসনাধীন। ইংরেজদের দৃষ্টি তখনও ইরান ও ইরাকের ওপরই নিবন্ধিত ছিল। ইত্যবসরে তরুণ নজদী সরকার তাকে খোচা দেয়। ইংরেজরা আক্রমণ চালানোর সুন্দর বাহানা পেয়ে গেল। সেমতে বোম্বাই সরকার ১৮০৯ সালের সেপ্টেম্বরে (রমজান ১২২৪ হিঃ) রাসূল খিমা এলাকায় প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। তাতে নজদীদের সকল প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে গেল। নভেম্বরের শেষ অবধি ইংরেজ সৈন্যরা রাসূল খিমা পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

নজদ সরকার ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বর্ণিত সংঘর্ষের পরিণাম কেবল রাসূল খিমা জ্বালিয়ে ভস্ম করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না। সবচেয়ে দুঃখজনক পরিণাম যা ঘটে তা ছিল তখন থেকে নজদ সরকারের বিপরীতে এমন এক মহাশক্তি এসে দাঁড়াল যারা বিশ্বজুড়ে প্রপাগান্ডা চালানোর কাজে শীর্ষ ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত। যাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই ছিল এশিয়ার মান ক্ষুন্ন করা এবং ইউরোপের মোকাবেলায় এশিয়াকে হেয় ও অপদস্ত প্রমাণ করা। জিব্রালটার ও ওয়াশিংটন থেকে সুদূর হংকং ও সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাদের ষড়যন্ত্র পরিচালনার জাল সুন্দরভাবে বিছানো অবস্থায় ছিল।

বাবে আলী ও নজদ সরকার

স্থানীয়ভাবে নজদ ও হিজাযের মধ্যে টানাপোড়ন সীমাবদ্ধ থাকা পর্যন্ত তুরস্কের বাবে আলী[৩০৬] (উচ্চ পরিষদ) সে দিকে কোন মনোযোগ দেয় নি। কিন্তু

যখন ইরাক, সিরিয়া ও ইয়ামন দেশগুলোও নজদী স্রোতে প্লাবিত হতে শুরু করল তখন বাবে আলী এদিকে দৃষ্টিপাত করে। খাদিউ মিসর মুহাম্মদ আলী পাশা তুর্কী গভর্নরবৃন্দের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ও নায়িবুস সালতানাত ছিলেন। নজদীদেরকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য বাবে আলী এই মুহাম্মদ আলী পাশাকেই দায়িত্ব অর্পন করে। পাশা নিজেও তার মিশর সরকারের পরিধি বিস্তৃতির লক্ষ্যে এ ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং নির্দেশ মাত্রই তিনি কর্মসম্পদানে প্রস্তুত হন।

মিশরীয়দের আক্রমণ

মুহাম্মদ আলী পাশা তার নিজ পুত্র ও প্রতিনিধি 'তুসুন' কে দশ হাজার সৈন্যের একটি দলসহ হিজায প্রেরণ করলেন। ১২২৬/১৮১১ সালের শেষ দিকে এ বাহিনী সৈকত অঞ্চলে অবতরণ করে। তারপর অতি সহজেই 'ইয়াম্বু' অধিকার করে নেয়। তারপর সেখান থেকে মদীনা শরীফের দিকে তারা অগ্রসর হতে থাকে। ১২২৭ হিজরীর যীকাদা মোতাবেক ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে এ বাহিনী মদীনা পুনর্দখল করে নেয়। তারপর প্রায় দেড় মাসের ভিতরই (মুহাররম, ১২২৮ জানুয়ারি ১৮১৩) পবিত্র মক্কা নগরীর ওপর নিজেদের পতাকা উড্ডীন করতে সক্ষম হয়।

মক্কা শরীফ পুনর্দখলের পরে নজদীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ প্রচণ্ড আকার ধারন করেছিল। দু' একটি রণক্ষেত্রে মিশরীয় সৈন্যগণ পরাজিত হলে মুহাম্মদ আলী পাশা নিজেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সাউদ ইবনে আবদুল আযীযের ওফাত

উভয় পক্ষে জয় পরাজয়ের যখন পালাক্রম চলছিল সে মূহুর্তে ১১ই জুমাদাল উলা ১২২৯ হিঃ মোতাবেক ১লা মে ১৮১৪ খৃঃ নজদের বাদশাহ সাউদ ইবনে আবদুল আযীয ইহলোক ত্যাগ করেন। পুত্র আবদুল্লাহ পূর্ব থেকেই নাযির হিসাবে কাজ করে আসছিলেন। বর্তমানে তারই ওপর সালতানাতের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হল। তিনি দক্ষ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন বটে তবে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বদানে দক্ষ ছিলেন না। অথচ তৎকালের পরিস্থিতি অনুসারে দূরদর্শিতা ও সজাগ মস্তিষ্কের আবশ্যকতা ছিল। তিনি ছিলেন সেই বিশেষণ থেকে বঞ্চিত ফলতঃ লড়াই

অব্যাহত থাকে। কোথাও কোথাও বিজয় অর্জিতও হয়। কিন্তু ঘূর্নায়মান পরিস্থিতিতে সাহস হারা হয়ে অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করেন। প্রতিপক্ষের কাছে এ প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। ইত্যবসরে রাজপুত্র 'তুসুন' মিশর প্রত্যাবর্তন করেন। তার এক বছর পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। পরবর্তী বছর মুহাম্মদ আলী পাশা নিজের অপর পুত্র ইবরাহীম পাশাকে অভিযানের জন্য প্রেরণ করেন। ৬ই যীকাদা ১২৩১ হিঃ (২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮১৬ খৃঃ) বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ 'ইয়াম্বু' অবতরণ করেন। নজদের সমর শক্তি তুর্কীদের মোকাবেলায় অতিশয় দুর্বল ছিল। পরাজয় তাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সমূহ দুর্বলতা নিয়েও তারা আরও দু' বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৭ই যীকাদা ১২৩৩ হিজরী মোতাবেক ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮১৮ খৃঃ তাদের পূর্ণ পরাজয় ঘটে। তুর্কী সৈন্যগণ নজদ বাহিনীর কেন্দ্রস্থল 'দারিয়া' ছিনিয়ে নেয়। হাজার মানুষের জীবন সংহারিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের গোটা বংশ নিপাত করা হল। কেবল গুটিকয়েক এমন ব্যক্তিরাই প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল যারা সে মূহুর্তে দারিয়া নগরে উপস্থিত ছিল না। বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবনে সাউদ আত্মসমর্পনে বাধ্য হন। দু'দিন পর্যন্ত তাকে কারারুদ্ধ রাখার পর মিশর পাঠিয়ে দেওয়া হল। ১৯শে মুহাররম ১২৪৩ হিঃ তারিখে তাকে 'ইস্কানদারিয়া' তারপর 'আস্তানায়' পাঠানো হল। আবদুল্লাহর জন্য মৃত্যু এখানে অপেক্ষা করছিল। অবশেষে ১৭ই ডিসেম্বর ১৮১৮ খৃঃ ১৮ই সফর ১২৩৪ হিঃ তাকে ও তার সাথীকে 'আবা সুফিয়া'-এর চত্বরে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হল[৩১৭]।

মক্কা মুআজ্জমা ও মদীনা তাইয়েবার লোকজন পূর্ব থেকেই অপেক্ষমান ছিলেন। নজদীদের কেন্দ্রীয় শক্তি নির্মূল হওয়ার পর হিজায ভূখন্ড থেকে তাদের নাম নিশানা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল। কোন নজদী কেন, তাদের নামটুকু উল্লেখ করার মতও কেউ অবশিষ্ট ছিল না। মিস্টার হান্টার বলেন ঃ

এ মহা শক্তিধর সাম্রাজ্য যা অত্যাশ্চর্য পদ্ধতিতে দৃষ্টি সমক্ষে স্থান করে নিয়েছিল সেটি আবার একই পদ্ধতিতে বালির টিলার ন্যায় ভুতলে অদৃশ্য হয়ে গেছে[৩১৮]।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত এবং এখনও কোন সন্দেহের অবকাশ পর্যন্ত নেই যে, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে নজদ সরকার পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর মক্কা

মুআযযমা ও মদীনা তাইয়েবায় নজদবাসীদের প্রতি এই ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে থাকে যে, তাদের নামটুকুর উল্লেখ করাকেও কেউ পছন্দ করত না।

তার এ কথাও অনস্বীকার্য যে, হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ এরই চার বছর পরে হজ্জের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন। স্বয়ং হান্টারও স্বীকার করেছেন যে, সায়্যিদ সাহেব খ্রিস্টিয় ১৮২২-২৩ সালে হজ্জের সফর করেন। বলা আবশ্যক যে, এ চার বছর পর্যন্ত নজদীদের সম্পর্কীয় যাবতীয় ঘটনাবলি সম্পূর্ণ তাজা থাকার কথা। চার বছরের সামান্য ব্যবধানে দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত ঘৃণাবোধে কোনই পরিবর্তন আসাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া যায় না। অথচ হযরত সায়্যিদ সাহেবের ওপর যে আপত্তি আরোপ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে স্বয়ং এ হান্টারের বক্তব্য একটু বিবেচনা করুন।

প্রপাগান্ডা

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার লিখেছেন ঃ ১৮২২-২৩ সালে ইমাম সাহেবের মক্কা শরীফ গমনের পর থেকে এই সর্বজন বোদ্ধ সংস্কারমূলক আকীদার বিস্তার সাধন করা হয় এবং যথারীতিতে বিন্যস্ত করা হয়। তিনি মক্কার পবিত্র নগরীতে একটি সংস্কার আন্দোলনের সূচনা দেখে আসছিলেন যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন গ্রাম্য বেদুঈন, যিনি ত্যাগ, ন্যায়, আকীদা ও বিশ্বাস পোষণ করতেন[৩১৯]।

প্রবাদ বাক্যে বলা আছে যে, মিথ্যাবাদী লোকদের লজ্জা থাকে না। হান্টার সাহেব সে বিশেষণের শিকার প্রমাণিত হচ্ছেন বলে আমরা দুঃখিত। কারণ, যে আন্দোলন সম্পর্কে তার নিজের বক্তব্য যে, এক অত্যাশ্চর্য পদ্ধতিতে প্রকাশিত হয়ে ১৮১৮ সালে পুনরায় অত্যাশ্চর্যভাবে বালির টিলার ন্যায় ভুতলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে'–সে আন্দোলন সম্পর্কেই তিনি আবার একই গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা পর বলছেন; তিনি পবিত্র নগরীতে একটি সংস্কার আন্দোলনের সূচনা দেখে আসছেন, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন গ্রাম্য বেদুঈন।

তারপর এ আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ তিনি এত নিন্দিতভাবে পেশ করেছেন যে, শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকলের কাছেই হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ) সীমাহীন বিদ্বেষের পাত্রে পরিণত হন[৩২০]। একটু অগ্রসর হয়ে তার আরোপিত আরেকটি অপবাদ লক্ষ্য করুন ; তিনি লিখেছেনঃ

সায়্যিদ আহমদ সাহেব মক্কা শরীফে অবস্থানরত থাকাকালেই স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষকে এ মর্মে অবহিত করা হল যে, এখানকার গ্রাম্য বেদুঈন দল যাদের কারণে পবিত্র স্থান সমূহের নানা রকম অবমাননা ঘটেছিল সায়্যিদ সাহেবের আকীদা ও বিশ্বাস তাদের অনুরূপ। রিপোর্ট মোতাবেক তাকে জনসমক্ষে অপমানিত করা হল। নগর থেকে বহিস্কার করে দেয়া হল। এ শাস্তিদানের পরিণাম দাঁড়াল যে, তিনি যখন ভারতবর্ষ প্রত্যাবর্তন করলেন তখন থেকে আর শিরক বিদআতের সংস্কারক কিংবা ধর্মের জন্য উম্মাদ ছিলেন না বরং ছিলেন আবদুল ওয়াহহাবের একজন মুরীদ[৩২১]।

কত ভয়ানক ও জঘন্য অপবাদ! সাধারণ মুসলমান বিশেষতঃ সীমান্তবর্তী অশিক্ষিত মুসলমানদের কাছে এ অপেক্ষা অধিক ধিকৃত অভিশপ্ত ও হত্যাযজ্ঞ আর কে হতে পারে যাকে মক্কা মুআযযমায় জনসমক্ষে রেখে অপমানিত করা হয়েছে। যাকে মক্কার পবিত্র ভূমি থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হয়েছে। এ সকল নিরীহ মুসলমানদের মধ্যে তো এতটুকু যোগ্যতাও নেই যে, তারা কোন শ্রুত সংবাদের সত্যাসত্য পরীক্ষা করতে পারে। আর তা ছাড়া এমন কোন উপকরণও তাদের কাছে বিদ্যমান নেই যে, বিষয়টির তদন্ত করে সঠিক সংবাদ লাভ করবে। এমতাবস্থায় তাদের কাছে যে কথাই বলা হবে সেটিই সত্য বলে গণ্য। বিশেষতঃ যখন এ কথাগুলো তাদের নিজ সর্দারদের মাধ্যমে পৌঁছানো হল তখন অবিশ্বাস করার কোন পথ তাদের জন্য অবশিষ্ট থাকে নি।

হান্টার সাহেবের এ বই যদিও দীর্ঘকাল পরে রচিত তবুও এ বই থেকে জানা যাচ্ছে যে, ইংরেজরা যে প্রপাগান্ডা চালিয়েছিল তার মূলকথা ছিল দু'টি।

এক. সায়্যিদ সাহেব যে সকল আকীদা ও বিশ্বাস পোষণ করেন যা নজদীগণ পোষণ করত। আর নজদীদের আকীদা ও বিশ্বাসকে মক্কা মুআযযমা ও মদীনা তইয়েবার আলিমগণ ভ্রান্ত বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তারপর প্রথমে তাদের হিজাযে প্রবেশাধিকার রহিত করা হয়, পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে যথারীতি জিহাদ করে পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়।

দুই. আমাদের সরকার তুর্কী সরকারের ন্যায় একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার। কাজেই যেভাবে তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা রাষ্ট্রীয় আইন, নৈতিকতা ও

ধর্মীয় দৃষ্টিতে অপরাধ তদ্রুপ আমাদের এই সরকারের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করা সে মানের একটি অপরাধ।

কথাটি যদিও ইংরেজরা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করত না তবে তাদের কথায় কথায় তুর্কীদের আলোচনা টেনে আনার পেছনে এ বক্তব্যই লুকায়িত থাকত। তারা বার বার তুর্কীদের উদ্বৃতি তুলে ধরে স্থানীয় নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ মানুষের মস্তিষ্কের ভিতর ঢুকানোর চেষ্টা করত।

টীকা

৩১৪. জন্ম ১১১৫/১৭০৩ সালে। পূর্ব পুরুষের বাসস্থান উত্তর নজদের 'উয়াইনা' নামক স্থান। নজদের উত্তরাংশকে 'আল আরিয' বলা হয়। সেখানকার প্রসিদ্ধ নগর হল রিয়াদ। বর্তমানে এটি সৌদি সরকারের রাজধানী। আল আরিযকে জাবালে ইমামা নামেও অভিহিত করা হয়। বস্তুত এটি একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের নাম ছিল। তার আশেপাশের ভূখন্ডকে 'ওযাদীয়ে হানীফা ও ইমামা বলা হত। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের জন্মস্থান উয়াইনা এবং তাবলীগ ও দাওয়াতের কেন্দ্রস্থল ছিল দারিয়া। উভয়টি একই উপত্যকায় অবস্থিত। তবে গোটা নজদের জন্য প্রাণকেন্দ্র রূপে গণ্য ছিল। (ইনসাক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, আরব শব্দের আলোচনা, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব গ্রন্থের অনুসরণে)।

বংশ ঃ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের খান্দান একটি বিদ্যানুরাগী খান্দান ছিল। তার পিতা আবদুল ওয়াহহাব, দাদা সুলায়মান, চাচা ইবরাহীম ইবনে সুলায়মান, চাচাত ভ্রাতা আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম সকলেই ছিলেন আলিম ও ফিকহ বিশারদ। নজদ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হাম্বলী ফিকহ শাস্ত্রে তাদের রচিত অনেক গ্রন্থাবলি বিদ্যমান। ইলমের প্রতি অনুরাগের এই ধারাবাহিকতা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের পরবর্তী বংশধরের মধ্যেও অব্যাহত থাকে। প্রায় দেড় শতাব্দীকাল অতিবাহিত হওয়ার পর আজও এ খান্দান একটি ইলমী ও বিদ্যানুরাগী খান্দান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তাদের ইলমী উচ্চাসন গোটা নজদ অঞ্চলকে প্রভাবিত করে রয়েছে। মেধা ও স্মরণশক্তি, কষ্ট সহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বহুগুণে গুণান্বিত। এ সকল গুণের দ্বারা তারা ক্রমান্বয়ে সমগ্র নজদকে নিজেদের প্রতি আস্থাশীল করে তোলে। মুহাম্মদ নিজের পিতা আবদুল ওয়াহহাবের নিকট ফিকহ হাদীস ও তাফসীরের শিক্ষা লাভ করেন। বিদ্যার্জন পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে ১১৩৫ হিজরী ১৭২২ খ্রিস্টাব্দের দিকে মদীনা শরীফ গমন করেন। শিক্ষা গুরুদের মধ্যে শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে নুসাইফ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শায়খ আবদুল্লাহ 'মজাম্মা' নামক স্থানের অধিবাসী। দীর্ঘকাল থেকে তিনি মদীনা তাইয়েবায় অধ্যাপনা করে আসছেন। মদীনার পরে শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি বসরা (ইরাকে) যান। সেখানে শায়খ মুহাম্মদ মাজমূয়ী-এর কাছে হাদীস ও সুন্নার জ্ঞান অর্জন করেন। কথিত আছে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব শিক্ষার জন্য সিরিয়া দেশেও গিয়েছিলেন। কিন্তু 'মুহাম্মদ'ইবনে আবদুল ওয়াহাব' গ্রন্থের রচয়িতা মাওলানা মাসউদ আলম সাহেব এ তথ্যের সত্যতা স্বীকার করেন নি। এভাবে শিক্ষার পর্ব সমাপ্তির পর তিনি ছাত্রদের শিক্ষকতা ও প্রশিক্ষণদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বযুগে নিজের পরিবেশের মধ্যে প্রচলিত যে সকল অপসংস্কৃতি, রূসম রেওয়াজ ও কুপ্রথা তার চোখে পড়েছিল তিনি সে সবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন। নিজ জন্মস্থানে প্রথম পর্যায়ে এ দাওয়াত কোন স্বীকৃতি পায় নি। বাধ্য হয়ে তাকে চলে যেতে হল অন্যত্র অর্থাৎ দারিয়া নগরের দিকে। সেখানে দারিয়ার আমীর মুহাম্মদ ইবনে সাউদ তার দাওয়াতে অনুপ্রাণিত

হন। তার সংস্কার আন্দোলনকে সফল করার কাজে একান্ত সহযোগীর ভূমিকা অবলম্বন করেন। ফলে মুহাম্মদ ইবনে সাউদ রাজনৈতিক সুবিধাও পেয়ে গেলেন। এদিকে ইবনে আবদুল ওয়াহহাব আমীর মুহাম্মদ ইবনে সাউদ ও তার পুত্র পৌত্রদের প্রশিক্ষণ দানের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকেন। প্রায় ৯১ বছর বয়সে পৌঁছার পর ১২০২/১৭৯২ সালে তার ওফাত হয়। নজদী বাহিনীর পরাজয়কালে দারিয়ায় তার যে সকল বংশধর উপস্থিত ছিল তাদের সকলকেই শহীদ করা হয়। মাত্র কয়েকজন কোনক্রমে আত্মরক্ষা করেছিলেন। তাদের সূত্রে পরবর্তী বংশ ও জ্ঞানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

৩১৫. এ আন্দোলনের কর্মীরা 'মুতাওয়ায়ীন' নামে পরিচিত ছিল। মুতাওয়া-শব্দের অর্থ হল রাজাকার বা স্বেচ্ছাসেবক। আন্দোলনের চিন্তাধারা প্রচারের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট ছিল তাদেরকেও এই একই নামে অভিহিত করা হত।

৩১৬. তুর্কীদের কেন্দ্রীয় সরকারকে 'বাবে আলী' এবং রাজধানী কনেষ্টেনটিনোপলকে 'আস্তানা' বলা হত।

৩১৭. নজদীদের সম্পর্কীত গোটা আলোচনাটি মাওলানা মাসউদ আলম নদভী রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব এক মজলুম আউর বদনাম মুসলিহ' থেকে গৃহীত।

৩১৮. হামারে হিন্দুস্থানী মুসলমান, পৃঃ ৮৭।

৩১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬।

৩২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬-৮৭।

৩২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯।

বিপরীত পক্ষ ইংরেজ না শিখ কোনটি

বর্ণিত বিস্তারিত আলোচনার পর সায়্যিদ সাহেবের বিপরীত শক্তি কে বা কারা ছিল তা নির্ণয় করে দেওয়ার আদৌ প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু বাজারে মুদ্রিত কতিপয় এমন 'লিটারেচার' দেখা যায় যেগুলোর কারণে এ ব্যাপারে দ্বিধার উদ্রেক ঘটে। কাজেই মূল প্রতিপক্ষ কে ছিল সে বিষয়ে সন্তোষজনক একটি পর্যালোচনা আবশ্যক।

কেউ কেউ সায়্যিদ সাহেবের এ আন্দোলনের পরিধি খুব সংকীর্ণ করে দেখেছেন এবং বিষয়টিকে শিখ বিরোধিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তারা বলেন ঃ

এক. উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে স্বাধীন সরকার গঠনের পর যে সরকারি ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয়েছিল তাতে বলা হয়েছে –

نہ باکسے از امراء مسلمین تنازعت داریم، ونہ بایکے از دساء مومنین مخالفت باکفار مقابلہ داریم نہ با مدعیان اسلام- صرف با دراز مویان مقاتلہ - نہ باکلمہ گویاں واسلام جویان- ونہ باسرکار انگریزی مخاصمت داریم- ونہ ہیچ راہ تنازعت کہ از رعایاء اوہستیم بجماتیش از مظالم برایا [৩২২]

অর্থাৎ কোন মুসলমান গভর্নরের সঙ্গে আমাদের কোন দ্বন্দ্ব নেই, কোন মুসলমান রঈসের সঙ্গেও কোন বিরোধিতা নেই। এভাবে অমুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গেও নয় আমাদের দ্বন্দ্ব কেবল লম্বা চুল বিশিষ্ট জাতির সঙ্গে যারা না কালেমাপন্থী মুসলমান আর না ইসলামের সমর্থক। আর ইংরেজ সরকারের সাথেও আমাদের কোন ঝগড়া নেই। কারণ আমরা তাদের প্রজা হিসাবে আছি। তাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে নির্যাতন থেকে নিরাপদভাবে আছি।

মুনশী মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী তার 'সাওয়ানিহে আহমদী' গ্রন্থে বলেন ঃ

একটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় এ কথাও আছে যে, তিনি যখন শিখদের মোকাবেলায় জিহাদ করার জন্য যাচ্ছিলেন তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল, আপনি অতদূরে অবস্থিত শিখদের সঙ্গে জিহাদ করতে যাচ্ছেন অথচ ইংরেজ যারা এ দেশের অধিপতি হয়ে বসেছে তারা কি দ্বীনে ইসলামের অস্বীকারকারী নয় ? নিজ বাড়িতে তাদের সঙ্গে জিহদ করে স্বদেশ উদ্ধার করে নিন। এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আপনার সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য পেয়ে যাবেন।'

উত্তরে সায়্যিদ সাহেব বললেন, কারোর সাম্রাজ্য ছিনিয়ে এনে আমরা নিজ রাজত্ব চালাতে অভিলাষী নই। শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের কারণ শুধু এটি যে, তারা মুসলমান ভাইদের ওপর যুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে। আযান সহ বহু ধর্মীয় কাজকর্ম পালনে তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আর ইংরেজ সরকার যদিও অমুসলিম, কিন্তু মুসলমানদের ওপর তাদের কোন যুলুম ও অবিচার নেই। তারা মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়াবলী পালনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টিও করে না[৩২৩]।

অন্যত্র আরেকটি বর্ণনা এ রূপে পেশ করা হয় যে, সায়্যিদ সাহেব যখন রামপুরে অবস্থানরত ছিলেন তখন কতিপয় আফগান ব্যক্তি তার কাছে শিখদের যুলুম নির্যাতনের অভিযোগ করে। সায়্যিদ সাহেবকে তারা জানাল যে, পাঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা আফগান মহিলাদেরকে আটক করে বন্দী অবস্থায় রেখে দিয়েছে। অবলা এ মহিলারা তাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য ছটফট করছে। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ কথাটি শুনে বললেন, আমি শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব[৩২৪]।

কোন কোন লেখক এ কথাও লিখেছেন যে, ঘটনা তদন্তের জন্য হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদকে প্রেরণ করা হয়। তিনি লাহোর, অমৃতস্বর ইত্যাদি এলাকায় পৌঁছে নিজে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আসেন।

উপরোক্ত উদ্বৃতি সমূহের ভিত্তিমূলে 'সাওয়ানিহে আহমদী' গ্রন্থের লেখক এ কথাই প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে, হযরত সায়্যিদ সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ছিল শিখ সরকার। রওশন মুস্তাকবিল গ্রন্থের লেখক মরহুম মৌলভী সায়্যিদ তোফায়েল আহমদ আলীগড়ী সে পথের অনুসরণ করেন। তিনি কিছুটা আইনের ভাষায় কথাটি এভাবে পেশ করেছেন ঃ

পাঞ্জাবে মুসলমানদের ধর্মীয় ও মৌলিক অধিকার সমূহে স্পষ্ট হস্তক্ষেপ চলছিল। ফলে এ হস্তক্ষেপ রোধ করার উদ্দেশ্যে হযরত সায়্যিদ সাহেব শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের সংকল্প গ্রহণ করেন[৩২৫]।

মৌলভী সায়্যিদ তোফায়েল আহমদ শিখদের নির্যাতনের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে স্যার 'ল্যাপল গ্রীফন'-এর একটি উক্তি পেশ করেন ঃ

'হাযারা এলাকার গভর্নর সর্দার হরিসিং নলুয়া-এর আচরণ এবং মুসলমানদের প্রতি তার কঠিন ঘৃণাবোধের কারণে সেখানে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা বিরাজিত থাকে[৩২৬]।

ডঃ হান্টারের বক্তব্য থেকেও একটি উদ্বৃতি পেশ করা হয়েছে যেমনঃ শিখদের হিন্দুয়ানী ঘোড়ামী উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি শিখানলের উদ্রেক করেছিল[৩২৭]।

প্রকৃত অবস্থা কি ছিল

বস্তুত ঘটনা প্রবাহের উল্লেখিত ধারাবাহিকতা যে কোন ইনসাফ প্রিয় মানুষকে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করবে যে, শিখদের সাথে যে সকল সংঘর্ষ ঘটেছিল এগুলো ছিল সম্পূর্ণ সাময়িক ব্যাপার ও উপস্থিতি পরিস্থিত নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক। নতুবা সায়্যিদ সাহেবের গোটা আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিপক্ষ ছিল ইংরেজ। তিনি আজীবন যে শ্রম সাধনা ব্যয় করেছেন তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল এই ইংরেজদের করতল থেকে নিজ মাতৃভূমির মুক্তিদান ও স্বাধীনতা উদ্ধার করা।

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষণীয়

এক. সায়্যিদ সাহেব তার এ আন্দোলনের সূচনা দানকারী তথা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বস্তুত এমন একটি দলের সামরিক বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করছিলেন যেটি পূর্ব থেকেই হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরে হযরত শাহ আবদুল আযীয-এর তত্ত্বাবধানে লালিত হয়। আর এ দলের প্রধান কেন্দ্র তখনও দিল্লী ছিল।

দুই. শাহ আবদুল আযীয কর্তৃক যুদ্ধের ঘোষণা শিখদের বিরুদ্ধে ছিল। এ ঘোষণা ছিল ১৮০৬ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা। তখন তিনি ধর্মীয়

পরিভাষায় হিন্দুস্থানকে দারুল হরব ঘোষণা করেছিলেন এবং ইংরেজ আধিপত্য থেকে স্বদেশকে স্বাধীন ও মুক্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত হওয়াকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ফরয বলে বর্ণনা করেন।

তিন. রামপুরে শিখদের যুলুম নির্যাতন চালানোর যে কথা পাঠানরা সায়্যিদ সাহেবকে বলেছিল হযরত শাহ আবদুল আযীয সেই একই ধরনের নির্যাতন চালানোর কথা ইংরেজদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। আর এ কারণেই তিনি ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলকে 'দারুল হরব' বলে ফতওয়া প্রদান করেছিলেন। দেখুন 'ফাতাওয়ায়ে শাহ আবদুল আযীয' বিগত পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা উল্লেখিত আছে।

চার. সায়্যিদ সাহেব নিজে নওয়াব আমীর আলী খান, জশোবন্ত রাও হোলকার প্রমুখের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রায় ছয় বছর যাবত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত থাকেন। স্বাধীনতা ও ইংরেজ বিরোধিতার এই আবেগই সায়্যিদ সাহেবের সম্পর্ক ইংরেজদের তৃতীয় বিপরীত শক্তি দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সাথে শেষ অবধি অটুট অবস্থায় রেখেছিল। আর ১৮১৬ সালে তিনি নওয়াব আমীর আলী খানের দল থেকে এ কারণেই পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন যে, নওয়াব সাহেব তাঁর মতের বাইরে ইংরেজদের সহিত সন্ধি স্থাপনে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অথচ এ কথা সত্য যে, নওয়াব আমীর আলী খান হযরত সায়্যিদ সাহেবের একজন একান্ত ভক্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং সায়্যিদ সাহেবে যেন তার সঙ্গে থাকেন এ বিষয়টি গভীর আন্তরিকভাবে কামনা করছিলেন। কিন্তু সায়্যিদ সাহেব ইংরেজরেদ সাথে সন্ধি অবস্থায় নওয়াবের দলে থাকা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি।

পাঁচ. হযরত সায়্যিদ সাহেব গোয়ালিয়র সরকারের উজির রাজা হিন্দুরাও ও মনসবদার গোলাম হায়দার খানকে যে সকল চিঠি লিখেছিলেন সেগুলো ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে তিনি নিজ হাতে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসাবে যে কথা বলেছিলেন সেটি হল ঃ

بیگانگاں بعید الوطن اور تاجران متاع فروش کو
نکال کر مناصب ریاست وسیاست ان اہل وطن کے

سپرد کئے جائیں جو اس کے مستحق ہیں

অর্থাৎ সম্পূর্ণ অজানা অচেনা পরদেশী ও মাল কেনাবেচার ব্যবসায়ী দলকে উৎখাত করে এদের রাজনীতি ও নেতৃত্বের দায়িত্ব স্বদেশীদের ওপর ন্যস্ত করা হবে যারা এ দায়িত্ব পালনে যথোপযুক্ত।

ছয়. সবচেয়ে স্পষ্ট ও জলন্ত সাক্ষী যাকে উপেক্ষা করতে কারুর পক্ষে সম্ভব নয় সেটি হল হযরত সায়্যিদ সাহেবের পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত মনীষীদের কর্মধারা। শিখ রাজত্ব ১৮৪৬ সালে নিঃশেষ হয়ে যায়। ১৮৪৯ সাল নাগাদ পাঞ্জাব পরিপূর্ণভাবে পর রাজ্যের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে পড়ে। এ সময় সুযোগ ছিল সীমান্তে অবস্থিত সায়্যিদ সাহেবের পরবর্তী বাহিনীদের ক্যাম্প তুলে নেয়ার। তাদের জন্য উচিত ছিল আল্লাহর শোকর আদায় করার। কারণ তাদের দুশমনের শক্তি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে গেছে। দুশমনদের ভুখন্ডে ইংরেজদের পতাকা উড়ছে। মুনশী মুহাম্মদ জাফর সাহেব যে কথা বলেছেন যে, 'সায়্যিদ সাহেব ঘোষণা করেছিলেন, তারা ইংরেজদের প্রজা, ইংরেজ সরকারের প্রতি তারা আস্থাশীল' যদি এ কথাই সত্য হবে তা হলে শিখ রাজত্বের পতন ও ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের দৃশ্য দেখে তাদের নিজেদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার উপযুক্ত সুযোগ ছিল। অথচ ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ মুজাহিদ দল সকল আবরণী ঝেড়ে ফেলে তখন সরাসরি সামনে এগিয়ে আসে, ইংরেজ বিরুদ্ধাচরণে পূর্বের তুলনায় আরও কঠিন ও দৃঢ় চরিত্র অবলম্বন করে। এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্যে যারা ইংরেজ আধিপত্য নির্মূল অভিযানে আশাহত হয়ে পড়েছিল তারা নিজেরা ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলের ভিতর অবস্থান করাকেও বরদাশত করে নি। অগত্যা তারা সীমান্তের ওপারে নিজেদের বুহ্য প্রতিষ্ঠা করে আজীবন ইংরেজ সরকারকে ব্যস্ত করে রাখার কাজকেই নিজেদের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিতে বাধ্য হল।

ইংরেজ সামরিক বাহিনী পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাদেরকে বারবার আঘাত করছে। কিন্তু তারা ভূতলে পড়ে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ইংরেজ শক্তির মোকাবেলায় বুক পেতে দিচ্ছে। যতদিন না ইংরেজ এ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত তারা এ ধারাবাহিক নীতিতে কোন পার্থক্য আনেনি। (বিস্তারিত বিবরণী পরবর্তী খন্ডে উল্লেখ হবে, ইনশাআল্লাহ)।

সাত. ডাঃ হান্টারের উক্তি ধর্তব্য বিবেচিত হলে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত তার নিম্নোক্ত উদ্বৃতি উপেক্ষা করার কোন কারণ হতে পারে না। তিনি বলেছেন ঃ

> (হজ্জের সফরের) পূর্বে যে চিন্তা তার দৃষ্টিতে একান্ত অমূলক স্বপ্ন বা কল্পনার অতিরিক্ত কিছু ছিল না সেটি তখন সুস্পষ্ট আলোতে বিদ্যমান অবস্থায় দৃশ্যত হতে শুরু করে। এ আলোতে তিনি নিজকে হিন্দুস্তানের প্রতিটি জেলায় ইসলামী ঝাণ্ডা উত্তোলন করতে এবং ক্রুশকে ইংরেজ কাফেরদের শবদেহ তলে দাফন হচ্ছে বলে দেখছিলেন[৩২৮]।

আট. শিখদের রাজত্ব ছিল পূর্ব পাঞ্জাবে। বঙ্গদেশে শুধু তখন থেকে নয়; প্রায় ৮০ বছর পূর্ব থেকেই ইংরেজ শাসন চলে আসছে। তাহলে এখানে কি রহস্য ছিল যে, যখনই সায়্যিদ সাহেব সীমান্ত অঞ্চলে পৌঁছে জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন করলেন তখনই বঙ্গদেশে তারই বিশিষ্ট মুরীদ সায়্যিদ নিসার আলী শেতবর্ণের এ ইংরেজ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে[৩২৯]। স্বয়ং হান্টার বলেন ঃ

> ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে সীমান্তের মুজাহিদগণ যখন পেশোয়ার অধিকার করে লয় তখন তিতুমীর এত নির্ভীক হয়ে উঠেন যে, তিনি নিজের সকল অবগুণ্ঠন ঝেড়ে ফেলে দেন। অতি সাধারণ পর্যায়ের কঠোরতা যা হিন্দু জামিদার শ্রেণী তার কৃষক মুরীদদের ওপর চালাত সেগুলোও তখন তার কাছে বড় ধরনের বিদ্রোহ ঘটানোর কারণে পরিণত হত। এরপর এ কৃষকদের বিদ্রোহ চলতে থাকে। পরিশেষে বিদ্রোহীরা নিজেদেরকে একটি মোর্চাবদ্ধ ক্যাম্পে সংরক্ষিত করে নেয়[৩৩০]।

এ স্থানে হিন্দু জমিদার শ্রেণীর বাড়াবাড়ির কথাটি বস্তুত বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের সেই চিরাচরিত বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির নীতি-যার বদৌলতে তারা হিন্দুস্থানকে দখলের সুযোগ করে নিয়েছিল এবং প্রায় এক শতাব্দী কাল পর্যন্ত নিজেদের রাজত্ব অব্যাহত রেখে স্বদেশী মানুষদেরকে দু'টি বিবাদমান ক্যাম্পে বিভক্ত করে দেয়।

মোট কথা উল্লেখিত তথ্যগুলোর নিরিখে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হচ্ছে যে, সায়্যিদ সাহেবের প্রকৃত ও আসল প্রতিপক্ষ ছিল ইংরেজ। এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ছিল যে, পরিস্থিতি শিখদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে তাকে

বাধ্য করেছিল। আর এভাবেই তার বহু বছরের শ্রম সাধনা রণক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করে।

ক্যাপ্টেন ক্যানগম 'তারীখে শিখ' গ্রন্থে বলেন, 'সায়্যিদ আহমদ সাহেবের কর্মধারা থেকে বুঝা যেত যে, 'কাফের' শব্দ থেকে তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল শিখ সম্প্রদায়। বস্তুত তখন এ শব্দটির দ্বারা তাঁর সঠিক উদ্দেশ্য নিরূপন করা যায় নি। তিনি ইংরেজদের ওপর আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে অবশ্যই সংযত ছিলেন। কিন্তু একটি বৃহদায়তন ও উন্নত দেশের ওপর দূরদেশের এক সম্প্রদায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে এতটুকুই তার কাছে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কারণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল[৩৩১]।

দশ. আলোচনার এ স্থানে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর একটি উদ্বৃতি খুবই আকর্ষণীয়। তিনি বলেছেন ঃ

'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিগত দেড় শত বছর থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। তবে কোম্পানী নিজেকে সামান্য বণিকের পোষাকে আবৃত রাখার প্রয়োজনবোধ করে আসে। বালাকোটের মর্মভেদী ঘটনা দু' বছর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে এক লাফে বর্ণিক সুলভ পোশাক ঝেড়ে ফেলে নিজেই সরকারি কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে।

ان فی ذلك لعبرة لاولی الابصار

অর্থাৎ এ ঘটনার মধ্যে চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে[৩৩২]।

এগার. যেকালে হযরত সায়্যিদ সাহেব তার জিহাদে মশগুল ছিলেন ঠিক সেকালে জনৈক ইংরেজ পর্যটক যিনি 'ম্যাসন' নামে পরিচিত ছিলেন-তিনি সীমান্ত, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। তিনি সায়্যিদ সাহেবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন, 'শিখদের দমন ও পাঞ্জাবের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা তারপর হিন্দুস্থান ও চীনকে নিজের করায়ত্বে আনা।' স্পষ্ট অনুভব হচ্ছে যে, এই ইংরেজ পর্যটকের অনুমান সে সব মুসলমানের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ছিল যারা সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে অবস্থান করে তার ঘনিষ্ট ভক্তবৃন্দ বলে গণ্য হয়েছেন[৩৩৩]।

এখন অবশিষ্ট রয়ে গেছে 'সাওয়ানিহে আহমদী' ও 'রওশন মস্তাকবিল' গ্রন্থে উল্লেখিত কতিপয় উদ্বৃতির সন্তোষজনক জবাব প্রদান করা। এ ব্যাপারে আলোচনার পূর্বে 'শিখ-মুসলিম' সম্পর্কের ওপর কিছু আলোকপাত করে নেয়া বাঞ্ছনীয়।

শিখ-মুসলিম সম্পর্ক

ইতিহাসের এ শিরোনাম যতখানি তিক্ত আবার ততখানি মিষ্টও বটে। এটা ইংরেজ কূটনীতির সাফল্য যে, তারা এ অধ্যায়ের যাবতীয় তিক্ত কথাগুলো অতি জোরালো তৎপরতার সঙ্গে উপস্থাপন করতে থাকে। কারণ এ তৎপরতার দ্বারা সমাজে যে পরিণামের সৃষ্টি হচ্ছে সেটি ইংরেজ উদ্দেশ্যকেই সফলতা ও সজীবতা দান করছে। তারা শিখ মুসলিম সুসম্পর্কের অধ্যায়গুলো ভ্রান্ত অক্ষরের ন্যায় অবলুপ্ত করে দিয়েছে। এটি কি ইতিহাসের এক আশ্চার্যজনক ব্যাপার নয় যে, রণক্ষেত্রে ঠিক যুদ্ধ চলার মূহুর্তে ইয়ার মুহাম্মদ খান ও তার সঙ্গী মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের পুত্র শের সিং ও তার সেনাধ্যক্ষ বুদ্ধ সিং-এর সঙ্গে অবস্থান করছে। একত্রে তারা সয়্যিদ সাহেবের আহারে বিষ প্রয়োগ করছে কিংবা সায়্যিদ সাহেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে তার মুজাহিদগণকে শহীদ করাচ্ছে। আবার অন্যদিকে রাজা রাম হিন্দু হযরত সায়্যিদ সাহেবেরই গোলা বারুদ খানার কমান্ডার হিসাবে শিখ বাহিনীর ওপর গোলা নিক্ষেপের কাজে লিপ্ত রয়েছেন।

শিখদের মধ্যে 'মিসিল' নামে একটি দল ছিল। এরা ছিল চিরযোদ্ধা শ্রেণী। মহারাজা রণজিৎ সিং-এর সুসংঘঠিত বাহিনীও তাদেরকে বশ করতে দীর্ঘ পরিশ্রম করে আসতে হয়েছিল। সম্রাট ফররুখ সিয়রের শাসনামলে তাদের মর্মান্তিকভাবে পরাজিত হওয়ার ঘটনা তারা কখনও ভুলে নি। এটা শুধু অনুমানের কথা নয় বরং জলন্ত বাস্তব সত্য যে, শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা সেই প্রতিশোধ গ্রহণে বিন্দুমাত্র ক্রটিও করে নি। এতদসত্ত্বেও শিখ-মুসলিম সম্পর্কের অপর দিকটি হল নিম্নরূপ ঃ

এক. কাবুলের সম্রাট যামান শাহ মাহারাজা রণজিৎ সিংকে সুবা পাঞ্জাবের কর্তৃত্ব দেন।'

দুই. যদি দরে নেয়া হল যে, এ কথা সঠিক নয় তা হলে এ কথায় সন্দেহ নেই যে, লাহোর পুনঃদখল আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে মুসলমানরাও

অগ্রণী ভূমিকায় ছিল[৩৩৪]। তারপর এই মুসলমানদের পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়ার ফলেই লাহোর দখলের বিষয়টি সম্ভবপর হয়[৩৩৫]।

তিন. সম্ভবত এ কারণেই মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের সরকারে প্রচুর মুসলমান কর্মরত ছিল। যেমন –

ক. ফকীর আযীযুদ্দীন সাহেবের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি ছিলেন মহারাজার একান্ত উপদেষ্টা, আস্থাশীল সেক্রেটারী ও তার উচ্চ পরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য। বৈদেশিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এ ফকীর সাহেবই পালন করতেন[৩৩৬]।

খ. দ্বিতীয় বিশ্বস্ত ব্যক্তি যার গোপন রিপোর্টের ওপর মহারাজা পূর্ণ আস্থাবান থাকতেন তিনি ছিলেন কাযী আবদুর রহমান সাহেব। আক্রমনের পূর্বে লাহোরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য মহারাজা তাকেই পাঠিয়েছিলেন[৩৩৭]।

গ. কাশ্মীর বিজয়ের ব্যাপারে মহারাজার জন্যে যিনি সর্বাধিক উপকার করেছিলেন তিনি ছিলেন ভম্ববের গভর্নর ওয়ালী খান[৩৩৮]।

ঘ. ইয়ার মুহাম্মদ খান ও তদীয় ভ্রাতা দোস্ত মুহাম্মদ খান এ মহারাজার নিযুক্ত পেশোয়ারের গভর্নর ছিলেন। তাছাড়া মুলতানের গভর্নর ছিলেন নওয়াব সারফরায খান, কসূর-এর গভর্নর কতুবুদ্দীন খান, মানকীরার প্রধান প্রশাসক হাফিয আহমদ খান ও গুজরাট বিজয়ের পর তার শাসনকার্য যার দায়িত্বে অর্পিত হয় তিনি ছিলেন ফকীর নূরুদ্দীন খান[৩৩৯]।

ঙ. প্রথম দিকে মহারাজার অস্ত্রাগারের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন মিয়া গাউস খান। তার মৃত্যুর পর তারই সন্তান সুলতান মাহমুদ খান পদোন্নতি পেয়ে ধীরে ধীরে পিতার আসন পর্যন্ত পৌঁছে যান[৩৪০]।

চ. শায়খ ইবাদুল্লাহ ও রওশন খান দু'সহস্র পদাতিক সৈন্যের একটি পল্টনে প্রধান কার্যনির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা যখন বিভিন্ন উপাধি বণ্টন করছিলেন তখন এদেরকে তিনি 'কমীদান' (ছোট পিস্তল) উপাধিতে ভূষিত করেন[৩৪১]।

ছ. লাহোর জয় করার পর সেখানে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য নিযামুদ্দীন সাহেবকে বিচারপতি এবং মুহাম্মদ শাহপুর ও সাদুল্লাহ চিশতী সাহেবকে মুসলিম

সম্প্রদায়ের জন্য মুফতী নিযুক্ত করা হয়[৩৪২]। হাসপাতাল গুলোর সর্বোচ্চ কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত করা হয় হাকীম নুরুদ্দীনকে[৩৪৩]।

জ. টাকশাল স্থাপনের পর সম্ভবত কোন মুসলমান ব্যক্তিই মুদ্রার পিঠে মুদ্রণের জন্য নিম্নোক্ত কবিতাটি চয়ন করেছিল। কবিতাটি নিম্নরূপ [৩৪৪]ঃ

دیگ وتیغ وفتح ونصرت بید رنگ
یافت ازنانك گورد گوبند سنگه ،

ঝ. তোপ সাধারণতঃ মুসলমানদের হাতেই তৈরী হত। তারীখে পাঞ্জাব গ্রন্থের লেখক মুনশী আবদুল কারীম সাহেব তার গ্রন্থে ৩৮টি তোপের আলোচনা করেন। এগুলো সব কটিই ছিল মুসলমানদের তৈরী। একটি তোপের গায়ে নিম্নোক্ত ফার্সী কবিতা লিখিত ছিল [৩৪৫]ঃ

جمعدارایں·توپ شد رائے سنگه
کر در جانفشانیست او بے درنگ
بموجب صلاح لاله مهسنگه بار
غلام نبی کفت تاریخ دار

অপর একটি তোপের গায়ে নিম্নোক্ত কথাগুলো খোদিত ছিল[৩৪৬]।

هذا الضرب موسومه مجنون حب الامر اشرف اقدص وعلی حضور پر نور درسمت باہتمام صاحب ارسطوفطرت، فلاطون زماں موشیو شوایر جنرل کورٹ صاحب بهادر در عیدگاه بحسن خدمت فضل علی کمیدان شاگرد صاحب ممددح ریخته شد

চার. এডুকেশন কনফারেন্স রিপোর্টের সাক্ষ্য নিম্নরূপ ঃ

শিখদের অর্ধ-শতাব্দীকাল শাসনামলে যদিও শাসন ক্ষমতা শিখদের হাতে ছিল কিন্তু তখনকার জমিদারী ছিল মুসলমানদের হাতে। আর হিন্দুরা তাদেরই অধীনে কাজকর্ম করত[৩৪৭]।

পাঁচ. শিক্ষা বিভাগও মুসলমানদের করায়ত্বে ছিল। হিন্দু ও শিখ শিশুদের তত্বাবধান কাজের জন্য মুসলিম শিক্ষকের ওপরই অধিক আস্থা করা হত।

ছয়. ১৮৪৬ সালে শিখ ও ইংরেজদের মধ্যে যখন সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তখন শর্তাবলি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এবং শিখ সরকারের পক্ষ থেকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ফকীর নুরুদ্দীনের দস্তখতও পাওয়া যায়। কোন কোন দস্তাবেজের মধ্যে ফকীর নুরুদ্দীনের সঙ্গে ফকীর তাজুদ্দীন, ফকীর চেরাগুদ্দীন ও সুলতান মুহাম্মদ খানের নামও শিখদের প্রতিনিধি হিসাবে পাওয়া যায়[৩৪৮]।

সারকথা

সংক্ষেপে বলতে গেলে শিখ মুসলিম সুসম্পর্ক ও ইংরেজদের মুসলিম নিধন কর্মকাণ্ড উভয়ের মধ্যে তুলনা করা সম্পূর্ণ পৃথক একটি অধ্যায়। এ ক্ষেত্রে সাধারণ পর্যালোচনাও এতখানি দীর্ঘ হবে যে, আলোচ্য অংশে তার উপস্থাপন শেষ করা যাবে না। কাজেই সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য হল আপনি নিজেই 'সাওয়ানিহে আহমদী কিংবা রওশন মুস্তাকবিল ইত্যাদি গ্রন্থে আলোচনার পূর্বে উল্লেখিত উদ্বৃতিগুলো পাঠ করুন, তখন আপনার নিজের কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, হযরত সায়্যিদ সাহেবের এ জিহাদ মুলতঃ শিখদের বিরুদ্ধে নয় ; এ জিহাদের মূল বিপরীত শক্তি ছিল ইংরেজ। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে, হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ, হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ ও তাদের সঙ্গীদের গৌরবময় ঐতিহ্যের ওপর কালিমা লেপনের চেষ্টা যেভাবে শত্রুপক্ষের লোকেরা করেছেন তদ্রুপ নিজেদের লোকেরাও কম করে নি।

পরজনদের কর্মকান্ড

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ ও তাঁর কাফেলার সহিত ভারতীয় লক্ষ লক্ষ মুসলমানের মনে যে ভালবাসার উদ্রেক হয়েছিল তা ক্ষুন্ন করা এবং মুসলমানদের মনে ইংরেজদের আনুগত্য সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ হযরত সায়্যিদ আহমদের ওপর ওয়াহাবীর অপবাদ লেপন করে।

এ ক্ষেত্রে সমাজের বেহুদা পীর ও অজ্ঞ মৌলভী শ্রেণী যারা সায়্যিদ সাহেবের সংস্কার অভিযানের দরুন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তারা ইংরেজদের উপরোক্ত ষড়যন্ত্রের সহিত যোগ দেয়। ভারতবর্ষে যতকাল পর্যন্ত ইংরেজ আধিপত্য বজায় ছিল ততকাল পর্যন্ত তারা সায়্যিদ সাহেব ও তার সঙ্গীদেরকে

ধর্মহীন ওয়াহাবী ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে সমাজে এমন শোরগোল সৃষ্টি করে রাখে যে, তাদের নির্দোষ প্রমাণকারীদের আওয়াজ কামারের দোকানে তোতা পাখির আওয়াজের মত মিলিয়ে গিয়েছিল।

স্বজ্জনদের কর্মকান্ড

অন্যদিকে সায়্যিদ সাহেবকে অনুসরণকারী যাদেরকে ওহাবী বলা হত তারা প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ইংরেজদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত থেকে সম্পূর্ণ নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। অবশেষে বাধ্য হয়েই নিজেদের পরাজয় মেনে নিতে হল। তখন গণমানুষের মধ্যে ছড়ানো দুর্নামের জবাব তারা স্থানে স্থানে মুনায়ারা (ধর্মীয় বিতর্ক) বইপত্র, লিফল্যাট ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে দিয়ে দেন। কিন্তু ইংরেজদের প্রতিশোধ নির্যাতন থেকে বাচাঁর জন্য অনন্যোপায় হয়ে তাদেরকে এ কথা প্রমাণ করতে হল যে, সায়্যিদ সাহেব ও তার সঙ্গীরা ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত ছিল। তাদের মুজাহিদ সুলভ অভিযান সমূহ বস্তুত ছিল শিখ সরকারে বিরুদ্ধে।

এ সকল লোকজন হযরত সায়্যিদ সাহেবের জীবনাদর্শের আলোচনা জরুরী বলে বোধ করতেন। তার জীবনেতিহাসকে স্থায়িত্বের রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে তারা সাওয়ানিহ ও তাযকিরা ইত্যাদি রচনা করেন। কিন্তু তারা পূর্ণ সতর্কতার সহিত জীবনী থেকে ঐ সকল অধ্যায় সরিয়ে রাখেন যা থেকে ইংরেজ বৈরীতা কিংবা মারাঠা সম্পৃতি প্রমাণিত হতে পারে। তাই দেখা যায় সাওয়ানিহে আহমদী গ্রন্থের লেখক হযরত সায়্যিদ সাহেবের পত্রাবলি উদ্বৃত করার পূর্বে বলেন ঃ

'পত্রাবলির এ সংকলনের মধ্য থেকে মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (রহ)-এর অনেকগুলো খুতবা (বক্তব্য), দৈনন্দিন কাজকর্মের রিপোর্ট এবং সমকালীন সরকার প্রধান ও খানদের বহু চিঠিপত্র সমূহ আমি পৃথক করে দিয়েছি। এই পূর্ণ সংকলন থেকে আমি কেবল ষাট খানা চিঠিরই উল্লেখ করলাম[৩৪৯]। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

অন্যান্য লেখকদের লিখিত প্রায় চার সহস্র পৃষ্ঠা বই বর্তমানে আমার সম্মুখে টেবিলের ওপর বিদ্যমান। এগুলোকে স্তপ আকারে রেখে আমি কেবল তরতাজা ফুলসমূহ থেকেই আতর চিপিয়ে পেশ করছি[৩৫০]।

বলা আবশ্যক যে, স্তুপ থেকে বাছাইকৃত তরতাজা বক্তব্য সমূহ থেকে চিপানো আতর থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বৈরীতা কিংবা বৈরীতার গন্ধ কিভাবে আসবে? তবে এখানে যদি এমন কোন সেন্টও মিশিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় তা হলে বৈরীতা কেন পরম আনুগত্যের সুঘ্রানেও তার জীবনী গ্রন্থ ভরে যাবে। বর্ণিত গ্রন্থে হযরত সায়্যিদ সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত ইশতিহার সম্পর্কীয় উদ্বৃতির ক্ষেত্রে সেই সেন্টের মিশ্রণ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থে মোটা অক্ষরে উদ্বৃত করে বলা হয়।

نه باسرکار انگیریزی مخاصمت داریم ونه هیچ را تنازعت که از رعایاء او هستم ذلحماتیش از مظالم برایا

বলা বাহুল্য বর্ণিত ইশতিহারের মধ্যে উপরোক্ত প্যারার ধরন অন্যান্য প্যারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফার্সি ভাষা সম্পর্কে অবগত সাধারণ পাঠকও সেই ভিন্নতার অনুমান করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে যে, প্যারাটি মুল ইশতিহারে নয় বরং পরে অন্যদের হাতে সংযোজিত[৩৫১]।

দিল্লীর মারকায ও তার দীর্ঘকালীন কাজকর্ম

আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র দিল্লী এ সুদীর্ঘ কালে নিম্নোক্ত কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়।

এক. স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য প্রেরণ করার দাযিত্ব দিল্লী কেন্দ্রের ওপর অর্পিত ছিল। এ কেন্দ্র দীর্ঘকাল থেকে সে দায়িত্ব পালন করে আসে। সেমতে কাফেলা সদস্য যারা সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল আট হাজার। তন্মধ্যে মহিলারাও অন্তর্ভূক্ত। অথচ সীমান্ত অঞ্চলের যুদ্ধে সায়্যিদ সাহেবের সৈন্যদের মধ্যে শুধু হিন্দুস্তানী সদস্যদের সংখ্যা ছিল আট হাজার। তন্মধ্যে তা ছাড়া সাম্মাহ পেশোয়ার ইত্যাদি স্থানে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যে সৈন্যদেরকে হত্যা করা হয়েছিল তাদের সংখ্যাও ছিল আনুমানিক চার হাজার। এদের সকলেই ছিলেন হিন্দুস্তানী সৈনিক। এ সকল সংখ্যা একত্রিত করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কাফেলা সঙ্গীদের ছাড়াও অতিরিক্ত হিন্দুস্তানী সৈনিক তাদের সঙ্গে তখন গিয়ে যোগ দিয়েছিল। এই অতিরিক্ত সংখ্যক

সৈনিকগণ ছিলেন দিল্লী কেন্দ্রের চেষ্টা প্রচেষ্টার ফসল ও তাদের প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবক কর্মী।

দুই. এ কেন্দ্র থেকে আর্থিক সাহায্য প্রেরণের প্রমাণ হিসাবে ইতিপূর্বে আলোচিত হযরত শাহ ইসহাক সম্পর্কিত ঘটনাটি পেশ করা যায়। অর্থাৎ দিল্লীর জনৈক মহাজন একবার হযরত শাহ ইসহাক (রহ)-এর হুন্ডিকৃত টাকা আটকিয়ে ফেলে। এ ব্যাপারে তখন আদালতে মামলা দায়ের করা হলে ইংরেজ জজ সেই টাকা ফেরত দেওয়ার ফয়সালা দেন। হযরত শাহ ইসহাক মামলায় জয়ী হন[৩৫২]।

তিন. তাছাড়া সামাজিক পরিস্থিতি অনুকূলে রাখা এ কাজের একটি অতি গরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এটির দায়িত্ব দিল্লী মারকাযের ওপর ন্যাস্ত ছিল। সেমতে একালে দিল্লীর মাওলানা মাহবুব আলী সাহেব একবার একটি ছোট্ট ব্যাপারে হযরত সায়্যিদ সাহেবের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। তিনি দিল্লীতে সে ক্রোধের প্রকাশ শুরু করলে পরিস্থিতি অনেকটা বিগড়ে যায়। এ ব্যাপারে সাওয়ানিহে আহমদী গ্রন্থের লেখক বলেন ঃ

মৌলভী মাহবুব আলী সাহেবের প্ররোচনার দরুন বাহিনী সদস্যদের মন যতখানি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আজ পর্যন্ত এমন আঘাত কোন শিখ কিংবা দুরবানী পর্যন্ত তাদেরকে দেয় নি। মৌলভী সাহেবের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে কাফেলার ক্রমযাত্রা স্থগিত হয়ে যায়। মুজাহিদ বাহিনীর পক্ষ থেকে অসংখ্য চিঠিপত্র মৌলভী মাহবুব আলীর বক্তব্যের প্রতিবাদে ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়। তখন মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব ও মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের ন্যায় জিহাদের সাহায্যকারী ব্যক্তিদের চেষ্টা প্রচেষ্ঠায় এই মাহবুবী ফিতনা বন্ধ হয়। তারপর থেকে রসদ ও কাফেলার ক্রমযাত্রা পুনরায় চালু হয়[৩৫৩]।

এখানে মাওলানা মাহবুব আলী সাহেবের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত স্থির করার পূর্বে বলে দেওয়া আবশ্যক যে, মৌলভী সাহেবের এ আচরণ ইংরেজরা নিজেদের জন্য হীতকর মনে করে তাকে নওগাঁও-এর জায়গীর দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মাওলানা তাতে স্পষ্টভাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি এ কথা বলে জায়গীর গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান যে, আমি যা করেছি সেটি তোমাদের জন্য করিনি, বরং

আমি আমার নিজস্ব মতের আলোকে একটি বিষয়কে ন্যায় মনে করেই এসব করেছি[৩৫৪]।

চার. হযরত শাহ আবদুল আযীয সাহেবের নীতিমালা অনুসারে দিল্লী কেন্দ্র মাদরাসার পরিমন্ডলে প্রশিক্ষণ দানের কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। এ কারণেই যে সকল মুসলমান আরও প্রায় পঁচিশ বছর পর ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্ক সরাসরি কিংবা কোন মাধ্যম হয়ে এই প্রশিক্ষণাগারের সঙ্গে সম্পর্কিত দেখা যায়।

পাঁচ. বালাকোট যুদ্ধের পর দিল্লীতে যখন ইংরেজদের পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি দিন দিন কড়া আকার ধারণ করে এবং কাজ চালিয়ে যাওয়া জটিল হয়ে পড়ে তখন মাওলানা ইসহাক সাহেব তার ভাই মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবকে নিয়ে হিজরী ১২৫৮ সাল মোতাবেক ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে (অর্থাৎ বালাকোট যুদ্ধের এগার বছর পর) বহির্দেশীয় শক্তির মাধ্যমে ভারতের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাহায্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ চলে যান। এদিকে এখানকার কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিজের একান্ত শাগরিদ মাওলানা মামলুক আলীর সভাপতিত্বাধীন একটি বোর্ডের ওপর ন্যাস্ত করে যান।

দিল্লী এরাবিক কলেজের অধ্যক্ষ মাওলানা মামলুক আলী সাহেব সরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। সরকারি চাকুরে ছিলেন বিধায় তাকে সরকার সমর্থক বলে বোধ করা হত। তাই তার নেতৃত্বে যে সাংগঠনিক কাজকর্ম চলছিল তা অনেকাংশে নিরাপদভাবে কাজের সুযোগ পায়। ১৮৫৭ সালের মুজাহিদগণের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন তারই শাগরিদ। শাহ মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের অপর বিশিষ্ট শাগরিদ যার ওপর তিনি মাদসারার দায়িত্বভার অর্পন করে গিয়েছিলেন তিনি হলেন হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গণী। এ কালে তার বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে তিনি সরাসিরভাবে অংশগ্রহণ করেন। তারপর বিপ্লব ব্যর্থ হলে তিনিও মক্কা শরীফ হিজরত করেন।

মোদ্দা কথা হল যে বোর্ডটি হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভীর চলে যাওয়ার পর অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে আন্দোলনের কাজকর্ম চালিয়ে গিয়েছে সেটির সভাপতি ছিলেন মাওলানা মমলুক আলী। আর অন্যতম সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা শাহ আবদুল গণী সাহেব ও মাওলানা কুতবুদ্দীন দেহলভী[৩৫৫]।

টীকা

৩২২. সাওয়ানিহে আহমদী, পৃঃ ২৩৬।

৩২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

৩২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

৩২৫. রওশন মস্তাকবিল, ৫ম মুদ্রণ, পৃঃ ১১১।

৩২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।

৩২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ।

৩২৮. হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ ৮৯।

৩২৯. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, ১ম মুদ্রণ, পৃঃ ১৮০।

৩৩০. হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ ৬৮।

৩৩১. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ৩২৫।

৩৩২. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ কী সিয়াসী তাহরীক, পৃঃ ১৭৩ ; সেমতে এরপর থেকেই বাহাদুর শাহের মুদ্রা রহিত করে দেওয়া হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মুদ্রা চালু করা হয় (মুহাম্মদ মিয়া)।

৩৩৩. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ২৫৯।

৩৩৪. শাহ্ যামান চলে যাওয়ার পর লাহোর ভাঙ্গী মিসিল সরদারদের অধীনে চলে আসে। এ সর্দারদের আপোসের মধ্যে অনৈক্য ছিল। তাই পরবর্তীকালে নিজেদের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। ফলতঃ কসুর অঞ্চলের নওয়াব নিয়ামদ্দীন খান লাহোরের ওপর আক্রমণ করেন। কিন্তু তখন লাহোরের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ রণজিৎ সিংয়ের কাছে দরখাস্ত করে পাঠায় যে, তিনি যেন লাহোর অভিযান করে হস্তগত করে নেন। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন, মোহর মুহকামুদ্দীন, মিয়া আশিক মুহাম্মদ, ভাই গোর বখশ সিং, হাকীম হাকেম রায় প্রমুখ (মহারাজা রণজিৎ সিং, পৃঃ ৬৯)।

৩৩৫. রণজিৎ সিং নিজের অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি কাযী আবদুর রহমান সাহেবকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান। তারপর বাহিনী সহ তিনি নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং মোহর মুহকামুদ্দীন প্রমুখের সঙ্গে গোপন আঁতাত শুরু করেন। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০)। আক্রমণ শুরু হলে মোহর মুহকামুদ্দীনের নির্দেশে শহরতলীর প্রধান ফটক খুলে দেওয়া হয়। এ ফটক দিয়ে রণজিৎ সিং বাধাহীনভাবে সৈন্যসহ নগরে প্রবেশ করেন। (মহারাজা রণজিৎ সিং, পৃঃ ৭০-৭১)।

৩৩৬. মহারাজা রণজিৎ সিং, কৃত অধ্যাপক কোহেলী, পৃঃ ৩১৭। একবার ফকীর আযীযুদ্দীনকে কাবুলের গভর্নর দোস্ত মুহাম্মদ খান বন্দী করে নিয়ে যায়। এ সংবাদ শুনে মহারাজা শপথ করে বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এক আযীযুদ্দীনের প্রতিশোধ গ্রহণে সহস্র আফগানদের হত্যা করবো না ততক্ষণ পর্যন্ত লাহোর ফিরে যাবো না। কিন্তু দোস্ত মুহাম্মদ অনতিবিলম্বেই ফকীর আযীযুদ্দীনকে ফেরত দেয়। ফলে বিবাদের রফাদফা ঘটে। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৩)।

৩৩৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯-৭০।
৩৩৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬।
৩৩৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৯।
৩৪০. মহারাজা রণজিৎ সিং, অধ্যাপক কোহেলী পৃঃ ৩১৭।
৩৪১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৭।
৩৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।
৩৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯।
৩৪৪. মহারাজা রণজিৎ সিং, পৃঃ ৭৮।
৩৪৫. তারীখে পাঞ্জাব, মুনশী আবদুল করীম, পৃঃ ৪১-৪৫।
৩৪৬. এডুকেশন কনফারেন্স রিপোর্ট, মুদ্রিত ১৯৩৪ খৃঃ পৃঃ ৪৮।
৩৪৭. হুকুমতে খোদ এখতিয়ারী, কৃত সায়্যিদ তোফায়েল আহমদ সাহেব।
৩৪৮. তারীখে পাঞ্জাব দ্রষ্টব্য, মুনশী আবদুল করীম সাহেব।
৩৪৯. সাওয়ানিহে আহমদী, ৫ম খন্ড, পৃঃ ২৩৭।
৩৫০. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৮২।
৩৫১. অত্র গ্রন্থের পান্ডুলিপি রচনার পর গোলাম রসুল মিহির সাহেব প্রণীত 'সায়্যিদ আহমদ শহীদ, গ্রন্থ চোখে পড়ে। এ গ্রন্থে মিহির সাহেব বিশদ বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে বহু হেরফের ও বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তিনি শুধু এ একটি উদ্ধৃতিই দেখান নি বরং সাথে সাথে আরো কতিপয় উদ্ধৃতি সম্পর্কেও প্রমাণ করে দেখান যে, সেখানে শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন যেখানে 'নাসারা' শব্দ ছিল সেখানে সেটির জায়গায় শিখ কিংবা দারাজমুহ ইত্যাকার শব্দ বসানো হয়েছে (দেখুন সায়্যিদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ২৫৯ থেকে ২৬১ পর্যন্ত)।
৩৫২. সাওয়ানিহে আহমদী, পৃঃ ৮৯।
৩৫৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১, সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, ১ম মুদ্রণ, পৃঃ ১৮০ ও ১৮১।
৩৫৪. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, ১৮০।
৩৫৫. নওয়াব কুতুবুদ্দীন দেহলভী ছিলেন ভূপাল রাজ্যের নওয়াব সিদ্দীক হাসান সাহেবের পিতা।

পরিশিষ্ট

এই বইয়ে যেখানে ৩১৩ পৃষ্ঠার অধ্যয়ন আপনি শেষ করলেন সেখানে কেবল আন্দোলনের রূপরেখা, বুনিয়াদী চিন্তাধারা ও কর্মীদের শ্রম সাধনার কথা আলোচনা করা হয়েছে। সদস্যমন্ডলী ও মুজাহিদগণের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হযরত শাহ আবদুল আযীয ও হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যারা এ আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, পথ-নির্দেশ ও নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের জীবনেতিহাস থেকেও মাত্র ঐ অংশটুকুই উত্থাপন করা হয়েছে যেটি আন্দোলনের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। বিস্তারিত আলোচনা করা যায়নি। কারণ হল জনাব গোলাম রাসূল মিহির সাহেব মুজাহিদদের ব্যক্তিগত জীবনের বিস্তারিত আলোচনা তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে তার দুটি গ্রন্থ 'জামাআতে মুজাহিদীন' ও 'সারগুজাশতে মুজাহিদীন' ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই এরপর নতুনভাবে তা পুনরায় রচনার কোন আবশ্যকতা বোধ করি না। এতদসত্ত্বেও যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে পরে শানদারে মাযী গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র খন্ডে সব মুজাহিদদের ব্যক্তিগত জীবনের বিস্তারিত ইতিহাস পেশ করার ইচ্ছা আছে।

তবে কয়েকজন মুজাহিদ যাদের নাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী সাহেব তার 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ ১ম খন্ডে উল্লেখ করেছেন কিন্তু ঘটনাক্রমে গোলাম রাসূল মিহির সাহেবের গ্রন্থে তাদের আলোচনা আসেনি কিংবা আসলেও তা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের কাছে বেশকিছু তথ্য হস্তগত হয়েছে। তাই সেগুলো এখানে উল্লেখ করে দেওয়া উচিত মনে করছি। তাদের এ আলোচনা থেকে মূল আন্দোলনেরও বিভিন্ন দিক পরিস্কার হয়ে উঠবে।

প্রাপ্ত তথ্যগুলো উল্লেখ করার আরও একটি কারণ থাকে নিজ স্বার্থ উদ্ধার বলেও প্রকাশ করা যায় তা হল যে, উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এমন কতিপয় মুজাহিদও আছেন যারা এই লেখকেরই খান্দানের সাথে সম্পর্কিত। যাই হোক তাদের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর মাধ্যম হলেন চার ব্যক্তি ঃ

এক. ভারতের সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা ডাঃ সায়্যিদ মাহমুদ হাসান সাহেব যার আলোচনা অত্র গ্রন্থের কয়েক স্থানেই স্থান পেয়েছে।

দুই. গাযীপুর জেলার অন্তর্গত ইউসুফপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আহসান সাহেব আনসারী যিনি এমন এক সম্মানিত বংশের সদস্য যারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চূড়ান্ত মূহুর্ত পর্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। যাদের প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট নেতৃবর্গের মধ্যে রয়েছেন হাকীম নাবিনা সাহেব আনসারী, হাকীম আবদুর রাযযাক সাহেব আনসারী, ডাক্তার মোখতার আহমদ সাহেব আনসারী (ওরফে ডাক্তার আনসারী), মেজর উসমান ও প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাক্তার শওকত উল্লাহ্ সাহেব আনসারী।

তিন. সায়্যিদ মুহসিন সাহেব যিনি গাযীপুরের একজন ইলম প্রিয় বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব।

চার. আমার নিজ খান্দানের সদস্য সায়্যিদ মাহবুব হাসান সাহেব রিযভী যিনি 'তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দের রচয়িতা এবং দারুল উলুমের কুতুবখানার অমুদ্রিত পান্ডুলিপি ও সংরক্ষণাগারের কর্মকর্তা।

কাযী ফরযান্দ আলী সাহেব

তাঁর আলোচনা ইতিপূর্বে কয়েকবারই এসেছে। কাযী সাহেবের সঙ্গে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের আন্তরিক সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে, তিনি মুহাম্মদাবাদ পৌঁছলে তার দেহ তো এখানেই ছিল কিন্তু মন ছুটে চলছিল অন্য কারুর সন্ধানে। পরম অস্থিরতার সাথে তিনি মুখেও বলে ফেলেন بوئے دوت مى آيد আমার কাছে আমার বন্ধুর সুঘ্রাণ অনুভূত হচ্ছে। এ কথা বলে খালি পায়ে তিনি সেখান থেকে ইউসুফপুর চলে যান। কারণ কাযী সাহেব নিজের শারীরিক অসুস্থতার দরুন এই ইউসুফপুরে অবস্থানরত ছিলেন। এই কাযী সাহেব যার ত্যাগ ও আন্তরিকতার উদাহরণ জগতের ইতিহাসে বিরল। তিনি সায়্যিদ

সাহেবকে কিছু উন্নত জাতের ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, কয়েক কপি পবিত্র কুরআন ও নগদ এক লক্ষ টাকা হাদিয়া দিয়েও শান্ত হতে পারেন নি উপরন্তু নিজের প্রিয়পুত্র 'আমজাদ'কেও মহান আল্লাহর রাহে শাহাদাতের জন্য হাদিয়া করেন। যে কাযী সাহেব জীবদ্দশায়ই জীবন্ত শহীদ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন তারপর শাহাদাতের মাধ্যমেই জীবনের সমাপ্তি করেন। তার সম্পর্কে তারই পৌত্র ডাক্তার সায়্যিদ মাহমুদ সাহেব রচিত একটি লেখার[৩৫৬] নিম্নোক্ত উদ্বৃতি লক্ষণীয় ঃ

কাযী ফরযান্দ আলী সাহেব বস্তুত ইউসুফপুরের বাসিন্দা ছিলেন না। তার নিজ বাড়ি ছিল সায়্যিদপুর এলাকার বেহতেরী গ্রামে। এ এলাকাটি প্রথমতঃ জৌনপুরের অধীনে ছিল পরে গাযীপুরের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। ইউসুফপুর ছিল তার শ্বশুরালয়। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ যখন কাফেলাসহ মুহাম্মদাবাদ পৌঁছলেন তখন কাযী সাহেব তার শ্বশুরালয়ে অবস্থান করছিলেন। নিজের শারীরিক অসুস্থতার দরুন সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যেতে পারেন নি। আমি আমার বড়দের মুখ থেকে শুনেছি যে, সায়্যিদ সাহেব মাওলানা ইসমাঈল শহীদ সাহেব প্রমুখ কাযী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সায়্যিদপুরের বেহতেরী গ্রামেও গিয়েছিলেন।

সম্ভবতঃ ইউসুফপুরে সাক্ষাৎ হওয়ার পর কাযী সাহেব হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদকে যেভাবে গাযীপুর নিয়ে গিয়েছিলেন সেভাবে তিনি তাদেরকে নিজের গ্রামের বাড়ি সায়্যিদপুরের বেহতেরীতেও নিয়ে যান।

কাযী সাহেবের বংশ পরিচয়

এটি পীর মুরীদী ও তরীকত পন্থী মাশায়েখদের একটি পরিবার যারা পূর্বকাল থেকেই ইলমের বিশাল দৌলতের অধিকারী হয়ে আছেন। তাদের বংশগত প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন বন্দেগী[৩৫৭] হযরত শাহ জামাল সাহেব ও বন্দেগী হযরত শাহ কামাল সাহেব।

সম্রাট আকবর বঙ্গদেশ অভিযানের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীর পথ অতিক্রমের সময় তার সামরিক নৌযানগুলো সায়্যিদপুরের নিকটবর্তী একটি স্থানে নোঙ্গর করে। এ সময় তিনি জানতে পারলেন যে, নিকটেই দু'তিন মাইল দূরে একটি খানকা আছে সেখানে একজন উচ্চমানের বুযুর্গ বসবাস করেন। সম্রাট আকবর

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু খানকায় অবস্থিত বুযুর্গ সম্রাটের সহিত সাক্ষাতে নিজের অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে তিনি সম্রাটের জন্য কিছু 'কুল' হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দেন। সম্রাট নির্জনবাসী এ বুযর্গের সুদৃষ্টি নিজের জন্য শুভ লক্ষণ জ্ঞান করে অভিযান সফল হবে বলে ধারণা করেন। বাস্তবে তাই ঘটল। আকবর বঙ্গদেশের বিজয় অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর খানকার জন্য কিছু জায়গীর বরাদ্দ করতে চাইলেন কিন্তু শাহ সাহেব সে জায়গীর গ্রহণে সম্মত হলেন না। অবশেষে শাহ সাহেবের কতিপয় সন্তান জায়গীর নিতে রাজি হলে সম্রাট তাদের নামে কয়েকটি গ্রামের জায়গীর লিখে দেন। এ জায়গীর বংশানুক্রমিকভাবে পরবর্তীকালেও বিদ্যমান ছিল। পরিশেষে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার দ্বারা এ ধারাবাহিকতা নিঃশেষ হয়ে যায়। সম্রাট শাহ্ সাহেবের কতিপয় সন্তানকে জায়গীরদারী প্রদান করছেন এ কথা যখন শাহ সাহেবের কানে গেল তখন তিনি খুব ক্ষুব্ধ হন। দুঃখ করে বললেন, আফসুস আমার বংশ থেকে ফকীরীর সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেল। এখন এ বংশে স্থান করে নিচ্ছে দুনিয়া। সেমতে দেখা গেল কিছুদিন পরই এ বংশের অপর একজন বুযুর্গ 'কাযী আহমদ আলী সাহেব জৌনপুর সরকারের অধীনে 'কাযীউল কুযাত' (প্রধান বিচারপতি) পদে চাকুরী গ্রহণ করেন। এভাবে ধীরে খান্দানের অন্যরাও প্রচুর ভূসম্পত্তি করে নেয় এবং উল্লেখযোগ্য আমীরে পরিণত হয়।

কাযী সাহেবের ব্যক্তিগত গুণাবলি

কাযী ফরযান্দ আলী সাহেব নিজে একজন উচ্চমানের প্রভাবশালী বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। সেকালের একজন উচ্চপদস্থ দানশীল পুরুষ ও আল্লাহ ওয়ালা মানুষ হিসাবে তার সমধিক পরিচিতি ছিল। তার আহারের দস্তরখান প্রত্যহ পঞ্চাশ থেকে একশত মেহমান সর্বদাই উপস্থিত থাকত। একবার অতি জাকজমকের সাথে একটি কাফেলাসহ তিনি হজ্জ করতে যান। যেখানে থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে অনেক দুর্লভ 'বরকতী' জিনিস জোগাড় করে আনেন। খান্দানের বর্তমান বংশধরের কাছে আজও সে জিনিসগুলো সংরক্ষিত আছে। জিনিসগুলো ছিল প্রিয় নবী (সাঃ)-এর মুবারক কিছু চুল, হরিণের পাতলা চামড়ার ওপর লিখিত একটি কুরআন শরীফ (এটি ছিল দু'তিন হাত লম্বা ও এক বিঘত চওড়া) একটি খড়ম যা হযরত আলীর বলে মনে করা হত, অনুরূপে একটি

পোশাক যেখানে কুফী লিখন পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত লিখিত ছিল। এটি হযরত আলী (রাঃ)-এর ছিল বলে মনে করা হত। মোট কথা এ ধরনের আরও অনেক দুর্লভ জিনিস তিনি সেখান থেকে সঙ্গে করে আনেন।

কাযী সাহেবের ত্যাজ্য সম্পদ

কাযী সাহেব মৃত্যুকালে বিশাল সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু এর একটি বিরাট অংশ বানারসের জনৈক মহাজন প্রতারণার আশ্রয়ে নিলাম করে নেয়। সেকালে মুসলিম ভদ্র পরিবারের লোকজন ইংরেজদের আদালতে হাজির হওয়া বড় অপছন্দ করত। কারণ এটি ছিল তাদের ভদ্রতার চরম পরিপন্থী ব্যাপার।

ভূসম্পত্তি নিলাম হওয়ার সময় আমার পিতা খুবই অল্প বয়সের ছিলেন। বালিগ হওয়ার পর লোকজন তাকে বলেছিল যে, নিজেদের প্রাপ্য উদ্ধারের ব্যাপারে তুমি আদালতের শরণাপন্ন হত। কিন্তু তিনি বললেন ইংরেজদের আদালতে গিয়ে হাজিরা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়[৩৫৮]।

সায়্যিদপুর ও বেহতেরী

সায়্যিদপুরের বেহতেরী গ্রামটি অতি প্রাচীন একটি জনপদ। এ গ্রামে সুউচ্চ একটি মঠ আছে। তার গায়ে পালী ভাষায় কিছু লিখিতও আছে। সেকান্দর গুপ্ত এখানেই হুনদেরকে পরাজিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের বোধ করি এটি প্রথম স্থান যেখানে বহিঃশক্তি পরাজিত হয়ে পলায়নে বাধ্য হয়েছিল। এখানে অনেকগুলো উঁচু উঁচু টিলা বিদ্যমান। স্থানীয় ঈদগাহ সেই উঁচু টিলার একটিতে অবস্থিত। 'গাঞ্জে শহীদান' নামে প্রসিদ্ধ একটি গোরস্থান আছে। বুঝা যায় যে, পূর্বকালে কখনও এখানে বড় ধরনের কোন লড়াই সংঘটিত হয়েছিল। একটি পুরাতন জামে মসজিদ আছে। তবে কোনকালের নির্মিত তা সঠিক করে বলা যায় না। কথিত আছে সম্রাট ফিরোজ শাহ কিংবা সম্রাট আকবর এ মসজিদ নির্মাণ করান। ঈদগাহটি একটি নদীর সংলগ্নে, নদীটির ওপর সম্রাট ফিরোজ শাহ কর্তৃক নির্মিত একটি সেতু রয়েছে।

কিছুকাল পূর্বেও এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার দরুন ভূমির ভিতর থেকে ছোট ছোট বহু রৌপ্য মুদ্রা বেরিয়ে এসেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শামনামলে বেহতেরী এলাকায় সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে এক পুরুষ গভীর কোন গর্ত করা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ অনেক সময়ই মাটির তলদেশে গুপ্ত সম্পদ

পাওয়া যেত। ইংরেজরা সরকারি উদ্যোগে এ স্থান থেকে এ ধরনের বহু গুপ্ত সম্পদ উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

কথিত আছে যে, কাযী ফরযান্দ আলী সাহেব কিংবা কাযী আহমদ আলী সাহেবের যুগে একবার কুপ খননের সময় একটি স্বর্ণের থালা বেরিয়ে আসছিল। এ থালার ওপর পাথরের কয়েকটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। পাথরগুলোও ছিল অদ্ভুত ধরনের। সূর্যের উদয় অস্তের সঙ্গে এগুলোর গায়ের রঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে যেত। বানারসের রাজা মূর্তিগুলো অনেক টাকা মূল্যে খরিদ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাযী সাহেব তাতে মোটেও সম্মত হন নি। তিনি উত্তরে বলেছিলেন মূর্তি কেনা বেচা বৈধ নয়।

আমার পিতার আমলে এ ধরনের একটি রৌপ্যের পাত পাওয়া যায়। পাতটির গায়ে কিছু বাক্যও লেখা ছিল। কথিত আছে এ পাতটি লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই তো গত পনের বছর পূর্বে এক ব্যক্তি সেখানে স্বপ্ন দেখেন যে, জনৈক বুযুর্গ তাকে বলছেন, আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নাও। আমি অমুক স্থানে মাটির স্তুপের নিচে চাপা পড়ে আছি। তিনি যে স্থানটির নির্দেশ করেছিলেন সেটি ছিল একটি টিলা। এ টিলা খোদানো হল, দেখা গেল ভিতরে একটি পাকা কবর। তখন থেকে এটি 'শহীদ ব্যক্তির কবর' নামে পরিচিত হয়।

কাযী ফরযান্দ আলী সাহেবের কবর গাযীপুরে অবস্থিত তার রাজবাড়ির ভিতরে। এ বাড়িটি বর্তমানে জীর্নশীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। কেবল চারদিকের দেওয়াল ও কয়েকটি গম্বুজ দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে এটি একজন হিন্দু ব্যক্তির দখলে[৩৫৯]।

শাহ মনসুরে আলম সাহেব

তিনি গাযীপুরে অবস্থিত একজন উচ্চমানের আলিম রঈস ছিলেন। তাঁর পিতামহ ও কান্দানের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন শাহ জুনাইদ সাহেব মরহুম। গাযীপুর স্টেশনের সন্নিকটেই তার দরগাহ বিদ্যমান। বর্তমানেও এ খান্দান পূর্ব সম্মানের সহিত অবস্থাপন্ন জীবন যাপন করছে। (সায়্যিদ মুহসিন সাহেব)।

শাহ মনসুরে আলম সাহেব মিয়াপুরা মহল্লার অধিবাসী ছিলেন। এ খান্দানের লোকজন এবং এ মহল্লা এখনও বিদ্যমান। আসাদ মঞ্জিলের কংগ্রেস

সমর্থক তরুণ শাহ আবুল ফয়েয সাহেব ঐ খান্দানেরই লোক। ডাক্তার শওকতুল্লাহ্ সাহেব আনুসারীও এ খান্দানের সদস্য (মাওলানা হাকীম আহসান সাহেব)।

খুব সম্ভবত এ কারণেই ডাক্তার শওকতুল সাহেব কখনও কখনও শাহ শওকতুল্লাহ্ আনুসারী নামে উল্লেখ করা হয় (মুহাম্মদ মিয়া)।

মাওলানা মুহাম্মদ ফসীহ্ সাহেব

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ)-এর খলীফাগণের তালিকায় মাওলানা মুহাম্মদ ফসীহ্ সাহেবের নামও দেখা যায়। ইনি রুউমুন্ডী মহল্লার অধিবাসী ছিলেন। তার সন্তানগণ বৃটিশ সরকারের নিকট থেকে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এ খান্দানেরই বিশিষ্ট ব্যক্তি শামসুল উলামা মৌলভী আবুল খায়র ইংরেজ সরকারের একান্ত কলাণকামী ছিলেন। অপর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মৌলভী আবুল লাইছ সাহেব এখনও জীবিত আছেন। মাওলানা মুহাম্মদ ফসীহ্ সাহেবের মাযারে এখনও বাৎসরিক ওরস হয়ে থাকে (মাওলানা হাকীম আহ্সান সাহেব)।

মাওলানা মুহাম্মদ ফসীহ্ সাহেব গাযীপুর ও তৎপার্শ্বস্থ্ জেলা শাহ্ আবাদ আরা এর সবিশেষ জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি হানাফী ফিকহের অনুসরণ করতেন। ওহাবী আন্দোলনের নেতা মাওলানা বেলায়েত আলী সাদিকপুরীর সহিত মাওলানা ফসীহের মুনায়ারা হয়েছিল (দেখুন, মুনশী মুহাম্মদ জাফর সাহেব থানেশ্বরী রচিত সাওয়ানিহে আহমদী) মাওলানার সন্তান ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ নিয়ামত উল্লাহ। তার প্রতিষ্ঠাকৃত আরা মাদ্রাসায়ে হানাফিয়্যা আজো বিদ্যমান আছে।

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে অধ্যয়ন শেষ করার পর এ অধমের শিক্ষক জীবনের সূচনা এ মাদরাসা থেকেই হয়েছিল। এটি ১৯২৬ সালের কথা। উস্তাদুল হাদীস হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী বিহারে এক জলসায় অংশগ্রহণের জন্য গিয়েছিলেন। তখন মাদ্রাসায়ে হানাফিয়্যার কর্তৃপক্ষ তাকে এমন একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দিতে বলে যিনি এখানে আরবী সাহিত্যের শিক্ষা দিবেন। সেমতে হযরত শাহ্ সাহেব হযরতুল উস্তায মাওলানা হাফিয আলহাজ্ব মুহাম্মদ এজায আলী সাহেবের সাথে পরামর্শক্রমে এ অধমকে

সে খেদমতের জন্য নির্দেশ দিয়ে পাঠান। তারপর প্রায় তিন বছর পর্যন্ত আমি ঐ মাদ্রাসায় অবস্থান করি[৩৬০]। অতঃপর তারাই আবার আমাকে শাহী মুবাদাবাদের জামেয়া কাসেমিয়্যা মাদ্রাসার জন্য স্থানান্তরিত করে দেন।

এরপর আমার জীবনের প্রধান অংশটি এই শাহী মাদ্রাসার মধ্যেই অতিবাহিত হল। এই মাদ্রাসারই বদান্যতা ও আদাবী প্রিয়তার বরকতে অধম রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তারপর ১৯২৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক বিভিন্ন আন্দোলনের সহিত অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজেকে লিপ্ত রাখার গৌরব অর্জন করি।

শায়খ গোলাম যামিন সাহেব

ইনি গাযীপুরের একজন অতি প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। খুবই বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তার খান্দানের বর্তমানে কেউ বেঁচে নেই। কয়েক বছর হল তার প্রপুত্র মৌলভী সদরুদ্দীন সাহেব ইন্তেকাল করেছেন।

কাযী মুহাম্মদ মুহসিন সাহেব

ইনি ছিলেন চৌকিয়া মৌজার বিশিষ্ট রঈস। গাযীপুরেও তার বাড়ি ছিল। সে সূত্রে গাযীপুরের এ মহল্লাকে কাযী টোলা বলা হয়। বর্তমানে তার খান্দানের কেউ বেঁচে নেই।

এখান থেকে সায়্যিদ মাহবুব হাসান সাহেব রিযভী-এর একটি চিঠির কতিপয় উদ্বৃতি লক্ষ করুন ঃ

এক. সায়্যিদ মকবুল আহমদ সাহেব ঃ

তার আসল নাম হাফিয সায়্যিদ মকবুল আলম। পিতার নাম হাফিয সায়্যিদ মুহাম্মদ আলম। ইনি আমাদের খান্দানের হযরত সায়্যিদ মুহাম্মদ জামিল-এর আওলাদ। আর সায়্যিদ মুহাম্মদ জামিল ছিলেন হযরত আলহাজ সায়্যিদ মুহাম্মদ ইবরাহীম[৩৬১] (রহ)-এর পৌত্র।

দুই. মাওলানা শামসুদ্দীন সাহেব ঃ

তিনি ছিলেন দেওবন্দ এলাকার সুপ্রসিদ্ধ ওয়ায়িয ও বক্তা মাওলানা আবদুল খালিক সাহেবের পিতা। তার সন্তানদের মধ্যে আরেকজন হলেন মাওলানা আবদুশ শুকুর সাহেব। ইনি দীর্ঘকাল যাবৎ দিল্লীর মাদ্রাসা হুসাইন বখশ-এর

সদরুল মুদাররিন ছিলেন। বর্তমানে প্রায় দশ বছর যাবৎ পবিত্র মক্কা শরীফের বাসিন্দা। মাওলানা আবদুল খালিক সাহেবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল যে, তিনি দেওবন্দের বিশাল জামে মসজিদের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে অনেক টাকা চাঁদা তুলে দেন। মাওলানা শামসুদ্দীন সাহেব প্রথম জীবনে রুসুম রেওয়াযের খুবই অনুগত ছিলেন। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ)-এর আগমন সংবাদ শুনে তিনি তাকে তিরস্কার করে কিছু কবিতা রচনা করেন। এগুলো দেওবন্দের বাচ্চাদের মুখেও প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত সায়্যিদ সাহেব দেওবন্দ আগমন করে তারই মহল্লার সন্নিকটে কাযী মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করেন তখন মাওলানা শামসুদ্দীন সাহেবও একদিন তাঁকে দেখার জন্য উপস্থিত হলেন। তিনি মসজিদের এককোণে দূরে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় হযরত সায়্যিদ সাহেব তার দিকে মুখ করে তার রচিত কবিতাগুলোর এমন আলোচনা করলেন যে, মাওলানা শামসুদ্দীন আর স্থির থাকতে পারেন নি। তিনি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন তারপর হযরত সায়্যিদ সাহেবের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। সায়্যিদ সাহেব তাকে তুলে নেন। অত্যন্ত আদর সোহাগের সহিত তাকে নিজের পার্শ্বে বসান। মাওলানা শামসুদ্দীন তখন তওবা করে মুরীদ হতে চাইলে হযরত সায়্যিদ সাহেব তাকে মুরীদ করে নেন।

তিন. শায়খ রজব আলী সাহেব

পিতার নাম শায়খ খিরাদমান্দ। দেওয়ান লুতফুল্লাহ উসমানী যিনি সম্রাট শাহ জাহানের আমীরদের একজন ছিলেন–শায়খ রজব আলী তারই পরবর্তী বংশধর। দেওবন্দের দেওয়ান মহল্লায় তারা বাস করতেন। শায়খ রজব আলী বর্তমান দেওবন্দ ঈদগাহের খতীব মাওলানা মুহাম্মদ মুবীন সাহেবের দাদা।

চার. মুনাওয়ার আলী সাহেব ঃ

আমার কাছে প্রাপ্ত তথ্যমতে তার পিতার নাম রজব আলী নয়, বরং সায়্যিদ ফযল আলী। ইনি আমার দাদা সায়্যিদ নাওয়াযিশ আলী মরহুমের সম্পর্কে চাচা হতেন। কাযী মসজিদ সংলগ্নেই (যেখানে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহ) অবস্থান করেছিলেন) তার বাড়ি। বর্তমানে তার সন্তান-সন্ততির কেউ বেঁচে নেই।

পাঁচ. মৌলভী বশীরুল্লাহ সাহেব ঃ

পিতার নাম শায়খ গরীবুল্লাহ উসমানী। ইনি হাকীম সিফাতুল্লাহ সাহেবের পরদাদা ছিলেন। তারাও দেওয়ান লুতফুল্লাহ সাহেবের আওলাদ।

ছয়. মৌলভী ফরীদুদ্দীন সাহেব ঃ

পিতার নাম শায়খ মাহমুদ বখশ। এরাও দেওয়ান লুতফুল্লাহ সাহেবের আওলাদের মধ্যে ছিলেন। মৌলভী ফরীদুদ্দীন সাহেব ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেবের পিতা। দারুল উলূমের উত্তর গেট সম্মুখস্থ মাঠে তার কবর অবস্থিত। কথিত আছে বহু মানুষ রাতে তার কবর থেকে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনেছেন। তিনি বুখারার আলিমদের কাছে অধ্যয়ন করেন, তারপর রাজপুর অঞ্চলে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত থাকেন। সে যুগের একজন উচ্চমানের বুযুর্গ হিসাবে তিনি ছিলেন সুপরিচিত।

মাওলানা ফরীদুদ্দীনের আরও চার ভাই ছিল। যথা মুহাম্মদ সাব্বির, বুলন্দ বখত, মকসুদ আলী ও সায়্যিদ আহমদ। মৌলভী সায়্যিদ জাফর আলী বাস্তবী তার গ্রন্থে বালাকোট শহীদগণের তালিকায় দেওবন্দের দু'জনের নাম লিখেছেন। একজন শায়খ বুলন্দ বখত আর অপরজন চিল্লু খান। আমার ধারণা অনুযায়ী চিল্লু খান বস্তুত সায়্যিদ আহমদ খানেরই উপনাম। চিল্লু ছিল শৈশবের নাম যা যুবক বয়সে তার বীরত্ব ও সাহসিকতার কারণে মানুষের মুখে 'চিল্লুখান' নামে চালু হয়ে যায়। এরা আমার মাতুল বংশীয় লোক। শেষোক্ত তিনজনের সকলেই বালাকোট যুদ্ধে শহীদ হন। তম্মধ্যে একমাত্র বুলন্দ বখত ছিলেন বিবাহিত। আর অপর দু'জন অবিবাহিত অবস্থায়ই শাহাদাতবরণ করেন। এই তিন ভাই সম্পর্কে কথিত আছে যে, মাওলানা ফরীদুদ্দীন সাহেবের ইন্তেকালের পর তার জানাযা নার্মাযে তার তিন শহীদ ভ্রাতাকে উপস্থিত দেখা গিয়েছে। জানাযার পরই আবার তারা অদৃশ্য হয়ে যান। হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন সাহেবের কাছে দর্শকরা যখন তাদের মুখায়রবের আকৃতি ও হুলিয়া বর্ণনা করেন তখন তিনি বলেছিলেন এদের তিন ছিলেন আমার শহীদ চাচা (রহ)।

আরও বলা হয়েছে যে, এ মূহুর্তে তিন শহীদ ভ্রাতা নিজেদের পিতা শায়খ মাহমুদ বশখ সাহেবের সঙ্গেও সাক্ষাত করেন। অবস্থা ছিল এরূপ যে, তাদের

সমস্ত শরীর আঘাতে জর্জরিত, শরীর থেকে তাজা রক্ত প্রবাচিত হচ্ছে যেন সবেমাত্র তাদের আঘাত করা হল (আল্লাহ ভাল জানেন)।

আরও অবাক হওয়ার কথা যে, কথিত আছে শায়খ বুলন্দ বখত শাহাদাতের পর অনেক সময়েই নিজের বিবির সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করে যেতেন। রাতভর বিবির কাছেই থাকতেন। ঘরের অন্যরা যখন রাতে অন্য একজনের কথাবার্তা শুনত তখন বিধবা স্ত্রীর ব্যাপারে তাদের সন্দেহ দেখা দিল। বিধবা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে প্রকৃত ঘটনা ফাঁস করলেন। অথচ স্বামীর পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা ছিল। সকলের মধ্যে কথাটি জানাজানি হয়ে গেলে শায়খ বুলন্দ বখত এভাবে এসে সাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দিলেন।

সাত. শায়খ হাফীযুল্লাহ ঃ

ইনি দেওবন্দের সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ শায়খ আবুল বারাকাত (যার নামে মহল্লা আবুল বারাকাতের নামকরণ করা হয়েছে) আওলাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করেন। মাওলানা গোলাম রসুল মিহির হযরত সায়্যিদ সাহেব সম্পর্কে শায়খ হাফীযুল্লাহ সাহেবের কয়েকটি ‘রেওয়ায়িত’ তার সায়্যিদ আহমদ শহীদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

তিনি দেওবন্দে গাযী উপাধিতে পরিচিত। বালাকোট যুদ্ধের পর একদা তিনি দেওবন্দের এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমের মৌসুম ছিল। লোকজন তাকে রাস্তা অতিক্রম করতে দেখে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। তারপর খুব পীড়াপীড়ি করতে থাকে যে, আপনি বাড়ি চলুন। আপনার বিরহে আপনার স্ত্রী সন্তান-সন্ততির সকলে অস্থির হয়ে আছে। গাযী হাফীযুল্লাহ সাহেবের উপর তখন ভ্রুক্ষেপহীনতার হাল চলছিল। তিনি বলে দিলেন, আমাদের তো প্রিয়জন এক ব্যক্তিই ছিলেন (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ) তিনিই আমাদেরকে ফেলে চলে গেছেন। এ কারণে আমরা তাঁর সন্ধানে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। এতদসত্তেও লোকজন তাকে ধরে বাড়ি নিয়ে আসে। অতঃপর সায়্যিদ সাহেবের অবশিষ্ট সঙ্গীগণ যখন টুংকে গিয়ে জমা হল তখন তিনিও তাদের সাথে টুংকে চলে যান।

সায়্যিদ মাহবুব হাসান রিযভী
১৭ই জুলাই ১৯৫৫ খৃঃ

ওয়াকাযিয়ে আহমদী গ্রন্থের অমুদ্রিত কপি থেকে কতিপয় উদ্বৃতি নিম্নে পেশ করা হল।

শায়খ গোলাম হুসাইন সাহেব

ইনি ছিলেন কলিকাতা শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ইংরেজরা তাকে 'ফখরুত তুজ্জার' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। প্রথম দিকে তিনি হযরত সায়্যিদ সাহেব থেকে পৃথক ছিলেন। তারপর খিদমতে হাযির হন। কথিত আছে তার স্ত্রী তাকে সায়্যিদ সাহেবের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য বাধ্য করেছিলেন। মোট কথা তিনি যে বাস্তবিকভাবেই ফখরুত তুজ্জার (ব্যবসায়ীদের গৌরব) ছিলেন তা নিম্নোক্ত রিপোর্ট থেকেও অনুমেয় ঃ

তার গুদাম সমূহের মাসিক ভাড়া তৎকালীন পাঁচ হাজার টাকা ছিল। মিশর, ইয়ামেন, আরব, সিরিয়া প্রভৃতি বহু দেশে তার বাণিজ্য কুটি (শাখা অফিস) ছিল। ইংরেজী, ফরাসী, চায়না, তুর্কী, কোকনী, ফার্সী, আরবী ইত্যাদি মোট তেরটি ভাষায় তার এখানে চিঠি পত্রের লেনদেন হত। প্রত্যেক দেশে তিনি নিজের স্বতন্ত্র বাণিজ্যিক অফিস স্থাপন করেছিলেন (ওয়াকায়িয়ে আহমদ)।

মির্জা বালাকী ও মির্জা হাজী

বানারসে অবস্থান সম্পর্কীয় ঘটনাবলির মধ্যে তাদের নাম পাওয়া যায়। সকল জীবনীকারকগণ তাদেরকে শাহযাদা বলে উল্লেখ করে আসছেন। আমি ইতিপূর্বে লিখেছি যে, বাহ্যিকভাবে তাদের সম্পর্ক অযোধ্যার রাজ পরিবারের সঙ্গে ছিল। কারণ তারা এখানে নির্বাসিতের জীবন-যাপন করে আসছিল। ওয়াকায়িয়ে আহমদী গ্রন্থে নিম্নোক্ত বাক্যে তাদের পরিচিত পেশ করা হয়েছে।

মির্জা বালাকী ও মির্জা হাজী যারা বানারসের শাহযাদা ছিলেন তারা সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে একান্তে মিলিত হওয়ার আবেদন করলে তিনি সে আবেদন মঞ্জুর করেন। সেমতে তারা নৌকায় পৌঁছে সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে নৌকায় মিলিত হয়। তিনি তাদের সঙ্গে প্রায় দু' ঘণ্টা যাবৎ কথাবার্তা বলেন (ওয়াকীয়ায়ে আহমদী, অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি)।

অন্যত্র লেখা হয়েছে ঃ

'তেলয়ানালায় অবস্থানরত শাহজাদা মাহমুদ বখত ওরফে মির্জা বালাকী তাঁকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যান। (নৌকায় মিলিত হওয়ার পর) তারপর মির্জা

বালাকী, তার স্ত্রী, জননী ও পরিবারের সকলে এমন কি চাকর নোকর সকলে তার কাছে মুরীদ হন। তার জননী কাশফ কারামত সমৃদ্ধ একজন বুযুর্গ মহিলায় পরিণত হন। মির্জা বালাকী নিজে দু'বেলা, তার জননী একবেলা, তার স্ত্রী এক বেলার আহারের জন্য দাওয়াত করেন। প্রথম দিকে অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। পরে হযরতের নির্দেশে সাধারণ পোলাও কোরমা রুটি পাকানো হয়। সায়্যিদ সাহেব মির্জা বালাকীর বাড়িতে কয়েকবার তাশরীফ আনেন।

কাফেলার প্রতিটি সদস্য কুরআনে হাফিয

সুলূকের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বলা হয় যে, যিকির আযকার দ্বারা মানসিক যে পরিবর্তন যদিও খুব তড়িৎ অর্জিত হয় কিন্তু তা ততটুকু দৃঢ়তা সম্পন্ন হতে পারে না। যে কোন মূহুর্তে তা নিঃশেষ হওয়ার আশংকা থাকে। কিন্তু কালামুল্লাহ শরীফের সদা তিলাওয়াতের দ্বারা মনঃজগতে যে পরিবর্তন আসে সেটি খুবই পোক্ত হয়ে থাকে। অথচ এ পরিবর্তনটি সাধিত হতে সময় লাগে।

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের দরবারে যিকির মুরাকাবা ইত্যাদির অনুশীলন চলত। কিন্তু সর্বাধিক মনোযোগ থাকত কালামুল্লাহ শরীফের তিলাওয়াতের প্রতি। কালামুল্লাহ শরীফ তিলাওয়াত করা তার মুলূকের পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত সাক্ষ্যটি লক্ষণীয় ঃ

মক্কা শরীফে একবার সন্ধান নিয়ে দেখা গেছে যে, কাফেলার পুরুষ মহিলা সকলে হাফিযে কুরআন ছিলেন। এমন কি দশ বছরের শিশুরা পর্যন্ত। সেখানে একবার একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তখন কুরআন হিফয করার প্রসঙ্গ উঠে। সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গীদের একজন বলে উঠলেন, মুসলমানের কেউ কি এমন আছে যে, কুরআনের হাফিয নয়? যিনি আলাপ করছিলেন তিনি এ কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন তা হলে আপনাদের সকল সঙ্গীরা কি কুরআনে হাফিয? উত্তর হ্যাঁ-এর পক্ষে দেওয়া হল। তারপর বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে, শুধু প্রতিটি পুরুষই নয় বরং প্রতিটি মহিলা এমনকি দশ বছরের শিশুরাও সকলে কুরআনে হাফিয বটে (ওয়াকায়িয়ে আহমদী, পৃঃ ৮৪৮)।

সৈনিকদের মধ্যে শ্রেণী বিভক্তি

প্রথমে সৈনিকদের মধ্যে পঁচিশ পঁচিশজনের এক একটি দল গঠন করে দেওয়া হয়। আটা পিসা, খাবার তৈরী করা, কাঠ সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাজকর্মে তাদের দায়িত্ব অর্পিত থাকত। এগুলো তারা পর পর পালাক্রমে সম্পাদন করতেন। হাজামত ও মথা মুণ্ডনের কাজও তারা আপসের মধ্যে করে নিতেন (ওয়াকায়িয়ে আহমদী, পৃঃ ১২২৫)।

পারস্পরিক সাহায্য ও সহমর্মিতা তাদের মধ্যে এতখানি উন্নতি করেছিল যে, একজন কোন শ্রমসাধ্য কাজ আরম্ভ করলে অন্যজন আদিষ্ট হওয়া ব্যতিরেকেই তার শরিক হয়ে যেত। যে সকল কাজে পালা নির্ধারিত ছিল সেখানেও সহযোগিতার এ নীতি কার্যকর ছিল। যিনি নিজের পালা শেষ করেছেন তিনি সুযোগ পেলেই অন্যকে তার কাজে সাহায্য করতে শুরু করতেন (ওয়াকায়িয়ে আহমদ, পৃঃ ১২৫৮)।

هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

মুহাম্মদ মিয়া

৩রা যিলহাজ্জ-১৩৭৬ হিঃ

৪ঠা জুলাই-১৯৫৭ খৃঃ

টীকা

৩৫৬. এটি এ অধমের নামে পাঠানো ডাক্তার সাহেবের লেখা একটি চিঠি। তারিখ ১৫ই জুলাই, ১৯৫৪খৃ।

৩৫৭. এ শব্দটি (বন্দেগী) আমাদের খান্দানেও হযরত সায়্যিদ ইবরাহীম (রহ)-এর নামের সঙ্গে ব্যবহৃত হত। হযরত সায়্যিদ ইবরাহীম ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি দেওবন্দ ভূখন্ডে বসতি শুরু করেছিলেন। বন্দেগী শব্দটি ফার্সী শব্দ বন্দাহ থেকে গৃহীত। গোলাম, অনুসরণকারী ও অনুগতকে বন্দাহ বলা হয়। যেমন বলা হয় 'বন্দেগানে আলী মুতাআলী' বন্দেগী শব্দের অর্থ হল গোলামী, আনুগত্য ও অনুসরণ। আমাদের সাহারানপুর, মুযাফফরনগর, মীরাঠ প্রভৃতি জেলায় পূর্বকালে সালামের পরিবর্তে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে বন্দেগী শব্দ উচ্চারণের প্রচলন ছিল। বর্তমানে এ প্রথা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। বুযুর্গানে দীনের নামের সঙ্গে বন্দেগী শব্দ খুব সম্ভব তাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং তাদের অনুসরণ ও কথা মান্যকরণ একটি আবশ্যকীয় ব্যাপার তা নির্দেশার্থে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের বৈধতা সম্পর্কে হযত কোন তাবীল থাকতে পারে কিন্তু সাবধানতার দাবী হল ব্যবহার না করা। কারণ বন্দেগীর বিষয়টা শুধুমাত্র আল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কোন বান্দাহকে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না করা চাই (মুহাম্মদ মিয়া)।

৩৫৮. এ ধরনের একটি ঘটনা আমাদের খান্দানের এক বুযুর্গ সম্পর্কেও প্রসিদ্ধ আছে।

৩৫৯. ডাক্তার সায়্যিদ মাহমুদ সাহেব প্রেরিত চিঠি, তারিখ ১৫ই জুলাই, ১৯৫৪ খৃঃ হক মঞ্জিল চিপড়া, বিহার।

৩৬০. প্রাসঙ্গিক শিক্ষণীয় ঘটনা ঃ মাদ্রাসায়ে হানাফিয়্যার মুহতামিম ছিলেন জনৈক উকীল সাহেব। তার নাম মুহাম্মদ সফী। বড় শরীফ, স্বল্পভাষী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তারই এক সন্তানের নাম ছিল ফসীহ্। উকীল সাহেবের মনমানসিকতা কত উচ্চ যে, তিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ফসীহ্ সাহেবের সম্মানে কখনো নিজ সন্তানকে তার নামে ডাকতেন না। বরং বুযুর্গের নামের সাথে মিল আছে বলে তাকে শুধু মাওলানা বলে ডাকতেন। অথচ তার সন্তান মাওলানা ছিল না। সে ছিল আলীগড় থেকে পড়ুয়া গ্রাজুয়েট।

৩৬১. ইনিই সেই বুযুর্গ যিনি মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শামনামলে দেওবন্দ এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। দেওবন্দ এলাকার বাইরে উত্তর দিকে 'মহল্লা পীর যাদগান' অবস্থিত ছিল। এখানেই তার ও তার সন্তান সায়্যিদ মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের পাকাকৃত মাযার। তৎকালে এ স্থানটি অনাবাদী ছিল। পরিবারিক বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, পূর্বকালে এখানে ঝোপঝাড় ছিল। সায়্যিদ মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব সেই অনাবাদী ঝোপের মধ্যেই অবস্থান নেন। সেখান থেকে পূর্বদিকে প্রায় আরো তিন ফার্লং দূরে হিন্দুদের প্রসিদ্ধ একটি তীর্থস্থান ছিল। এখানে দেবী কুন্ড নামে একটি বিরাট পুকুর ও পুকুর পাড়ে একটি বড় মন্দির। তারই সন্নিকটে এক বুযুর্গ শাহ আব্বাস (রহ)-এর মাযার

রয়েছে। ওরফে এ বুযুর্গকে 'জঙ্গলবাস' বলা হত। আমি ইলমের অধিকারী বড়দের মুখ থেকে শুনেছি যে, শাহ আব্বাস সাহেব হযরত আল্লামা ইবনুল জাওযী (যিনি শায়খ সাদীর উস্তাদ ছিলেন)-এর ছাত্র ছিলেন। তাছাড়া তিনি শায়খ সাদীর একজন সহপাঠী। কথিত আছে শায়খ সাদী ভারতবর্ষ সফরে আসার পর তার এ সহপাঠির সাক্ষাৎ করার জন্য দেওবন্দেও এসেছিলেন। মহল্লা পীর যাদেগান দীর্ঘকাল থেকে দেওবন্দেরই একটি মহল্লা হিসাবে মনে করা হচ্ছে তবে কাগজপত্রে পাটওয়ারীদের লিষ্ট অনুসারে সেটি একটি স্বতন্ত্র মৌজা হিসাবে গণ্য যার নাম দেওবন্দের অধীনস্থ নূরপুর মৌজা।

ইফাবা—২০০৬-২০০৭—প্র/৯৯১১ (উ)-৩,২৫০